

মুহতারাম আদনান মারুফ ভাইয়ের
রচনা সমগ্র-২য় পর্ব

১.আহলে হাদিসদের সংশয়; হাদিসে বর্ণিত গায়ওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে!

আহলে হাদিসদের সংশয়; গায়ওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে!

গায়ওয়াতুল হিন্দ নিয়ে বর্তমান সমাজে একটি অনর্থক বিতর্ক রয়েছে। জিহাদ সমর্থক অনেক ভাই মনে করেন, হাদিসে বর্ণিত প্রতিশ্রুত গায়ওয়ায়ে হিন্দ এখনো হয়নি, ভবিষ্যতে হবে। আর একে খণ্ডন করার জন্য হাদিস অনুসরণের দাবীদার কিছু লোক দাবী করে, গায়ওয়ায়ে হিন্দ হয়ে গেছে। এটাই নাকি সত্যনিষ্ঠ আলেমদের মত। (লিংক কমেণ্টে) এমনকি বর্তমান আহলে হাদিসদের অন্যতম ‘মান্যবর’ ডক্টর মঞ্জুরে ইলাহি একধাপ আগে বেড়ে দাবী করে বসেছে, “গায়ওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে কোনো সহিহ হাদিস নেই, এ ব্যাপারে কিছু যয়ীফ হাদিসের সমাহার দেখা যায়। সুতরাং এ নিয়ে কনফিউজড হওয়ার কিছু নেই।” এই ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে কি-ইবা করা যাবে? এই লোক তো সার্থসিদ্ধির জন্য দীনের স্বতঃসিদ্ধ ইজমায়ী সিদ্ধান্তকেও পাল্টে ফেলতে দ্বিধা করছে না। তাগুত হাসিনা যখন পর্দা নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে, “এ কেমন জীবন্ত ট্যান্ট (তাঁবু) হয়ে ঘুরে বেড়ানো!” তখন মঞ্জুরে ইলাহি শেখ হাসিনাকে কুফরী থেকে বাঁচানোর জন্য বলে উঠে, “শরিয়তের কোনো বিধান

নিয়ে উপহাস করা কবির গুনাহ, কুফর নয়। কুফর হলো, শরিয়তের কোনো বিধান অস্বীকার করা।” অথচ কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে, শরিয়তের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা করা কুফরি। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ফূর্তি করছিলে? অজুহাত দেখিও না। তোমরা ইমান আনার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে।” -সূরা তাওবা, ৬৫-৬৬

শুধু তাই নয়, উলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্যও রয়েছে যে, কেউ শরিয়তের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। ‘মওসুয়াহ ফিকহিয়াহ’য় চারো মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবাদীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে,

أجمع أهل العلم على كفر من أنكر نبوة نبي من الأنبياء، أو رسالة أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو كذبه، أو سبه، أو استخف به، أو سخر منه، أو استهزأ بسنة رسولنا عليه

ط. 22/210 الموسوعة الفقهية الكويتية (الصلاة والسلام
الكويت - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

“আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ব্যক্তি কোন
একজন নবীর নবুওয়্যাতকে অস্বীকার করলে, তাকে
মিথ্যাবাদী বললে, গালি দিলে, উপহাস করলে কিংবা
আমাদের রাসূলের সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা করলে সে কাফের হয়ে
যাবে।” -মওসুয়্যাহ ফিকহিয়্যাহ, ২২/২১০

ভাবার বিষয় হলো, ইসলামী শরিয়তের এরকম সুস্পষ্ট
বক্তব্য থাকার পরও কেন তারা মুরতাদ শাসকদের বাঁচানোর
জন্য দীনের অকাট্য বিধান পরিবর্তন করার পায়তারা করে?
এর উত্তর সেটাই যা আলোচ্য বক্তা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে
আরোপ করেছে। সে বলেছে, “কিছু মানুষ শাসকদের
তাকফির করে থাকে, তাদেরকে কাফের প্রমাণ করার চেষ্টা
করে, যেন এর মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করা
যায়।” অথচ, বাহ্যত জ্ঞানী সেজে থাকা এই বোকা লোকটিও
ভালো করেই জানে, শাসকদের কাফের বলে কেউ কোনো
সুযোগ-সুবিধা পায় না। বরং শাসকদের কাফের বললে তো
ওদের রোযানলে পড়তে হয়। হাদিসের সুস্পষ্টভাষ্য অনুযায়ী
মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা
ওয়াজিব হয়ে যায়। সুযোগ-সুবিধা কিছু পেলে তো এই

নামস্বৰ্ভস্ব ডক্টর ও শায়খরাই লাভ করে। অন্যথায় শাসকদের হাজারো কুফরী প্রকাশ পাওয়ার পরও তারা কোনো অবস্থাতেই ওদের তাকফীর করতে চায় না কেন? কারণ তো এটাই, যেন ওদের রোযানলে পুড়ে মরতে না হয়। রুটি-রোজগারের কোনো অভাব না হয়। শায়খ হামদ বিন নাসের আলফাহাদ ফাঙ্কাল্লাহু আসরাহু কতই না সুন্দর বলেছেন,

“শুনে রাখুন আমার মুসলিম ভাইয়েরা, অধিকাংশ আলিমরা দুঃখজনকভাবে তাকফিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মূলনীতি এতোদিন জানতেন না, তা হল যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যা তাকে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয় – সে কখনো শাসকদের একজন হতে পারে না। কারণ শাসকরা যে কুফর বা শিরকই করুক না কেন, তাদের তাকফির করা হলে আকাশ ভেঙ্গে পড়া এবং পর্বতমালা ধ্বসে পড়ার মতো অবস্থা হবে।

যাই হোক, গায়ওয়ায়ে হিন্দের হাদিসের তাহকীক পূর্বেও পেশ করা হয়েছে, আর সব আহলে হাদিস মঞ্জুরে ইলাহির মত বেপরোয়াও না। অধিকাংশ আহলে হাদিস আলেমরাই বলেন, গায়ওয়ায়ে হিন্দের হাদিস সহিহ, তবে তা হয়ে গেছে। তাই আজকে এ ব্যাপারটাই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে

চাচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

আসলে যারা মনে করেন গায়ওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে আর যারা মনে করেন তা এখনো হয়নি, এই দুই শ্রেণীই ভুল ধারণার শিকার। কারণ, হাদিসের শব্দ থেকে এটাই স্পষ্ট যে, হিন্দের কাফের-মুশরিকদের সাথে যত যুদ্ধ হবে সবই গায়ওয়ায়ে হিন্দের অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের শব্দ লক্ষ্য করুন,

عن ثوبان مولى رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام». أخرجه النسائي: (3175) وأحمد (22396)

ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হতে মুক্তিদান করেছেন। তাদের একটি দল হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অপর দল ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যুদ্ধ করবে।” -সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৫ মুসনাদে আহমদ, ২২৩৯৬

عن أبي هريرة، قال: «وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، وإن قتلت كنت

أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر». رواه
(7128) وأحمد (3174): النسائي

আবু হুরাইরা বলেন, “রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন, যদি আমি (সেই যুদ্ধে) শহিদ হই তাহলে আমি হবো সর্বোত্তম শহিদদের একজন। আর যদি আমি (সেই যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায়) ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত।” -মুসনাদে আহমদ: ৭১২৮ সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৪)

দেখুন, হাদিসের সব আম বা ব্যাপক। সুতরাং তাকে নির্দিষ্ট কোনো দলের সাথে খাস করার কোনই যুক্তি নেই। পূর্ববর্তী আলেমগণও হাদিসের এই ব্যাপক অর্থই বুঝেছেন। তাদের বুঝ নিশ্চয়ই আমাদের বুঝের চেয়ে উত্তম। ইমাম বাইহাকী ‘আসসুনানুল কুবরা’য় আবু হুরাইরা রাযি. এর হাদিসটি বর্ণনা করার পরে ইমাম আবু ইসহাক ফাযারীর বক্তব্য নকল করেছেন। আবু ইসহাক ফাযারী বলেন,

وددت أني شهدت ما ربد بكل غزوة غزوتها في بلاد الروم.
(السنن الكبرى للبيهقي: 9 : 297 ط. دار الكتب العلمية: 1424
(هـ).

“আমার আকাঙ্ক্ষা জাগে, আমি রোমে যত যুদ্ধ করেছি এর পরিবর্তে যদি (হিন্দুস্তানের) মারবাদে যুদ্ধ করতাম।” -
আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ৯/২৯৭

আবু ইসহাক ফায়ারী (মৃ: ১৮৬ হি.) হলেন ইমাম আওয়যীর খাস শাগরেদ, তিনি ইমাম আওয়যী থেকে বর্ণিত জিহাদের বিধিবিধান সংকলন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন,

وقال أبو . لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق
حاتم: اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به،
16/ 69) بلا مدافعة (سير أعلام النبلاء

“জিহাদের বিধিবিধানের ব্যাপারে আবু ইসহাক ফায়ারীর কিতাবের মত কোন কিতাব কেউ সংকলন করতে পারেনি। আবু হাতেম রায়ী. রহ. বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আবু ইসহাক ফায়ারী অনুসরণীয় ইমাম।” -
সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬/৬৯

লক্ষ করুন, আবু ইসহাক ফায়ারী রহ এই হাদিসের কারণে রুমে যত যুদ্ধ করেছেন সেগুলোর পরিবর্তে হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, যা থেকে বুঝা যায়; তিনি

হিন্দুস্তানের কাফেরদের সাথে সংঘটিত সব যুদ্ধকেই এই হাদিসের মেসদাক-উদ্দেশ্য মনে করছেন। কেননা এই হাদিসের উদ্দেশ্য যদি শুধু সাহাবীদের যমানায় সংঘটিত প্রথম যুদ্ধই হতো, তবে তার এই আকাঙ্ক্ষার কোন অর্থই হতো না।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের দলিলস্বরূপে সেসকল হাদিস একত্রিত করেছেন যে হাদিসগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এবং তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তিনি গায়ওয়াতুল হিন্দের হাদিসও উল্লেখ করেছেন, এরপর গায়ওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে সত্য হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন,

وقد غزا المسلمون الهند في سنة أربع وأربعين في إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجرت هناك أمور فذكرناها مبسوطه، وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود بن سيكتكين صاحب بلاد غزنة وما والاها في حدود أربعمائة ففعل هنالك أفعالا مشهورة وأمورا مشكورة وكسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات وأخذ قلائده وسيوفه ورجع إلى بلاده سالما (النهاية في الفتن: 1/18 دار الجيل، 1408 هـ) غانما

“মুসলমানরা মুয়াবিয়া রাযি. এর শাসনামলে তেতাল্লিশ

হিজরিতে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এরপর গজনীর অধিপতি মহান বাদশাহ মাহমুদ বিন সবুজগীন চারশো হিজরির দিকে হিন্দুস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তিনি সেখানে মহান কারনামা আঞ্জাম দিয়েছেন, প্রশংসাযোগ্য অনেক কাজ করেছেন। সোমনাথ মন্দিরের সবচেয়ে বড় মূর্তি ভেঙ্গেছেন এবং তার ভিতরে রক্ষিত হিরা-জহরত নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।” -
আননিহায়া ফিল ফিতান, ১/১৮

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইবনে কাসীর রহ. মুয়াবিয়া রাযি. এর আমলে সংঘটিত যুদ্ধ এবং মাহমুদ গজনবীর ভারত অভিযান সবগুলোকেই গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসের মেসদাক ধরছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, তিনি গাযওয়াতুল হিন্দকে নির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধ মনে করতেন না।

চলবে ইনশাআল্লাহ

২.আহলে হাদিসদের সংশয়; গাযওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে!
(দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

(ভারতের সাথে ইতিপূর্বে যত যুদ্ধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে সব যুদ্ধই হাদিসে বর্ণিত গায়ওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য- এ ব্যাপারে গতপর্বে ইমাম আবু ইসহাক ফায়ারী ও ইবনে কাসীর রহ. এর বক্তব্য পেশ করেছি। এ পর্বে আল্লামা সিন্দী, আল্লামা যফর আহমদ উসমানী ও মুফতি শফী রহ. এর বক্তব্য তুলে ধরছি।)

আল্লামা সিন্দী রহ. (মৃত্যু: ১১৩৮ হি.) গায়ওয়াতুল হিন্দের হাদিসদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকেও বুঝে আসে, এ ফযিলত হিন্দুস্তানের কাফেরদের সাথে যুদ্ধকারী সকল মুমিনদের জন্য আম-ব্যাপক, নির্দিষ্ট কোন দলের সাথে খাস নয়। তিনি আবু হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

(المحرر أي: المعتقد من النار على مقتضى ذلك العمل)
 النجيب، ... والحديث الآتي (يعني حديث ثوبان) يدل على أنه
 بشرٌ كُلٌّ من حضر بذلك، فقولُه بذلك مبني على أنه حينئذ يكون
 مندرجا فيمن بُشروا بذلك، والله تعالى أعلم (حاشية السندي على
 سنن النسائي: 6/42 مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب
 (الطبعة: الثانية، 1406 - 1986)

“পরবর্তী হাদিস (সাওবান রাযি. এর হাদিসে) বর্ণিত হয়েছে
 যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দরবারে

উপস্থিত সবাইকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যারা
 হিন্দুস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে আল্লাহ তায়ালা
 তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন, এর
 ভিত্তিতেই আবু হুরাইরা এ হাদিসে বলছেন, যদি আমি ফিরে
 আসি তাহলে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হবো।” -সুনানে
 নাসায়ীর টিকা, ৬/৪২

মুফতি শফি রহ. ‘জাওয়াহিরুল ফিকহে’ (৬/৬৪) এ বিষয়টি
 সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। তার বক্তব্য দেখুন,

ہندوستان کے جہاد سے کونسا جہاد مراد ہے ؟
 ان دونوں حدیثوں میں جو فضائل غزوہ ہند کے ارشاد
 فرمائے گئے ہیں اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
 ہندوستان پر جہاد تو پہلی صدی ہجری سے لیکر آج تک
 مختلف زمانوں میں ہوتے رہے ہیں، اور سب سے پہلا
 سندھ کی طرف سے محمد بن قاسم کا جہاد ہے جس میں
 بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اور اکثر تابعین کی کثرت نقل
 کی جاتی ہے، تو کیا اس سے مراد صرف پہلا جہاد ہے یا
 جتنے جہاد ہو چکے یا آئندہ ہوں گے وہ سب اس میں شامل
 ہیں؟

ألفاظ حدیث میں غور کرنے سے حاصل یہی معلوم ہوتا ہے
 کہ الفاظ* حدیث کے عام ہیں اس کو کسی خاص جہاد
 کیساتھ مخصوص و مقید کرنے کی کوئی وجہ نہیں اس لیے
 جتنے جہاد ہندوستان میں مختلف زمانوں میں ہوتے رہے
 ہیں اور پاکستان کی حالیہ جہاد بھی اور آئندہ جو بھی جہاد
 ہندوستان کے کفار کے خلاف ہوگا وہ سب اس عظیم الشان

والله سبحانه وتعالى أعلم - (جواهر - بشارات میں شامل ہیں
الفقه 6/64)

“উল্লিখিত দু’টি হাদিসে গায়ওয়ায়ে হিন্দের যে ফযিলত বর্ণিত হয়েছে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, হিন্দুস্তানের জিহাদ তো হিজরি প্রথম শতক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সর্বদাই চলমান ছিল। সর্বপ্রথম জিহাদ হয়েছে মুহাম্মদ বিন কাসেমের নেতৃত্বে সিন্ধু অভিমুখে, যে যুদ্ধে কয়েকজন সাহাবী ও অসংখ্য তাবেরী অংশগ্রহণ করেন। তাহলে হাদিসে বর্ণিত গায়ওয়ায়ে হিন্দ দ্বারা কি শুধু প্রথম জিহাদ উদ্দেশ্য না পূর্বে যত জিহাদ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যত জিহাদ হবে সবই উদ্দেশ্য?”

হাদিসের শব্দে চিন্তা করলে এটাই বুঝে আসে যে, হাদিসের শব্দ যেহেতু ব্যাপক অর্থবহ তাই তাকে কোনো নির্দিষ্ট জিহাদের সাথে খাস করার কোনো কারণ নেই। সুতরাং হিন্দুস্তানের ময়দানে যুগে যুগে যত জিহাদ হয়েছে এবং পাকিস্তানের বর্তমান জিহাদ ও ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের কাফেরদের সাথে যত জিহাদ হবে সবই এই মহান ফযিলত সম্বলিত সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত।” -জাওয়াহিরুল ফিকহ,
৬/৬৪

আল্লামা যফর আহমদ উছমানী রহ. ও এলাউস সুনানে (১২/৬৮৭) এই মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ‘গায়ওয়ায়ে হিন্দের ফযিলত’ শিরোনামে আবু হুরাইরা ও সাওবান রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসদ্বয় উল্লেখ করে উভয় হাদিসকে ‘হাসান’ বলে মন্তব্য করেন। এরপর তিনি বলেন,

هل هذه الفضيلة تختص بعصاية غزت الهند أولا أو تعم كل
عصاية غزته أولا أو ثانيا أو ثالثا حتى جعلتها دار الإسلام،
وكذا كل عصاية تغزوها فيما بعد لصيرورتها الآن دار حرب
بعد ما بقيت دار إسلام مدة ألف سنة أو نحوها؟ فظاهر حديث
ثوبان الأول، وظاهر حديث أبي هريرة الثاني، والكرم عميم،
والله ذو الفضل العظيم. ... جعلنا الله من إحدى العصابتين
التي أحرزهما من النار بحرمة سيد الأبرار

“এ হাদিসদু’টি থেকে গায়ওয়ায়ে হিন্দের ফযিলত সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে। তবে এ ফযিলত কি শুধু সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানে জিহাদকারী দলের সাথে বিশেষিত, না তাদের ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত যারা পরবর্তীতেও সময়ে সময়ে যুদ্ধ করে তাকে দারুল ইসলামে পরিণত করেছিল? তেমনিভাবে বর্তমানে তা দারুল হারবে রূপান্তর হওয়ার পর যারা তার বিপক্ষে যুদ্ধ করবে হাদিসদু’টির ফযিলত কি তাদেরকেও শামিল করবে? সাওবান রাযি. এর হাদিস থেকে প্রথম দলের সাথে খাস হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু আবু হুরাইরা রাযি.

এর হাদিস থেকে সব দলের ক্ষেত্রেই আম-ব্যাপক হওয়া বুঝে আসে। আর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ তো অসীম, তিনি পরম দয়ালু, (তাই যারাই হিন্দুস্তানের কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে তাদেরকেই তিনি নিজ অনুগ্রহে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবেন এটাই আমাদের আশা)।” -ইলাউস সুনান, ১২/৬৮৭

মজার বিষয় হলো, ‘পোশাকি শায়খ’ আবু বকর যাকারিয়া ইবনে কাসীরের বক্তব্যকে ‘গায়ওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে’- এ দাবীর স্বপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছে। সাথে সে আরেকটু যুক্ত করে বলেছে, “গায়ওয়ায়ে হিন্দ আগেও হয়েছে, সর্বপ্রথম হয়েছে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সময়ে, তারপর সুলতান মাহমুদ গযনবী করেছেন সতেরোবার, তারপর করেছেন সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী। এ যুদ্ধ হয়ে গেছে এটাই ইবনে কাসীরের মত, সত্যনিষ্ঠ আলেমদের মত।

...যদি আবারো হয়, আবার হতেও পারে, তবে এটা হাদিসে বর্ণিত গায়ওয়ায়ে হিন্দ নয়।” অর্থাৎ, সে বলতে চাচ্ছে: মুহাম্মদ বিন কাসেম, মাহমুদ গযনবী ও মুহাম্মদ ঘুরী এদের সকলের যুদ্ধই হাদিসে বর্ণিত গায়ওয়ায়ে হিন্দের মেসদাক-উদ্দেশ্য। মুহাম্মদ ঘুরী যেহেতু ইবনে কাসীরের পরের যমানার লোক তাই ইবনে কাসীর তার কথা উল্লেখ করেননি। তবে তার জিহাদও হাদিসে বর্ণিত গায়ওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য। **কিন্তু এই মাথামোটা শায়খকে কে বুঝাবে,**

যদি মুহাম্মদ বিন কাসেম থেকে শুরু করে মুহাম্মদ ঘুরী পর্যন্ত হিন্দুস্তানে সংঘটিত সব যুদ্ধই হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য হতে পারে, সুলতান মাহমুদ গযনবীর সতেরোবার ভারত আক্রমণ সবগুলো এর মেসদাক-উদ্দেশ্য হতে পারে, তবে বর্তমান বা ভবিষ্যতে সংঘটিত হিন্দুস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধ কেন হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য হবে না? এখানে পূর্বে সংঘটিত যুদ্ধ এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য যুদ্ধের মাঝে তো আমরা তেমন কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। একটা পার্থক্য অবশ্য ধরা যায়। তা হলো, পূর্বে যত যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে সবগুলো হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য হতে মানা নেই। কারণ, তাতে যাকারিয়ার মতো জিহাদবিরোধী মুনাফিকদের অংশগ্রহণের কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু বর্তমান বা ভবিষ্যতে গাযওয়ায়ে হিন্দ হলে তাতে তো এই মুনাফিকদেরও জিহাদে শরিক হওয়ার মাসয়ালা আসবে, তখন ইসলামের সূচনালগ্নে যেমন জিহাদে অংশগ্রহণে গড়িমসির মাধ্যমে মুনাফিকদের নেফাক প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি গাযওয়ায়ে হিন্দ থেকে বসে থাকার কারণে এদের নেফাকীও প্রকাশ পেয়ে যাবে। জুব্বা ও আবা-কাবা পড়ে শায়খগিরির কপটতাপূর্ণ খোলস খসে পড়বে। তাই গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে তাদের এত মাথাব্যথা। কেউ গাযওয়ায়ে হিন্দের সব হাদিসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করার চেষ্টা

করে, কেউ সহিহ মানলেও হয়ে গেছে বলে দাবী করে।

এই ভিডিওতে শায়খ যাকারিয়া আরো অনেক বস্তাপচা বক্তব্য দিয়েছে। যেমন সে বলেছে, “আপনি যুদ্ধ যদি করেনও কিন্তু আপনার যদি আকীদা শুদ্ধ না থাকে তবে আপনার যুদ্ধের কোনো মূল্য হবে না।” অথচ সে ইতোপূর্বে মাহমুদ গযনবীর ভারত অভিযানকে হাদিসে বর্ণিত গায়ওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য প্রমাণ করে এসেছে। মূর্খ লোকটি এটাও জানে না যে, মাহমুদ গযনবীর আকীদা পুরোপুরি শুদ্ধ ছিল না। তিনি আকীদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কাররামী। ইবনে কাসীর রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেছেন,

وكان على مذهب الكرامية في الاعتقاد، وكان من جملة من يجالسه منهم محمد بن الهيثم، وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات بين يدي السلطان محمود في مسألة العرش، ذكرها ابن الهيثم في مصنف له، فمال السلطان محمود إلى قول ابن الهيثم، وتقم على ابن فورك كلامه، وأمر بطرده
38 : 12 وإخراجه، لموافقة لرأي الجهمية. (البداية والنهاية
الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى 1408، هـ -
1988 م)

“তিনি আকীদার ক্ষেত্রে কাররামিয়্যাহদের অনুসারী ছিলেন, তার সভাসদদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন হাইয়ম (কাররামীও)

ছিল। ইবনে হাইয়ম এবং উস্তায় আবু বকর ফুরাকের মাঝে আল্লাহ তায়ালার আরাশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। ইবনে হাইয়ম তার রচিত এক কিতাবে এর বিবরণ দিয়েছে। সুলতান মাহমুদ গযনবী ইবনে হাইয়মের মতই গ্রহণ করেন। বরং তিনি উস্তায় আবু বকর ফুরাককে তার দরবার হতে তাড়িয়ে দেন, (সুলতানের ধারণা অনুযায়ী) উস্তায় আবু বকরের মত জাহমীদের মতের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে।” -আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২/৩৮

সে আরো বলেছে, “গায়ওয়ায়ে হিন্দের জন্য কোন প্রস্তুতি নিবেন না, প্রস্তুতি নেয়া জঘন্য কাজ হবে।” সুবহানাল্লাহ, চিন্তা করুন, আল্লাহ তায়ালা ও তার দ্বীনের ব্যাপারে এরা কি চরম ধৃষ্টতা পোষণ করছে। গায়ওয়ায়ে হিন্দ হোক বা না হোক, জিহাদের জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ তো সর্বাবস্থায় ফরয, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সুস্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন। আর এ প্রস্তুতি নিতে শুধু নিষেধই করছে না, বরং একে জঘন্য কাজ বলছে!

পরিশেষে বলব, বর্তমান পরিস্থিতিতে মূলত গায়ওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে এসব তাত্ত্বিক আলোচনার তেমন প্রয়োজনই পড়ে না। হিন্দুরা যেভাবে ভারতের মুসলিমদের উপর প্রকাশ্যে নির্যাতন করছে আর বাংলাদেশেও ইসকনের

মাধ্যমে প্রশাসনকে হাত করে আগ্রাসনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন জিহাদ ব্যতীত মুসলিমদের মুক্তির আর কী উপায় আছে? সুতরাং আহলে হাদিস ভাইদের নিকট আবেদন, আমরা আপনাদেরকে আমাদের ভাই-ই মনে করি। সামান্য কিছু মাসয়ালাতে হানাফী মাযহাবের বিপরীতে হাদিসের উপর আমল করলে আমাদের তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সহিহ হাদিস অনুসরণের নামে আপনারা আসলে কাদের অনুসরণ করছেন? জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত, রাষ্ট্র শর্ত, ইমান-আকীদা বিশুদ্ধ করা শর্ত, এ বিষয়গুলো কোন হাদিসে আছে? তাই আপনারা এ শায়খদের ব্যাপারে সতর্ক হোন। মনে রাখবেন, ভারতীয় আগ্রাসন শুরু হলে জিহাদ বিরোধী এ শায়খরা আপনাদের মুক্তির জন্য কিছুই করবে না, বরং তারা বাংলাদেশে নিজেদের ব্যবসা বন্ধ করে তাদের খোদা মুহাম্মদ বিন সালমানের দেশে পালানোর চেষ্টা করবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক বিষয়গুলো বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রথম পর্বের লিংক

<https://dawahilallah.com/showthread....B%26%232503%3B!>

৩.ইমাম ছাড়া জিহাদ; ইতিহাসের বাক্যে বাক্যে (পর্ব-১ ভন্ড নবী আসওয়াদ আনসীকে হত্যা)

ইমাম ছাড়া জিহাদ একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, চারো মাযহাবের ফুকাহায়ে কেলাম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ইমাম ছাড়া জিহাদের অনুমতি প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে পূর্বেও ভাইয়েরা লেখালেখি করেছেন। বিশেষকরে ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের লিখিত প্রবন্ধটি এ বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। এতে একাধিক সহিহ হাদিসের পাশাপাশি চারো মাযহাবের ফুকাহায়ে কেলামের বক্তব্যও পেশ করা হয়েছে। নিচের লিংক থেকে লেখাটি পড়ে নিতে পারেন।

<https://my.pcloud.com/publink/show?c...9e1rKFbBOLyxX7>

তবে, আমি একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাসয়ালাটি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি, তা হলো, ইমাম ছাড়া জিহাদ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমানা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চলমান রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের একাধিক জিহাদের ব্যাপারে অবগতি লাভ করেছেন। কিন্তু কোন আপত্তি তুলেননি। তিনি বলেননি যে, আমার অনুমতি নেওয়া ছাড়া তোমাদের জন্য এ ধরনের যুদ্ধ-আক্রমণ করা ঠিক হয়নি। তেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর থেকে আজ পর্যন্ত ইমাম ছাড়া জিহাদ চলমান রয়েছে। দীর্ঘ বারোশত বছর পর্যন্ত কোন আলেম এর উপর আপত্তি তুলেননি। বরং অনেকেই এধরণের জিহাদের প্রশংসা করেছেন, অনেকে এতে অংশগ্রহণও করেছেন। যা প্রমাণ করে ইমাম ছাড়া জিহাদ বৈধ হওয়া উম্মাহর আমলে মুতাওয়ারাস বা যুগ যুগ ধরে চলমান নিরবিচ্ছিন্ন কর্মধারা। হাঁ, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে যখন মুসলিমরা ওয়াহান আক্রান্ত হয়ে যায়, জিহাদ ও শাহাদাহর প্রতি তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি বেড়ে যায়, তখন তারা জিহাদ থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য জিহাদের জন্য এধরণের মনগড়া শর্ত আরোপ করতে শুরু করে। এ প্রবন্ধে আমরা ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিকভাবে যুগে যুগে ইমাম ছাড়া জিহাদের ঘটনাবলী তুলে ধরবো। আল্লাহ আমাদের কাজ সহজ করে দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদের একাধিক ঘটনা ঘটেছে, এরমধ্যে অন্যতম হলো, মহান সাহাবী আবু বাসীর ও তার সাথীদের ঘটনা যা উল্লিখিত প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আরেকটি হলো, বিখ্যাত সাহাবী সালামা বিন আকওয়া রাযি. এর ঘটনা। এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ আগামীতে আলোচনা করবো। আজকে রাসূলের যুগের তৃতীয় আরেকটি ঘটনা

বর্ণনা করছি, তা হলো সাহাবী ফিরোজ দাইলামী কর্তৃক
ইয়ামানের ভন্ড নবী আসওয়াদ আনসীকে হত্যার ঘটনা।

হাফেয ইবনে হাযার রহ সহিহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ
ফাতহুল বারীতে বলেন,

الدلائل" من طريقه من "وروى يعقوب بن سفيان والبيهقي في
حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء
مضمومة ثم جيم قال: خرج الأسود الكذاب وهو من بني عنس
يعني بسكون النون وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق
بمهملتين وقاف مصغر والآخر شقيق بمعجمة وقافين مصغر،
وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس، وكان باذان
عامل النبي صلى الله عليه وسلم بصنعاء فمات، فجاء شيطان
الأسود فأخبره، فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج
المرزبانة زوجة باذان ، فذكر القصة في مواعدها دادويه
وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلاً؛ وقد سقته
المرزبانة الخمر صرفاً حتى سكر، وكان على بابهِ ألف حارس.
فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز
رأسه، وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت، وأرسلوا
الخبر إلى المدينة فوافى بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه
وسلم. قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي
صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه،
ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه. (فتح الباري: 8/93
ط. دار الفكر)

“হাফেয ইয়াকুব বিন সুফিয়ান ও বাইহাকী তার ‘দালায়িলুন

নুবুওয়্যাহ' গ্রন্থে নোমান বিন বুযরুজের সূত্রে বর্ণনা করেন, “মিথ্যাবাদী আসওয়াদ নবী হওয়ার দাবী করে। সে ছিল আনস গোত্রের। তার সাথে দুটো শয়তান ছিল, একটার নাম সুহাইক অপরটার নাম শুকাইক। তারা আসওয়াদকে চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত করতো। ইয়ামানের সানআ নগরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ হতে নিযুক্ত গভর্নর ‘বাজান’ মৃত্যুবরণ করলে শয়তান এসে আসওয়াদকে এ সংবাদ জানায়। তখন সে তার গোত্রের লোকদের নিয়ে সনআ দখল করে নেয় এবং ‘বাজানে’র স্ত্রীকে বিয়ে করে।

তখন বাজানের স্ত্রী আসওয়াদকে হত্যা করার জন্য দাদাওয়াইহ, ফিরোয ও অন্যদের সাথে পরিকল্পনা করে। একদিকে বাজানের স্ত্রী আসওয়াদকে খালেস শরাব পান করিয়ে মাতাল করে রাখে অপরদিকে ফিরোয ও তার সাথীরা আসওয়াদকে হত্যা করার জন্য তার ঘরে আসে। তবে আসওয়াদের ঘরের দুয়ারে একহাজার সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল, তাই তারা দেয়াল ছিদ্র করে আসওয়াদের ঘরে প্রবেশ করে। এরপর ফিরোয আসওয়াদকে হত্যা করে তার মাথা কেটে নেন এবং বাজানের স্ত্রী ও পছন্দনীয় মালামাল সহ ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। তারা এই সুসংবাদ রাসূলের নিকট প্রেরণ করেন, রাসূলের মৃত্যুর সময় যা মদীনায় পৌঁছে।” আবুল আসওয়াদ উরওয়া রহ. এর থেকে

বর্ণনা করেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের একদিন একরাত পূর্বে আসওয়াদকে হত্যা করা হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে তা অবগত হয়ে সাহাবীদেরকে এ সুসংবাদ প্রদান করেন। রাসূলের ইন্তিকালের পরে খলীফা আবু বকরের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে। -ফাতহুল বারী, ৮/৯৩

ইমাম নাসায়ী তহাবী ও তবরানী রহ. বর্ণনা করেন, “ফিরোয দাইলামী আসওয়াদ আনসীর কর্তৃত মস্তক নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করেন।” হাফেয ইবনুল কাত্তান ও হাফেয হাইসামী রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। হাফেয ইবনে হাযার হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, “হাদিসের এ অর্থ হতে পারে যে, ফিরোয রাসূলকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আগমন করেন, কিন্তু তিনি নবীজির নিকট পৌঁছার পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।” -

আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ী, ৮-৬১৯ শরহ মুশকিলুল আছার, ২৯৬০ আলমু'জামুল কাবীর, তবরানী, ৮৪৮ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাইসামী ৯৬৯৩ আততালখীসুল হাবীর, ইবনে হাযার, ৪/২৮৭ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

এখানে লক্ষ্যণীয়:-

ক. উরওয়া রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাহাবীদেরকে এ সংবাদ প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে বলেননি যে, আমার অনুমতি ছাড়া তাদের এ জিহাদ সঠিক হয়নি। তারা চরম অন্যায়ে করেছে, যদি তারা এ আক্রমণের সময় নিহত হতো তবে তারা জান্নাতী না হয়ে জাহান্নামী হতো। আল্লাহ আমাদের হেফযত করুন, আজ কিছু কিছু পোশাকী আলেম-শায়েখ এধরণের কথাই বলছেন, তারা ইমাম ছাড়া জিহাদকে শুধু হারামই বলছেন না, বরং যারা তা করবে তাদেরকে জাহান্নামীও বলে দিচ্ছেন, এটা আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে কত বড় আস্পর্শা, মুমিন যতই অন্যায়ে করুক আল্লাহ তায়লা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, তাহলে এরা কেন (তাদের ধারণা অনুযায়ী) ইমাম ছাড়া জিহাদকারী অপরাধী মুমিনদের (?) ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা করে দিচ্ছে। এটা কি আল্লাহর ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ নয়? আসলে এ ধরণের ফতোয়া তাদেরকে শয়তান ও তার দোসররা শিখিয়েছে, **আমেরিকার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক র*্যাভ কর্পোরেশন তাদের এক গবেষণায় মুসলমানদের জিহাদ থেকে বিমুখ করার জন্য আমেরিকাকে কিছু পরামর্শ দিয়েছে, যার একটা হলো, আলেমদের মাধ্যমে ইস্তেশহাদী হামলাকে আত্মহত্যা বলা ও হামলাকারীদের জাহান্নামী হওয়ার ফতোয়া প্রচার করা।** (দেখুন, আলজিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, শুবুহাত ও রুদুদ, রশাদ ইবরাহীম, পৃ: ৪

বইটির লিংক,

<https://my.pcloud.com/publink/show?c...RDfmIGM4TYW06y>)

খ. আসওয়াদ আনসীকে হত্যার সংবাদ রাসূলের জীবদ্দশায় পৌঁছাক বা তার ইন্তেকালের পর, আবু বকর রাযি, এর নিকট যে এ সংবাদ পৌঁচেছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু না আবু বকর রাযি. এর উপর কোন আপত্তি তুলেছেন, না অন্য কোন সাহাবী। এতে প্রমাণ হয় ইমাম ছাড়া জিহাদের বৈধতা সাহাবীদের সর্বসম্মত মত। আর বাস্তবতাও এমনই, জিহাদের জন্য এ ধরণের শর্ত সাহাবীদের কল্পনাজগতেও কখনো উদয় হয়নি। এটা তো জিহাদ বিরোধী আলেম ও শায়েখরা পিঠ বাচানোর জন্য আবিষ্কার করেছে।

গ. আমাদের আলোচ্য ঘটনাটি লোন উলফ হামলা ও টার্গেট কিলিং অপ্লের সাথে কতই না সাদৃশ্যপূর্ণ। এর দ্বারা কত সহজে কত বড় ফিৎনা নির্মূল হয়ে যায়। অথচ যদি মুজাহিদ বাহিনী পাঠিয়ে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের মাধ্যমে এ ফিৎনা নির্মূল করার চেষ্টা করা হতো তাহলে হয়তো কত রক্তপাতই না হতো। যা আমরা আসওয়াদের মতই আরেক ভন্ড নবী মুসাইলামার ফিৎনা নির্মূল করার ক্ষেত্রে দেখেছি।

মুসাইলামার বিপক্ষে যুদ্ধে এত অধিক পরিমান কারী শহিদ হন যে, উমর রাযি. কুরআন হারিয়ে যাওয়ার আশংকা করেন এবং আবু বকর রাযি. কে কুরআন সংকলনের পরামর্শ দেন। -দেখুন, সহিহ বুখারী, ৪৯৮৬

৪.ইমাম ছাড়া জিহাদ; ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে (দ্বিতীয় পর্ব, গায়ওয়ায়ে যি- করদ)

ষষ্ঠ হিজরিতে মুসলিমরা হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার পর গাতফান গোত্রের মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী পাল লুট করার জন্য অতর্কিত আক্রমণ করে বসে এবং রাসূলের উটনীপাল নিয়ে পলায়ন করে। মহান সাহাবী সালামাহ বিন আকওয়া রাযি. এ আক্রমণের সংবাদ শুনে তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং একাই উটগুলো উদ্ধার করেন। সালামা ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। তিনি তীর নিক্ষেপ করে করে মুশরিকদের বিপর্যস্ত করে ফেলেন। এরপর রাসূলের ঘোড়সওয়ার বাহিনী এসে মুশরিকদের উপর আক্রমণ করে। মুশরিকদের নেতা আব্দুর রহমান বিন উয়াইনাহ সহ আরো দুয়েকজন নিহত হয়। বাকী কাফেররা জিনিষপত্র ফেলে জান নিয়ে পালিয়ে যেতে

সক্ষম হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ গাযওয়াতু যি-করদ নামে
প্রসিদ্ধ। সহিহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে,

عن سلمة بن الأكوع، قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى،
وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد،
فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح :قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان،
فأسمعت ما :قال: فصرخت ثلاث صرخات، يا صباحاه، قال
بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي
قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت
:راميا، وأقول

أنا ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع

فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم ثلاثين بردة،
قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله،
إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة،
فقال: «يا ابن الأكوع ملكت فأسجج»، قال: ثم رجعنا ويردني
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة
(، 18061807) صحيح البخاري(3041 ، 4194) صحيح مسلم

“সালামা ইবন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমি ফজরের আযানের আগেই বের হয়ে পড়লাম।
রাসুলুল্লাহ (সা) এর দুধেল উটনীগুলো তখন যু-কারদে
(চারণ ভূমিতে) চরছিল। তখন আব্দুর রহমান ইবন আওফ

(রা.) এর গোলাম আমার সামনে পড়লো। সে বললো,
রাসুলুল্লাহ (সা) -এর দুধেল উটনী সমূহকে নিয়ে গেছে।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে সেগুলো নিয়ে গেছে? সে বলল,
গাতফান গোত্রের লোকেরা। সালামা বলেন, তখন আমি
উচ্চস্বরে তিনবার হাঁক দিলাম, সাহায্য চাই, সাহায্য। মদীনার
উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী সবাইকে আমি আমার সে হাঁক
শোনালাম। তারপর সোজা বেরিয়ে পড়লাম এবং যু-কারদে
গিয়ে তাদের (লুটেরাদের)-কে পেলাম। তারা তাদের
পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তখন আমি তীর নিক্ষেপ
করতে শুরু করলাম। আমি ছিলাম একজন (দক্ষ)
তীরন্দাজ। আমি বীরত্ব সূচক কবিতা আবৃত্তি করছিলাম,
‘আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতরদের ধ্বংসের দিন (কিংবা
আজ তার দিন, যে শৈশব থেকে যুদ্ধের স্তন্য পান করেছে)।

আমি আমার তীর নিক্ষেপ ও বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি
করতে থাকলাম। অবশেষে আমি দুধেল উটনীগুলো মুক্ত
করলাম। এমনকি আমি তাদের ত্রিশটি (বড়) চাদরও ছিনিয়ে
নিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সা) ও লোকজন এসে
পড়লেন। তখন আমি বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি
তাদের পানির পথ রুদ্ধ করে রেখেছি, তাই তারা পিপাসার্ত।
এবার আপনি একটি বাহিনী প্রেরণ করুন। তখন রাসুলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সালামা! তুমি ওদের

উপর বিজয়ী হয়েছে। এবার ওদের প্রতি দয়া করো।
সালামা (রা.) বলেন, তারপর আমরা ফিরে এলাম।
রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁরই উটনীর পিছনে বসিয়ে
নিলেন। এভাবে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। -সহিহ বুখারী,
৩০৪১; ৪১৯৪ সহিহ মুসলিম, ১৮০৬ (ইফা, ৪/৩৪৫-৩৪৬)

সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, সালামা বিন
আকওয়া আক্রমণের কথা জানতে পেরে রাসূলের নিকট
সংবাদ পাঠান এবং তিনবার ঘোষণা প্রদান করে মুশরিকদের
পিছু ধাওয়া করেন। পরদিন ভোর হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের আজকের উত্তম
অশ্বারোহী ছিলো আবু কাতাদাহ্ এবং উত্তম পদাতিক ছিলো
সালামা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামাহ
বিন আকওয়াকে গনিমত হতে দুটি অংশ প্রদান করেন,
ঘোড়সওয়ারের অংশ এবং পদাতিকের অংশ।” -সহিহ
মুসলিম, ১৮০৭

এ যুদ্ধ ইমামের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হওয়ার সুস্পষ্ট
দলিল। কেননা সালামা বিন আকওয়া রাযি, আক্রমণের
সংবাদ পাওয়ার পর নবীজির অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা
করেননি। বরং তিনি নবীজির কাছে সংবাদ প্রেরণ
করেছেন। পাহাড়ে উঠে তিনবার হামলার ব্যাপারে সতর্ক

করে ঘোষণা দিয়েছেন। এরপরই শত্রুর পিছে ধাওয়া শুরু করেছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য তার কোন নিন্দা করেননি। বরং তার বীরত্বমূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নিজের পেছনে বসিয়ে মদীনায় নিয়ে এসেছেন। তার প্রশংসা করে বলেছেন, “আজকের যুদ্ধে আমাদের সর্বোত্তম পদাতিক সৈন্য হলো সালামাহ।” পুরস্কারস্বরূপ তাকে দিগুণ গনিমত প্রদান করেছেন। এজন্যই বিশিষ্ট আলেমগণের বোর্ড কর্তৃক সংকলিত ফিকহে ইসলামীর বে-নজির কিতাব ‘মওসুয়াহ ফিকহিয়াহ’য় শত্রু আক্রমণের সময় ইমামের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হওয়ার দলিল স্বরূপ এ হাদিস পেশ করা হয়েছে, মওসুয়াহর ইবারত দেখুন,

صرح الشافعية والحنابلة بأنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو الأمير المولى من قبله ؛ لأن الغزو على حسب حال الحاجة ، والإمام أو الأمير أعرف بذلك ، ولا يحرم ؛ لأنه ليس فيه أكثر . من التغرير بالنفس ، والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد . ولأن أمر الحرب موكول إلى الأمير ، وهو أعلم بكثرة العدو وقتلهم ، ومكامن العدو وكيدهم ، فينبغي أن يرجع إلى رأيه ؛ لأنه أحوط للمسلمين ؛ ... إلا أن يفجأهم عدو يخافون تمكنه، فلا يمكنهم الاستئذان، فيسقط الإذن باقتضاء قتالهم، والخروج إليهم . لحصول الفساد بتركهم انتظارا للإذن .
 ودليل ذلك أنه لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم صادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة فتبعهم وقتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير

رجالتنا سلمة بن الأكوح ، وأعطاه سهم فارس وراجل
وزارة الأوقاف والشئون 136 / الموسوعة الفقهية الكويتية (16)
الإسلامية - الكويت الطبعة : من 1404 - 1427 هـ

“শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ সুস্পষ্টরূপে বলেছেন, ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়, হারাম নয়। কেননা জিহাদ করতে হয় প্রয়োজন অনুপাতে। আর এ ব্যাপারে ইমামই সম্যক অবগত। তবে তা হারামও হবে না। কেননা এতে বেশি থেকে বেশি নিজেকে বিপদে ফেলা হয়। আর জিহাদের ক্ষেত্রে নিজের জানকে বিপদের সম্মুখীন করা বৈধ। তাছাড়া যুদ্ধের বিষয়াদি আমিরের নিকট ন্যস্ত। শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাসল্পতা, তাদের গোপন ঘাটি ও চক্রান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন। তাই তার মতানুযায়ী জিহাদ করা উত্তম এবং মুসলমানদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহায়ক।

তবে যদি এমন শত্রু হঠাৎ আক্রমণ করে বসে যাদের ঘাটি গেড়ে বসার আশংকা রয়েছে, বিধায় অনুমতি নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে শত্রুদের যুদ্ধের কারণে অনুমতি নেওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, যখন কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর উপর আক্রমণ করে তখন সালামা বিন আকওয়া তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং ইমামের অনুমতি ব্যতীতই তাদের সাথে

যুদ্ধ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজের প্রশংসা করে বলেন, আজ আমার পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো সালামা বিন আকওয়া এবং তাকে ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সৈন্য উভয়ের সমান গনিমত প্রদান করেন। -মওসুয়াহ ফিকহিয়াহ, ১৬/১৩৬

প্রথম পর্বের লিংক:-

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232494%3B>

৫.ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (পর্ব-১ ‘তলোয়ারে নয় উদারতায়’ শীর্ষক শ্লোগানের উৎপত্তি; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা

‘তলোয়ারে নয় উদারতায়’ শীর্ষক শ্লোগানের উৎপত্তি

১৪৯৩ সনে আন্দালুসে সর্বশেষ মুসলিম ভূখন্ড থানাডার পতনের পর খৃষ্টান পাদ্রী আন্দালুসকে পর্তুগাল ও স্পেনের

মাঝে ভাগ করে দেয়। এর অব্যবাহিত পরেই পর্তুগালের রাজার নির্দেশে জলদস্যু ভাস্কো-দা-গামা মুসলিম ভূমির সমুদ্র পথ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়ে পড়ে। সে যখন উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভারত সাগরে পৌঁছে তখন সে বলে উঠে “এই তো আমরা মুসলিম ভূমিসমূহের গলায় রশি পেঁচিয়ে ফেলেছি, এখন শুধু আমরা রশিতে টান দিবো তাহলেই তা শাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে।” পর্তুগালের পর বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইটালী ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র মুসলিম *ভূমিসমূহ জবরদখলের জন্য নিজেদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু করে। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে তারা প্রায় পুরো মুসলিম বিশ্ব দখল করে নেয়।
(আলমুস্তাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, মুহাম্মদ কুতুব, পৃ: ৪৫
মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, কাহেরা, প্রথম প্রকাশনা ১৪২০ হি.)

কিন্তু মুসলমানদের জিহাদি জজবার কারণে তারা দুদণ্ড সুস্থির হয়ে দেশশাসন করতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় মুসলমানদের একের পর এক বিদ্রোহ তাদেরকে পেরেশান করে তোলে। মুসলমানদের জিহাদী কর্মকাণ্ড তাদেরকে কতটা বেকায়দায় ফেলেছিল সেটা নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। ১৮৮২ সালে মিসর দখলের পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন বৃটিশ পার্লামেন্টে কোন রাখঢাক না রেখেই বলে, “যতদিন মুসলমানদের হাতে কোরআন থাকবে

ততদিন আমরা তাদের দেশে স্থায়ী হতে পারবো না।”
লরেন্স ব্রাউন বলে, “আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো আশংকা
সুপ্ত রয়েছে ইসলামের প্রাণবন্ত জীবন ব্যবস্থায়, যা নিজ
ভূখন্ডের সীমানা বিস্তৃত করতে ও (অন্য জাতিবর্গকে) নিজের
অধীনস্থ বানাতে সক্ষম। ইসলামই হলো ইউরোপিয়ান
উপনিবেশবাদের পথে একমাত্র বাঁধার প্রাচীর।”

(আলমুবাশশিরুনা ওয়াল মুস্তাশরিকুনা ফি মাওকিফিহিম
মিনাল ইসলাম, মুহাম্মদ আলবাহীই, মাতবাতাতুল আযহার,
পৃ: ৬ আততাবশীর ওয়াল ইস্তে'মার, মুস্তফা খালিদী, পৃ:
১৮৪ আলমাকতাবাতুল আছারিয়্যাহ, বৈরুত, পঞ্চম প্রকাশনা,
১৯৭৩ ই. আলমুস্তাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, মুহাম্মদ কুতুব,
পৃ: ১১)

মুসলমানদের জিহাদী আকিদা-বিশ্বাস শুরু থেকেই তাদের
ভয়ের কারণ ছিল, সময় সময় তারা এই ভীতি প্রকাশও
করেছে, ইংরেজী পত্রিকা ‘ইসলামী বিশ্ব’ (The Muslim
World) এর ১৯৩০ সালের জুন মাসের সংখ্যায় বলা হয়,
“পশ্চিমা বিশ্বের (ইসলামের ব্যাপারে) কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত
থাকাই উচিত। এ ভয়ের অনেক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে
একটি হলো, মক্কায় ইসলামের সূচনা থেকে শুরু করে
ইসলাম কখনো সংখ্যায় কমেনি। বরং মুসলমানদের সংখ্যা
সর্বদা বাড়ছে (এবং তাদের ভূমি) বিস্তৃত হচ্ছে। অধিকন্তু

ইসলাম শুধু (কিছু আচারপ্রথা সর্বস্ব) দীন নয়, বরং এর অন্যতম বিধান হলো জিহাদ।” রবার্ট বেন বলে, “ইতোপূর্বে মুসলমানরা পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করেছে। হয়তো তারা পুনরায় তাই করবে।” কানাডিয়ান প্রাচ্যবিদ উইলফ্রেড স্মিথ বলে, “ইউরোপ কখনো কয়েক শতাব্দী ধরে বিরাজমান সেই ভয়ভীতির কথা ভুলতে পারে না, যখন মুসলমানরা পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করার পর পুরো ইউরোপ দখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। (আলমুস্তাশরিকুনা ওয়াল মুস্তাশরিকুনা ফি মাওকিফিহিম মিনাল ইসলাম, পৃ: ৬ আলমুস্তাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, পৃ: ৭৬-৭৭ আলমুস্তাশরিকুনা ওয়াস সিরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইমাদুদ্দিন খলিল, পৃ: ২২ দারু ইবনি কাসীর, দিমাশক, প্রথম প্রকাশনা ১৪২৬ হি.)

তেমনিভাবে দীর্ঘ কয়েক শত বছর ধরে চলমান ক্রুসেড যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকেও তারা উপলব্ধি করে নেয় যে, মুসলমানদের জিহাদি জজবা মিটিয়ে ফেলা ব্যতীত তাদেরকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্রুসেডরদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান ফ্রান্সের বাদশাহ লুইস মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। সে বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য অনেক বড় অংকের মুক্তিপন ব্যয় করে। ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে সে খৃষ্টানদের উপদেশ দিয়ে বলে, “শক্তির

জোরে মুসলিমদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। কেননা মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস তাদেরকে মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা এবং তাদের ইজ্জত-সম্মান বাঁচানোর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিমরা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সর্বদাই জিহাদ করে শত্রুকে পরাস্ত করতে সক্ষম। তাই মুসলিমদের পরাজিত করার একটাই পদ্ধতি। তাদের ইসলামী চিন্তাদর্শকে পরিবর্তন করে ফেলা এবং স্নায়ু যুদ্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদেরকে দমিত করা। যার পদ্ধতি হবে ইউরোপীয়ান পন্ডিতরা ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করবে এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস দুর্বল করে দিবে, যে আকিদার বলে বলীয়ান হয়ে তারা জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়।”

(আসালিবুল গায়উইল ফিকরি, শায়েখ আলী মুহাম্মদ জুরাইশাহ, পৃ: ১৯ দারুল ওফা, তৃতীয় প্রকাশনা, ১৩৯৯ হি.)

এ সব বিষয়কে সামনে রেখে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোনো মূল্যে মুসলমানদের জিহাদি জজবা নিঃশেষ করে দিতে হবে। এবার এ কাজটাকে তারা নিজেদের লক্ষ্যে পরিণত করে। লক্ষ্য পূরণে তারা একাধিক কর্মসূচী হাতে নেয়। যেমন বিভিন্ন নামধারী আলেম জনসম্মুখে নিয়ে আসা যারা জিহাদের অর্থ বিকৃত করবে, দখলদারদের বিরুদ্ধে জিহাদ হারাম, তাদের আনুগত্য করা ফরয ইত্যাদী ফতোয়া দিবে।

মুসলিম সন্তানদের পাশ্চাত্যের আদলে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণায় গড়ে তোলা, যেন তারা নামে মুসলিম হলেও মনমগজে হয় ইউরোপীয়ান। ফলে বস্তুরাদে বিশ্বাসী ভোগবিলাসে আকর্ষণ নিমজ্জিত এ নামধারী মুসলিমরা পাশ্চাত্যের বিপক্ষে জিহাদ করা, তাদের সাথে শত্রুতার পরিবর্তে ওদেরকে খাটি মুসলিমদের চেয়েও আপন মনে করবে। মোটকথা জিহাদি জজবা স্তিমিত করার সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা তারা ব্যয় করতে শুরু করে দেয়।

আমাদের আলোচ্য ব্যাপারটিও তাদের সেই কর্মসূচীর অতি উৎকৃষ্ট একটি নমুনা। এর উৎপত্তিটা লক্ষ করুন। প্রথমে ক্যাফেরদের একপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রপাগান্ডা শুরু করে, “ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচার হয়েছে।” তারা বারবার বিভিন্ন উপলক্ষে প্রচার করতে থাকে যে, “মুসলমানরা জোরপূর্বক মানুষকে মুসলমান বানানোর জন্যই যুদ্ধই করতো। এজন্যই তাদের ইতিহাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ভরপুর”। নাদান মুসলমানেরা তাদের এই অপবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা ইসলামকে বাঁচানোর জন্য বলতে থাকে, “না, না, ইসলাম তো শান্তির ধর্ম, ইসলাম উত্তম আচরণের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলামের মতো শান্তির ধর্ম তরবারী দ্বারা প্রচারিত হতেই পারে না। ইসলাম তো শুধু আত্মরক্ষার জন্য তরবারী

উত্তোলন করতে বলে। ইসলাম প্রচারে তরবারীর কোন ভূমিকা নেই, ইত্যাদি।”

একই সময়ে কাফেরদের অন্য একটা দল মুসলমানদের বন্ধু সেজে মঞ্চে আগমন করে। তারা ইসলামের প্রতি মেকী দরদ নিয়ে ইসলাম রক্ষায় প্রচেষ্টারত মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। প্রাচ্যবিদ টমাস আর্নল্ড ‘ইসলামের দিকে আহ্বান’ (The Preaching of Islam) নামে একটা বই লেখে। যাতে সে বিভিন্ন যয়ীফ-মওয়ু কেছাকাহিনী দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ইসলাম প্রচারে তরবারীর কোনো ভূমিকা নেই। ইসলাম তো প্রচার হয়েছে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার সাথে ইসলামী শাসনব্যবস্থার ঐক্যের মাধ্যমে। প্রথমে ইসলামের উপর আক্রমণের পর যখন তাদেরই একপক্ষ বাহ্যত ইসলামের পক্ষ নিল তখন মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের পক্ষের লোক মনে করল এবং তারা সকলে মিলে প্রথমবার করা আপত্তির জবাব দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জবাব দিতে দিতে তাদের গলদঘর্ম হবার জোগাড়। এর মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরে নিজেদের অজান্তেই ‘ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা নেই’ এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে গেল। আক্রমণের জবাবে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মূল ষড়যন্ত্রটি বোঝার সুযোগ আর তাদের হল না। এভাবে ইসলামের

চূড়ান্ত দুশমন এই পাপিষ্ঠরা ‘সাপ হয়ে কাটা ওঝা হয়ে
ঝাড়া’ র ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো এবং তাদের বড়সড় একটি
লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়ে গেল। (আলমুস্তাশরিকুন ওয়াল
ইসলাম, পৃ: ৭৮-৮০)

কাফেরদের উপরোক্ত দ্বিতীয় পক্ষকে মুসলমানরা কতটা
নিজেদের পক্ষীয় লোক মনে করেছে এবং তাদের বক্তব্যের
সাথে কতটা ঐকমত্য পোষণ করেছে সেটা আপনারা
নিম্নোক্ত ব্যাপারটি থেকে আঁচ করতে পারবেন। উপরোক্ত
প্রাচ্যবিদ টমাস আর্নল্ডের ‘ইসলামের দিকে আহ্বান’ বইটা
তিন তিনজন আরব মুসলিম আরবীতে ভাষান্তর করে।
এমনকি তারা বইয়ের ভূমিকায় ওই নরাধমের প্রশংসায় খেই
হারিয়ে ফেলে বলে, “এই বইয়ের লেখক এত বিদগ্ধ পন্ডিত
ও ইতিহাসবিদ যার যথাযথ প্রশংসা করা আমাদের পক্ষে
সম্ভব নয়।” (আহাম্মিয়াতুল জিহাদ, আলী বিন নুফাঈ, পৃ:
২৪৪)

যাইহোক, এভাবে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ আর
জবাবদানের ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে প্রায় সকল মুসলমানের
অন্তরে তারা উল্লিখিত ধারণাটি বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়।
কিন্তু ইসলামের এ নাদান দোস্তুদের গ্লোগানটির উল্টোপিঠ
ভেবে দেখার সুযোগ হয়নি। তারা ভেবে দেখেনি, তরবারীর

জোরে ইসলাম প্রচার হলে সমস্যা কি? একটা কাফের যে চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে জোর করে মুসলমান বানিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথে নিয়ে আসা- কোনো কাফেরের প্রতি এর চেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কি হতে পারে? যাইহোক, কাফেরদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমানরাও এই শ্লোগান প্রচার করতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে যায়। অবস্থা আজ এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, ইসলামের সাথে তরবারীর যে কোনো ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারলেই যেন সেসব নাদান দোস্তরা তৃপ্তিবোধ করেন। ইসলামের মতো মহান ধর্ম থেকে এরকম কালিমা দূর করতে পেরে তৃপ্তির টেকুর তুলেন, দ্বীনের অনেক বড় খেদমত করে ফেলেছেন বলে মনে করেন। এভাবে নিজেদের অজান্তেই তারা শত্রুদের মানসিক দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাদের খেলার ঘুঁটিতে পরিণত হন।

‘তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়নি’ কথাটির অর্থ কী এবং সে অর্থ হিসেবে কথাটি ইসলামের সাথে কতটা সাংঘর্ষিক সেটাই এবার দেখব ইনশাআল্লাহ।

তরবারীর জোরে বা শক্তিপ্রয়োগ করে মুসলমান বানানোর অর্থ:-

তরবারীর জোরে মুসলমান বানানোর অর্থ দুটি: ১. কারো ঘাড়ে তরবারী ধরে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপপ্রয়োগ করা, বলাবাহুল্য ইসলামে এটি বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (ধর্মগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি নেই -সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৫৬) এর মেসদাক-উদ্দেশ্য এটাই। ইতিহাসে কোন কাফেরকে এভাবে মুসলমান বানানো হয়নি। আর এভাবে মুসলমান বানালে সে আন্তরিকভাবে মুমিন হবেও না, জান বাঁচাতে মুখে কলেমা পড়ে নিলেও বাস্তবে হবে মুনাফিক ।

২. তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচারের আরেকটি অর্থ হলো, প্রত্যক্ষভাবে ঘাড়ে তরবারী না ধরে পরোক্ষভাবে কৌশলে চাপপ্রয়োগ করা এবং এমন অবস্থা তৈরী করা যেন কাফেররা স্বতস্ফূর্তভাবেই মুসলমান হয়ে যায়। এ ধরনের চাপপ্রয়োগ ইসলামে শুধু আছে এতটুকুই নয় বরং এ ধরনের চাপপ্রয়োগ ইসলামী শরিয়তে ফরয করা হয়েছে। এরকম চাপপ্রয়োগের জন্যই ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ, জিযয়া ও কাফেরদের যুদ্ধবন্দী করে গোলাম বানানোর আদেশ দেওয়া আছে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উলামায়ে উম্মত এ বিধানগুলোর যে হিকমত বর্ণনা করেছেন তা সামনে রাখলেই বিষয়গুলো আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি সহ উলামায়ে উম্মতের

বক্তব্য থেকে এ বিধানগুলোর হিকমত তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার কারণে এ পর্বে এতটুকুতেই শেষ করছি, আগামীতে প্রতিটি বিধানের হিকমত এক বা একাধিক পর্বে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

৬. ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (পর্ব-২ আক্রমণাত্মক জিহাদের হিকমত ও তাৎপর্য) আক্রমণাত্মক জিহাদের হিকমত

অনেকেই প্রশ্ন করেন, ইসলাম প্রচারের জন্য জিহাদের কি প্রয়োজন? কাফেরদের দাওয়াত দিলে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করলেই তো তারা মুসলমান হয়ে যাবে। শুধু শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি-কাটাকাটির কি প্রয়োজন? কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা মানুষ শুধু হককে না চেনা, সত্য ধর্মকে উপলব্ধি করতে না পারা এ কারণেই সত্যগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়- বিষয়টা মোটেও এমন নয়, বরং বেশিরভাগ লোকই সত্যকে বুঝার পরেও নানা প্রতিবন্ধকতা ও পারিপার্শ্বিক কারণে সত্যধর্ম গ্রহণ করে না। তাই কাফেরদের যতই দাওয়াত দেওয়া হোক, তাদের সাথে যতই উত্তম আচরণ করা হোক এবং ইসলামের সত্যতা

তাদের সামনে যত উজ্জ্বল করেই তুলে ধরা হোক, এর দ্বারা খুব কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করবে। কুরআন থেকে এ বিষয়টা সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে। পুরো কুরআনে একবার সাধারণভাবে নজর বুলিয়ে যে কেউ বুঝতে পারবে, প্রধানত তিন কারণে মানুষ সত্য ধর্মগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়,

১. বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (سورة الزخرف: 23)

(হে রাসূল) আমি তোমার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী (রাসূল) পাঠিয়েছি, তখন সেখানকার বিত্তবানেরা একথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটা মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলছি। -সূরা যুখরুফ, ২৩

২. সত্যধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অহংকার ও জাত্যভিমান।

প্রত্যেক জাতি সাধারণত নিজেদেরকে অন্য জাতির চেয়ে উত্তম মনে করে, এমনকি যদি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের তেমন কোন কারণ না থাকে তথাপিও। (যেমন বর্তমান কাঙ্গাল বাঙ্গালীরা দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়ার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এতটাই অনুন্নত যে, কোন ধরণের মেশিনারি

উৎপাদনের সক্ষমতা তাদের নেই। এমনকি সামান্য কেঁচিটাও চীন-পাকিস্তান থেকে আমদানি করতে হয়। তা সত্ত্বেও তারা দিনরাত বাঙ্গালী হওয়ার কারণে নিজেদের বন্দনা গাইতে থাকে।) আর যদি এর সাথে তাদের কিছুটা শক্তি-সামর্থ্যও থাকে তবে তো তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অন্য কোন জাতির ধর্ম, বিশেষত যদি সেই ধর্মের অনুসারীরা দুর্বল হয় তবে তা গ্রহণ করা দূরে থাক- তাদের পাত্তাই দিতে চায় না। তাই তাদের নিকট সত্যধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হলে এবং তারা তা সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারলেও মেনে নিতে অস্বীকার করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইহুদীরা, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

(146) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (রাসূল সাল্লাল্লাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) এতটা ভালোভাবে চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে।” -সূরা বাকারা, ২৫৭

ফেরআউন ও তার জাতি মুসা আলাইহিস সালামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করতো। কিন্তু অহংকারের কারণে তারা মুসার আনিত ধর্ম গ্রহণ করেনি। কুরআন তাদের ব্যাপারে বলেছে,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (سورة النمل: 14)

“তারা সীমালঙ্ঘন ও অহমিকা বশত তা সব অস্বীকার করলো, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে নিয়েছিলো।” -সূরা নামল, ১৪

মক্কার কাফেররা ইসলামের সত্যত্যা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অহংকার ও হঠকারিতা বশতই নবীজির দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

“যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কেবল এ কারণেই তা অবলম্বন করেছে যে, তারা আত্মসম্মতি ও হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে।” (সূরা সোয়াদ, ২ আয়াতের তরজমার জন্য দেখুন, তাওযীছল কুরআন, ৩/১৮৬)

আয়াতের তাফসীরে ইমাম আলুসী রহ. বলেন,

وجعلها -يعني كلمة (بل) - بعضهم للإضراب عما يفهم مما من :ذُكر ونحوه، من أن مَنْ كفر لم يكفر لخلل فيه، فكأنه قيل كفر لم يكفر لخلل فيه، بل كفر تكبرا عن اتباع الحق وعنادا، ... وهو أظهر من جعل ذلك إضرابا عن صريحه ويمكن أن يكون الجواب الذي عنه الإضراب: ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم، ويشعر به الآيات بعد وسبب النزول الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، فكأنه قيل: "ص

والقرآن ذي الذكر، ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا
 وإظهار الحق لهم، بل الذين كفروا مقصرون في اتباعك
 والمراد بالعزة ما يظهرونه من "والاعتراف بالحق
 الاستكبار عن الحق.(روح المعاني 12/ 156)

সংক্ষেপে এর সারমর্ম হলো, “কাফেররা ইসলামগ্রহণ না করার কারণ এটা নয় যে, কুরআনের মাঝে কোন ত্রুটি রয়েছে, কিংবা নবীজি সাব্বানাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের নিকট সত্যকে স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে কোন কমতি করেছেন, বরং তারা অহংকারের কারণে সত্যকে বুঝেও গ্রহণ করছে না।” -রুহুল মাআনী, ১২/১৫৭

তেমনিভাবে কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি, প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের বিরোধীতা নেতৃস্থানীয় অহংকারী লোকেরাই করেছে, তারা নবীদের দাওয়াতকে নিচুশ্রেণীর লোকদের দাওয়াত বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, নিচের আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ
 (31سورة الزخرف)

“তারা বললো, এ কুরআন দুই জনপদের কোন বড় ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না কেন? (‘দুই জনপদ’ দ্বারা ‘মক্কা

মুকাররামা’ ও ‘তায়েফ’ বোঝানো হয়েছে। এতদপক্ষে এ দু’টিই ছিল বড় শহর। তাই মুশরিকরা বললো, এ দুই শহরের কোন বিত্তবান সর্দারের উপরই কুরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল। (দেখুন, সূরা যুখরুফ, ৩১ তাওযীহুল কুরআন, ৩/২৯৬ আরো দেখুন, সূরা সদ, ৮)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (سورة الأعراف: 76)

“তার সম্প্রদায়ের দাস্তিক নেতৃবর্গ, যে সকল দুর্বল লোক ইমান এনেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি এটা বিশ্বাস করো যে, সালিহ নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল? তারা বললো, নিশ্চয়ই আমরা তো তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত বাণীতে ইমান রাখি। সেই দাস্তিক লোকেরা বললো, তোমরা যে বাণীতে ইমান এনেছো আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।” -সূরা আ’রাফ, ৭৬

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (سورة الأعراف: 88)

“তার সম্প্রদায়ের দাস্তিক সর্দারগণ বললো, হে শুয়াইব! আমরা পাকাপাকিভাবে ইচ্ছা করেছি, তোমাকে ও তোমার

সাথে যারা ইমান এনেছে তাদের সকলকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদের সকলকে আমাদের দ্বীনে ফিরে আসতে হবে। শুয়াইব বললো, আমরা যদি (তোমাদের দ্বীনকে) ঘৃণা করি তবুও কি?”-সূরা আরাফ, ৮৮

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بِأَدْيِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْظُرُكُمْ كَاذِبِينَ (سورة هود 27)

“তার সম্প্রদায়ের যারা কুফর অবলম্বন করেছিলো, তারা বলতে লাগলো, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি, এর বেশি কিছু নয়। আমরা আরও দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল সেই সব লোক, যারা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন, এবং তাও ভাসা-ভাসা চিন্তার ভিত্তিতে এবং আমরা তোমার মাঝে এমন কিছু দেখতে না, যার কারণে আমাদের উপর তোমার কিছু শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে। বরং আমাদের ধারণা তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী।” -সূরা হুদ, ২৭

অহংকার সত্যধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে শত শত আয়াত রয়েছে। যারা কিছুটা হলেও কুরআন অধ্যয়ন করেন তাদের নিকট বিষয়টা অস্পষ্ট

থাকার কথা নয়। তাই এ বিষয়ে আর উদ্ধৃতি বাড়িয়ে প্রবন্ধ দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না।

৩. **রাজা-বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ।** মানুষ সাধারণভাবেই রাজা-বাদশাহদের অনুসরণ করে, বিজয়ী জাতি ও প্রভাবশালী লোকদের কথা অনুযায়ী চলে। তেমনিভাবে রাজা-বাদশাহ ও শক্তিশালী জাতিবর্গও অধীনস্ত ও দুর্বলদের কৌশলে ও চাপপ্রয়োগ করে তাদের ধর্মের অনুসারী বানিয়ে রাখে, এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ দুয়েকটি উল্লেখ করছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَلْنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. (سورة إبراهيم :

21)

“সমস্ত মানুষ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। যারা (দুনিয়ায়) দুর্বল ছিল, তারা বড়ত্ব প্রদর্শনকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে একটু বাঁচাবে?” -সূরা ইবরাহীম, ২১

কিয়ামতের দিন কাফেররা বলবে,

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَّرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (سورة الأحزاب

(67 :

‘হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। ফলে তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। -সূরা আহযাব, আয়াত: ৬৭ (আরো দেখুন, সূরা গাফির, ৪৭)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنْ
(سورة الصافات : 27 - 28) (الْيَمِينِ

তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরস্পরে সওয়াল-জওয়াব করবে। (অধিনস্তরা তাদের নেতৃবর্গকে) বলবে, তোমরাই তো অত্যন্ত শক্তিমানরূপে আমাদের কাছে আসতে। (অর্থাৎ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে যেন আমরা কিছুতেই ইমান আনি। (সূরা সাফফাত, ২৭-২৮ তাওযীছল কুরআন, আল্লামা তাকী উসমানী ৩/১৬১-১৬২)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ
بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَننَّم لُكْنَا
مُؤْمِنِينَ (سورة سبأ 31)

“তুমি যদি সেই সময়ের দৃশ্য দেখতে যখন যালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা একে অন্যের কথা রদ করবে। (দুনিয়ায়) যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতা-দর্পীদেরকে বলবে, তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।” –সূরা সাবা,

৩১

এ মর্মে কয়েকটি হাদীস

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারের নিকট প্রেরিত দাওয়াতি পত্রে লিখেন,

أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم
الأريسيين

‘ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বহুগুণ সওয়াব দান করবেন। আর যদি তুমি (ইসলাম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জনসাধারণের (ইসলাম গ্রহণ না করার) গুনাহও তোমার উপর বর্তাবে। -সহিহ বুখারী: ৭ সহিহ মুসলিম: ১৭৭৩

এ হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল
বারীতে বলেন,

قال الخطابي: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا
ط. 1/39: تقليدا له لأن الأصغر أتباع الأكابر. (فتح الباري
دار المعرفة)

“খতাবী রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
উদ্দেশ্য হলো, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না করো তাহলে
তোমার অনুসারী ও দুর্বল প্রজাদের ইসলাম গ্রহণ না করার
গুনাহের ভারও তোমার উপর বর্তাবে। কেননা তারা তোমার
অনুসরণ করেই ইসলাম গ্রহণ করবে না। কারণ দুর্বলরা
প্রভাবশালীদের অনুসরণই করে থাকে।” -ফাতহুল বারী:

১/৩৯

ইমাম বুখারী কায়েস বিন আবী হাযেম থেকে বর্ণনা করেন,

دخل أبو بكر على امرأة من أحمرس يقال لها زينب، ... قالت: ما
بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟
قال: «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم»، قالت: وما الأئمة؟
قال: «أما كان لقومك رعوس وأشراف، يأمرونهم فيطيعونهم؟»
فهم أولئك على الناس». صحيح البخاري: قالت: بلى، قال

(3834)

আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু একদিন আহমাস গোত্রের যয়নাব নামী এক মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। মহিলা তাকে প্রশ্ন করে, **জাহেলী যমানার পর যে উত্তম দীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ তায়ালা আমাদের দান করেছেন, সে দীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে টিকে থাকতে পারবো? আবু বকর রাযি. বললেন, যতদিন তোমাদের নেতৃবর্গ তোমাদের নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন।** মহিলা জিজ্ঞাসা করলো, নেতৃবর্গ কারা? আবু বকর রাযিআল্লাহু বললেন, তোমার গোত্রে কি এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক নেই, যাদের আদেশ-নিষেধ মানুষ মেনে চলে? মহিলা উত্তর দিল, হাঁ, আছে। আবু বকর বললেন, তারাই নেতৃবর্গ। -সহিহ বুখারী, ৭/৩৭৩ ইসলামী ফাউন্ডেশন

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

أئمتكم» أي لأن الناس على دين... قوله: «ما استقامت بكم ملوكهم، فمن حاد من الأئمة عن الحال مال وأمال. (فتح (ط: دار الفكر، مصور عن الطبعة السلفية 151 : 7 الباري

“(তোমরা ইসলামের উপর থাকবে) যতদিন তোমাদের

নেতৃবর্গ তোমাদের নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন”,
কেননা মানুষ তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ করে,
সুতরাং নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে সরে গেলে
সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয়, মানুষকেও পথভ্রষ্ট করে।” ফাতহুল
বারী, ৭/১৫১

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল, হক বুঝার পরও
গোঁড়ামি-অহংকার, বাপ-দাদা ও নেতাদের অনুসরণ বা
কুফরী ধর্ম বিজয়ী হওয়ার কারণে বেশীরভাগ লোক ইসলাম
গ্রহণ করে চিরস্থায়ী শান্তির পথে আসে না। এসব
প্রতিবন্ধকতা দূর করার নিমিত্তে ইসলাম ইকদামী তথা
আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশ দিয়েছে এবং কাফেরদের
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করার পাশাপাশি যুদ্ধে সক্ষম
সাধারণ কাফেরদেরও ব্যাপকভাবে হত্যা করার নির্দেশ
দিয়েছে, যেন ওদের শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর
ওদেরকে লাঞ্চিত-অপদস্থ করে জিয়য়া গ্রহণের কিংবা বন্দী
করে দাস-দাসী বানানোর আদেশ দিয়েছে। তখন
অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধাপ্রদান করার মতো কোন
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও থাকবে না এবং নিজেদের গর্ব ও
জাত্যভিমানও ওদের ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
করবে না। বরং তখন তারা লাঞ্ছনা হতে মুক্তির জন্য
বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে সম্মত হয়ে

যাবে।

উপরোক্ত বিধানগুলোর বাস্তব ফলাফল আমরা ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, যখনই মুসলমানরা যুদ্ধ করে কাফেরদের দেশ দখল করে নেয়, তাদের প্রভাবশালী লোকদের হত্যা করে এবং ইসলাম বিজয়ী ধর্ম হিসেবে আভির্ভূত হয় তখন খুব সহজেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে *সূরা নাসরের আয়াতগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ (1) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
فَسَيِّئٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَنْعِفِرُهُ (2) أَفْوَاجًا

‘যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি আল্লাহর প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করবে। -সূরা নাসর, আয়াত : ১-

৩

আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিজয়ের দ্বারা দ্রুততম সময়ে বিপুল পরিমাণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

সামনে কয়েকটি আয়াতের তাফসীরসহ উলামায়ে কেরামের আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি যেগুলোতে ইকদামী জিহাদ,

নেতৃস্থানীয় কাফেরদেরকে হত্যা করার উপকারিতা ও পরোক্ষ চাপপ্রয়োগের ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সম্মানিত পাঠকদের মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করার সবিনয় অনুরোধ করছি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“তোমরা সর্বোত্তম উত্তম, তোমাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।”
-সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

السؤال الأول: من أي وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة في سائر الأمم؟

والجواب: قال القفال: تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأكبر الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللسان وباليد، وأقواها ما يكون بالقتال، لأنه إلقاء النفس في خطر القتل وأعرف المعروفات الدين الحق والإيمان بالتوحيد والنبوة، وأنكر المنكرات: الكفر بالله، فكان الجهاد في الدين

محملاً لأعظم المضار لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع، وتخليصه من أعظم المضار، فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات، ولما كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع، لا جرم صار ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقرؤا بما أنزل الله، وتقاتلونهم عليه و«لا إله إلا الله» أعظم المعروف، والتكذيب هو أنكر المنكر ثم قال القفال: فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف، وذلك لأن أكثر الناس يحبون أديانهم بسبب الألف والعادة، ولا يتأملون في الدلائل التي تورده عليهم فإذا أكره على الدخول في الدين بالتحويق بالقتل دخل فيه، ثم لا يزال يضعف ما في قلبه من حب الدين الباطل، ولا يزال يقوى في قلبه حب الدين الحق إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحق، ومن استحقاق العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم. (الفتسير الكبير: 8/324 دار إحياء التراث العربي)

প্রশ্ন: সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা দেওয়া এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনা কিভাবে সর্বোত্তম জাতি হওয়ার মাধ্যম হলো, অথচ এ গুণাবলী তো সব উম্মতের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল?

উত্তর: কাফফাল রহ. বলেন, অন্যান্য উম্মতের উপর এ উম্মতকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো এ উম্মত সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা তথা যুদ্ধের মাধ্যমে করবে, কেননা সৎকাজের আদেশ অন্তর,

মুখ, ও হাতের মাধ্যমেও হয়, কিন্তু তা সবচেয়ে কার্যকরীভাবে হয় যুদ্ধের মাধ্যমে, কেননা এতে নিহত হওয়ার আশংকা থাকে। আর সবচেয়ে বড় সৎকাজ হলো সত্য ধর্ম এবং তাওহিদ ও নবুওয়াতের প্রতি ইমান আনা। আর সবচেয়ে বড় অন্যায় হলো কুফর। সুতরাং ধর্মের জন্য জিহাদ হলো অন্যকে সবচেয়ে বড় কল্যাণের পথে নিয়ে আসা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন করা। এ কারণেই জিহাদ সবচেয়ে বড় ইবাদত। আর যেহেতু আমাদের ধর্মে পূর্ববর্তী ধর্মের তুলনায় জিহাদের গুরুত্ব বেশি তাই এই জিহাদই অন্যান্য উম্মতের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এ বিষয়টিই ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘তোমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদের উত্থান হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়ার এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধিবিধান মেনে নেওয়ার আদেশ দিবে, এজন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্যপ্রদান হলো সবচেয়ে বড় সৎকাজ আর কুফর হলো সবচেয়ে মন্দ কাজ।’

এরপর কফফাল বলেন, **দীনের জন্য যুদ্ধ করার উপকারিতা কোন ন্যায়পরায়ণ মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। কেননা অধিকাংশ মানুষই ঘনিষ্ঠতা ও অভ্যাসের কারণে নিজের ধর্মকে ভালোবাসে, এবং (ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে)**

তাদের সামনে যে দলিল পেশ করা হয় তা নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করে না। যখন তাদেরকে হত্যার ভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানো হয় তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তাদের অন্তরে বাতিল ধর্মের প্রতি লালিত ভালোবাসা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং সত্য ধর্মের ভালোবাসা দৃঢ় হতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে তারা বাতিল ধর্ম ছেড়ে সত্য ধর্মকে আপন করে নেয় এবং চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী পুরস্কার লাভের হকদার হয়। -

তফসীরে রাযী: ৮/৩২৪

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেন,

اعلم أن أتم الشرائع وأكمل النواميس هو الشرع الذي يؤمر فيه مثله كمثل - بالجهاد، وذلك لأن تكليف الله عباده بما أمر ونهى رجل مرض عبيده، فأمر رجلا من خاصته أن يسقيهم دواء، فلو أنه قهرهم على شرب الدواء، وأوجره في أفواههم لكان حقا، لكن الرحمة اقتضت أن يبين لهم فوائد الدواء؛ ليشرّبوه على رغبة فيه، وأن يخلط معه العسل؛ ليتعاضد فيه الرغبة الطبيعية والعقلية.

ثم إن كثيرا من الناس يغلب عليهم الشهوات الدنية والأخلاق السبعية ووساوس الشيطان في حب الرياسات، ويلصق بقلوبهم رسوم آبائهم، فلا يسمعون تلك الفوائد، ولا يذعنون لما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأملون في حسنة، فليست الرحمة في حق أولئك أن يقتصر على إثبات الحجة عليهم، بل الرحمة في حقهم أن يقهروا؛ ليدخل الإيمان عليهم على رغم أنفهم بمنزلة إيجاد الدواء المر، ولا قهر إلا بقتل من له منهم

بكناية شديدة وتمنع قوى، أو تفريق منعتهم وسلب أموالهم حتى يصيروا لا يقدرّون على شيء، فعند ذلك يدخل أتباعهم وذرائعهم في الإيمان برغبة وطوع، ولذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كان عليك إثم الأريسيين وربما كان أسرهم وقهرهم يؤدي إلى إيمانهم، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل.

وأيضاً فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلى البشر أن يهديهم الله إلى الاحسان، وأن يكبح ظالمهم عن الظلم، وأن يصلح ارتفاقاتهم وتدبير منزلهم وسياسة مدينتهم، فالمدن الفاسدة التي يغلب عليها نفوس السبعية، ويكون لهم تمنع شديد إنما هو بمنزلة الأكلة في بدن الإنسان لا يصح الإنسان إلا بقطعه، والذي يتوجه إلى إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لا بد له من القطع، والشر القليل إذا كان مفضياً إلى الخير الكثير واجب فعله،

ولك عبرة بقريش ومن حولهم من العرب كانوا أبعد خلق الله عن الاحسان وأظلمهم على الضعفاء، وكانت بينهم مقاتلات شديدة، وكان بعضهم يأسر بعضاً، وما كان أكثرهم متأمليين في الحجة ناظرين في الدليل فجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أشدهم بطشاً وأحدهم نفساً حتى ظهر أمر الله، وانقادوا له، فصاروا بعد ذلك من أهل الإحسان، واستقامت أمورهم، فلو لم يكن في الشريعة جهاد أولئك لم يحصل اللطف في حقهم. (حجة هـ) 1426 :الله البالغة: 2/264 ط. دار الجيل

“সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত তাই যাতে জিহাদের বিধান রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের যে আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো যার গোলামরা

অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাই সে তার ঘনিষ্ঠ কাউকে গোলামদের ওষুধ খাওয়াতে বলে, এখন যদি সেই ব্যক্তি ওদেরকে ওষুধ খেতে বাধ্য করে এবং (জোরপূর্বক) তাদের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয় তাহলে তা ভালো কাজই হবে। কিন্তু রহমতের তাকায়া হলো তাদেরকে ওষুধের উপকারিতা বুঝিয়ে দেওয়া, যেন তারা সাগ্রহে তা সেবন করে, এবং ওষুধের সাথে মধু মিশিয়ে দেওয়া যেন বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহের পাশাপাশি স্বভাবগত আগ্রহও সৃষ্টি হয় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।

কিন্তু অনেক মানুষের উপর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, পশুত্ব ও শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রবল হয়ে যায়, এবং তাদের অন্তর বাপ-দাদার আচার-রীতির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা (ইসলামের ধর্মের) উপকারিতাগুলো শুনতে চায় না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদেশ দেন তা মেনে নেয় না, কল্যাণকর বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে শুধু ইসলামের সত্যতার প্রমাণ পেশ করাই যথেষ্ট নয়। বরং রহমতের তাকায়া হলো তাদেরকে পর্যুদস্ত করা হবে যেন ইমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে, অনেকটা (জোরপূর্বক) তিক্ত ওষুধ পান করানোর মত। আর তাদেরকে পর্যুদস্ত করার পদ্ধতি হলো তাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী তাদের হত্যা করা

হবে কিংবা তাদের দলকে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হবে এবং ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে, যেন (ইসলামের বিপক্ষে) তাদের কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর মত কোন শক্তিই অবশিষ্ট না থাকে। তখন তাদের অনুসারী ও সন্তান-সন্ততিরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারের নিকট প্রেরিত চিঠিতে লিখেন, (যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর) তাহলে তোমাকে তোমার অনুসারীদের (ইসলাম গ্রহণ না করার) গুনাহের ভারও বহন করতে হবে।

কখনো তাদেরকে বন্দী ও পর্যুদস্ত করা তাদের ইমানের কারণ হয়। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل

‘আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিদের দেখে অবাক হন যাদেরকে শিকলেবন্দী করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়’। [সহিহ বুখারী: ৩০১০]

তাছাড়া এটাও মানবজাতির প্রতি রহমতের দাবী যে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদেরকে (একে অপরের প্রতি) অনুগ্রহ করার দিকে পথপ্রদর্শন করবেন, যালেমদের যুলুম হতে বিরত রাখবেন, এবং মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ও শহর-নগর পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু যে শহরগুলোর

ক্ষমতা মন্দ লোকেরা দখল করে নেয় এবং তাদের প্রতাপ ও শক্তি থাকে তারা মানব দেহের পচনশীল ক্ষতের ন্যায়, তা কেটে ফেলা ব্যতীত মানুষ সুস্থতা লাভ করতে পারে না। চিকিৎসক তা কেটে ফেলতে বাধ্য। কেননা সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করা গেলে তো সেই ক্ষতিকে মেনে নিতেই হয়।

এ ব্যাপারে কুরাইশ ও তাদের পাশ্চবর্তী আরবদের ঘটনা আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত। তারা একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল। দুর্বলদের উপর সবচেয়ে বেশি জুলুম করত। পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ লিপ্ত হতো, একে অপরকে বন্দী করত। তাদের অধিকাংশই দলিল-প্রমাণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে জিহাদ করলেন এবং তাদের মধ্যে যারা প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল তাদের হত্যা করলেন। ফলে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হলো এবং কুরাইশ ও অন্যান্য আরবরা রাসূলের অনুগত হয়ে একে অপরের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে গেল। তাদের অবস্থার সংশোধন হয়ে গেল। যদি শরিয়তে তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ না থাকতো তাহলে তাদের প্রতি দয়া করা হতো না।” -হুজ্জাতুল্লাহির বালেগা: ২/২৬৪

নেতৃস্থানীয় কাফেরদের হত্যা করার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে فَقَاتِلُوا
أَئِمَّةَ الْكُفْرِ “তোমরা কুফর নেতৃবর্গের সাথে যুদ্ধ করো।” -
সূরা তাওবা, আয়াত, ১২

বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলে আবু
বকর রাযি. তাদের থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে
বলেন, কিন্তু উমর রাযি. বলেন,

أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب
عنقه، وتمكني من فلان نسيبا لعمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء
أئمة الكفر وصناديدها

‘আমার মত হলো, আমরা নিজ হাতে তাদেরকে হত্যা
করবো, আলী তার ভাই আকীলকে হত্যা করবে, এবং আমি
আমার আত্মীয় অমুককে হত্যা করবো। কেননা এরাই
কুফরীর নেতৃবর্গ’। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আবুবকরের পরামর্শ গ্রহণ করে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে
ছেড়ে দেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

مَا كَانَ لِإِنبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُؤْخَذَ فِي الْأَرْضِ

“কোন নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, যমিনে (শত্রুদের)
রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করার পূর্বে তার কাছে কয়েদী
থাকবে।” -সূরা আনফাল, আয়াত: ৬৭

অর্থাৎ কাফেরদের পাইকারী হারে হত্যা করে তাদের শক্তি খর্ব করতে হবে এবং ওদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে হবে, যেন ওরা মুসলমানদের বিপক্ষে আর কখনো কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। এর পূর্ব পর্যন্ত ওদেরকে বন্দী করা এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অবকাশ নেই। এ বিষয়টিই অপর আয়াতে সুস্পষ্টরূপে এসেছে, ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَنُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوَتَّاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

“কাফেরদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হলে তাদের গর্দান উড়াতে থাকো। অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবে তখন তাদেরকে (বন্দী করে) শক্তভাবে বাঁধবে। তারপর হয়তো (তাদেরকে) মুক্তি দিবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে।” -সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৪

ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف

অর্থাৎ তোমরা শত্রুদের মুখোমুখী হলে তাদের কচুকাটা করো। -তায়ফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/৩০৭

আয়াতটির তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম জাসসাস

রহিমাল্লাহুল্ব বলেন,

لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإتيان في القتل
وكان - وحظر عليه الأسر - إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم
ذلك وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين،
فمتى أئخذ المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء
أحكام القرآن: 5 : 269 ط. دار إحياء التراث العربي: 1405)
(هـ)

“আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত
করতে বলেছেন এবং মুশরিকদের লাঞ্চিত করা ও তাদের
শক্তি খর্ব করার পূর্বে বন্দী করতে নিষেধ করেছেন, ...
সুতরাং মুশরিকদের পাইকারীহারে হত্যা করা, ওদেরকে
হত্যা ও নির্বাসনের মাধ্যমে অপদস্থ করার পরই ওদেরকে
জানে বাঁচানো জায়েয হবে।”-আহকামুল কুরআন, ৫/২৬৯

গত শতাব্দীর বরেণ্য আলেম শায়েখ আব্দুর রহমান সাদী
বলেন,

يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم، ونصرهم على
أعدائهم {فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} في الحرب والقتال، فاصدقوهم
القتال، واضربوا منهم الأعناق، حَتَّى تَتَخَنَوْهُمْ وَتَكْسِرُوا شُوكَتَهُمْ
وتبطلوا شرّتهم، فإذا فعلتم ذلك، ورأيتم الأسر أولى وأصلح،

فَسَدُّوا الوَثَاقَ { أي: الرباط، وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، {
 فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم،
 فإذا كانوا تحت أسركم، فأنتم بالخيار بين المن عليهم، وإطلاقهم
 بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا
 أنفسهم، أو يشتريهم أصحابهم بمال، أو بأسير مسلم عندهم.
 (تفسير السعدي ص 784 ط. مؤسسة الرسالة)

‘আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের কল্যাণ এবং শত্রুদের উপর
 বিজয়ী হওয়ার পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, যখন
 যুদ্ধে তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন ওদের বিরুদ্ধে
 বীরবিক্রমে যুদ্ধ কর, ওদের গর্দান উড়াতে থাকো, যতক্ষণ
 না তাদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করে তাদের শক্তি খর্ব
 করতে পার এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমরা নিরাপদ হয়ে
 যাও। এরপর তোমাদের নিকট বন্দী করা ভালো মনে হলে
 তাদের কষে বাধো। কষে বাধতে বলা হয়েছে যেন ওরা
 পলায়ন করতে না পারে এবং মুসলমানরা তাদের পলায়ন ও
 অনিষ্ট হতে নিরাপদ হয়ে যায়। বন্দী করার পর তোমাদের
 ইখতিয়ার থাকবে তোমরা চাইলে তাদের উপর অনুগ্রহ করে
 মুক্তিপণ ব্যতীতই তাদের ছেড়ে দিতে পারো আর চাইলে
 তাদের থেকে মুক্তিপণ নিতে কিংবা তাদের মাধ্যমে বন্দী
 বিনিময় করতে পারো।’ -তাহফসীরে সাহীদী, পৃ: ৭৮৪

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী রহ.
ও একই তাফসীর করেছেন, তিনি বলেন,

تمھارا جب کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو
(یعنی قتل کرو) یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون
جس کی حد یہ ہے کہ اب اگر قتل (ریزی کر چکو
موقوف کر کے بجائے اس کے قید پر اکتفاء کیا جائے تو
محتمل مضرتِ مسلمین و غلبہ کفار نہ ہو) تو (اس وقت کفار
کو قید کر کے) خوب مضبوط باندھ لو پھر اس کے بعد (علی
سبیل منع الجمع تم کو دو باتوں کا اختیار ہے) یا تو بلا
بیان (معاوضہ چھوڑ دینا اور یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا
القرآن: 3/409)

“کافرদের ساتھ তোমাদের যুদ্ধ হলে তোমরা তাদের হত্যা
করো, যখন তোমরা তাদের প্রচুর পরিমাণে হত্যা করবে
(যার সীমা হলো এখন তাদের হত্যা করার পরিবর্তে বন্দী
করা হলেও কافرদের বিজয় কিংবা তাদের দ্বারা
মুসলমানদের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না) তখন তাদের বন্দী
করে মযবুত ভাবে বাধো। এরপর হয়তো বিনামূল্যে ছেড়ে
দিবে কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছাড়বে।” -বয়ানুল কুরআন

৩/৪০৯

شاہخول ইসলাম آلملما شاکر آلملم ءسملانی رلم.

بللم،

یعنی حق اور باطل کا مقابلہ تو رہتا ہی ہے۔ جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری مضبوطی اور بہادری سے کام لینا چاہئے۔ باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے شریروں کو مارے جائیں اور انکے جتھے توڑ دیے جائیں۔ اس لئے ہنگامہ کارزار میں کسل، سستی، بزدلی اور توقف و تردد کو راہ نہ دو۔ اور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو۔ کافی خونریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے۔ قال [تعالیٰ]: [مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْجِرَ فِي الْأَرْضِ] یہ قید و بند ممکن ہے ان کے لئے تازیانہ عبرت کا کام دے اور مسلمانوں کے پاس رہ کر انکو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع بہم پہنچائے شدہ شدہ وہ لوگ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں۔ یا مصلحت سمجھو تو بدون کسی معاوضہ کے ان پر احسان کر کے قید سے رہا کرو۔ اس صورت میں بہت سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ زر فدیہ لے کر یا مسلمان قیدیوں کے مبادلہ میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو اس میں کئی طرح کے فائدے ہیں۔ بہر حال اگر ان اسیران جنگ کو انکے وطن کی طرف واپس کر و تو دو ہی صورتیں ہیں۔ معاوضہ میں چھوڑنا یا بلا معاوضہ رہا کرنا۔ ان میں جو صورت امام کے نزدیک اصلح ہو اختیار کر سکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدير اور شامی وغیرہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں ہاں اگر قیدیوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت نہ ہو تو پھر تین

صورتیں ہیں۔ ذمی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا یا غلام بنا
فوائد عثمانی ص 216-217 ط. فرید بك) لینا، یا قتل کر دینا۔
(ڈپو)

“অর্থাৎ হক ও বাতিলের লড়াই তো চিরন্তন। সুতরাং
মুসলামনদের কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় বীরত্বের সাথে
অটল থেকে যুদ্ধ করতে হবে। বাতিলের শক্তি তখনই খর্ব
হবে যখন ধাড়ি শয়তানগুলোকে হত্যা করা হবে এবং
তাদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে।
তাই কাফেরদের সাথে যুদ্ধে ভীরুতা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব করো না
এবং তাদের গর্দান উড়াতে ভয় করো না। যথেষ্ট পরিমাণ
রক্তপাত করার পর যখন কাফেরদের অন্তরে তোমাদের ভয়
জমে যায় এবং কাফেরদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় তখন বন্দী
করাও যথেষ্ট। আব্বাহ তায়লা বলেন, “কোন নবীর পক্ষে
এটা শোভনীয় নয় যে, যমিনে (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে
প্রবাহিত করার পূর্বে তার কাছে কয়েদী থাকবে।”
এই বন্দীত্ব তাদের জন্য উপদেশ ও দৃষ্টান্ত হতে পারে।
পাশাপাশি মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনাচার
প্রত্যক্ষ করা এবং ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার
সুযোগ হবে, ধীরে ধীরে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। আর
যদি ভালো মনে করো তাহলে মুক্তিপণ ব্যতীত বা মুক্তিপণ
নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারো। এতে অনেকেই তোমাদের

অনুগ্রহ ও উত্তম চরিত্র দেখে তোমাদের ধর্মের প্রতি আগ্রহী হবে এবং তোমাদের মহব্বত করবে ।” -তাফসীরে
উসমানী: পৃ: ২১৬-২১৭

দেখুন, কাফেরদের সাথে শুধু দাওয়াত ও উত্তম আচরণই যদি তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হতো তাহলে নবীজির দশ বছরের দাওয়াতে মক্কাবাসীরা মুসলিম হলো না কেন? রাসূল কি -নাউযুবিল্লাহ- তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করেছেন, না তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেননি? আসলে দয়া-উত্তম আচরণের দ্বারা কাজ হয় বিজয়ী হওয়া, বন্দী করা ও দাসদাসী বানানোর পরে। কেননা বিজয়ী জাতি ও মনিবরা যখন বিজিত জাতি, তাদের যুদ্ধ বন্দী ও দাসদাসীদের প্রতি দয়া করে তখন তা তাদের উত্তম আখলাক ও নৈতিকতার পরিচয় হয়। এজন্যই যখন মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল কাফেরদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন তখন তারা খুব দ্রুত মুসলমান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পরাজিত জাতি বিজয়ী জাতির সাথে উত্তম আচরণ করলে সেটা তাদের উত্তম আখলাকের দলিল হওয়া তো দূরে থাক, বরং অনেক সময়ই বিজয়ীরা মনে করে তারা আমাদের শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে তোষামোদ স্বরূপ উত্তম আচরণ করছে। তাই বিজয়ের পূর্বে উত্তম আচরণ তেমন ফলদায়ক হয় না।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পাঠক আপনি নিজেই
বিবেচনা করুন ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা আছে কি
না এবং থাকলে তার মাত্রা কতখানি। আরো দেখুন কৌশলে
তাদের উপর ইসলাম গ্রহণের চাপপ্রয়োগ করা হচ্ছে কি না।

চলবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পর্বের লিংক-

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232488%3B>

৭.ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (তৃতীয় পর্ব, জিযয়ার
বিধানের হিকমত ও তাৎপর্য)

কাফেরদের থেকে জিযয়া গ্রহণের হিকমত ও তাৎপর্য

(আক্রমণাত্মক জিহাদ কিভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে
ভূমিকা রাখে এ সম্পর্কে গত পর্বে (লিংক কমেণ্টে) আমরা
বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ পর্বে ইসলাম প্রচারে
জিযয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।)

জিযয়ার বিধানের ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, জিযয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে কুফরীতে বহাল রাখা নয়। বরং জিযয়ার উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের ইসলামী হুকুমতের অধীনে মুসলমানদের সাহচর্যে থাকার সুযোগ করে দেওয়া। যেন তারা ইসলামের সত্যতার দলিল-প্রমাণ এবং ইসলামী বিধিবিধানের সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবহিত হতে পারে। **এর পাশাপাশি তাদেরকে কিছুটা লাঞ্চিত-অপদস্থও করতে হবে। যেন লাঞ্ছনা-অপদস্থতা থেকে বাঁচা এবং সত্য ধর্ম গ্রহণের যুগপৎ প্রেরণা তাদেরকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করে।**

জিযয়ার হিকমত ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম রাযী রহ. বলেন,

ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه وإمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام وقوة دلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن تحمل الذل والصغار، فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر، فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى الإسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزية. (16/27 ط. دار إحياء التراث العربي)

“জিযয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য কাফেরদের কুফরের উপর বহাল

রাখা উদ্দেশ্য নয়। বরং জিয়য়া নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো তার জীবন রক্ষা করা এবং কিছু সময়ের জন্য তাকে অবকাশ দেওয়া, যেন সে এই সময়ে ইসলামের সৌন্দর্য ও ময়বুত দলিল-প্রমাণের ব্যাপারে অবগতি লাভ করে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

জিয়য়া নেওয়ার পাশাপাশি কুফরের কারণে কাফেরকে লাঞ্চিত ও অপদস্থ করতে হবে, কেননা বুদ্ধিমান মানুষ লাঞ্ছনা-অপমান সহ্য করতে পারে না। যখন কাফেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করবে, দলিল-প্রমাণ শুনবে এবং কুফরের মধ্যে লাঞ্ছনা ও যিহ্নতি প্রত্যক্ষ করবে। তখন সে খুব সহজেই ইসলাম গ্রহণ করবে। এটাই জিয়য়া গ্রহণের উদ্দেশ্য। -তাবসীরে রাযী: ১৬/২৭

হাফেয ইবনে হাজার রহ. সহিহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেন,

قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. (فتح الباري: 6 : 259 ط. دار الفكر)

“আলেমগণ বলেন, জিযয়া গ্রহণের হিকমত হলো তাদেরকে এর মাধ্যমে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করা, যেন তা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, পাশাপাশি তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামের সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবগতি লাভ করবে।” -ফাতহুল বারী, ৬/২৫৯ - আরো উদ্ধৃতির জন্য দেখুন, মাবসুতে সারাখসী, ১০/৭৭ দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪১৪ হি. বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১১১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তৃতীয় প্রকাশনা, ১৪০৬ হি. রদ্দুল মুহতার, আল্লামা শামী, ৪/২০০ দারুল ফিকর, দ্বিতীয় প্রকাশনা, ১৪১২ হি. আললুবাব ফি ইলমিল কিতাব, ইবনে আদেল হাম্বলী, ১০/৬৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশনা, ১৪১৯ হি. মওসুয়াহ ফিকহিয়াহ, ১৫/১৫৮

কুরআন কাফেরদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করে তাদের থেকে জিযয়া গ্রহণের আদেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে না এবং পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে

নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো,
যতক্ষণ না তারা হেয় হয়ে নিজে হাতে জিযয়া প্রদান করে।”
-সূরা তাওবা, ২৯

এ লাঞ্ছনার পদ্ধতি কেমন হবে? কিভাবে যিস্মী কাফেরদের
অপমানিত করা হবে?- এর বিস্তারিত বিবরণ হাদিস ও
আছারে সাহাবার আলোকে ফুকাহায়ে কেলাম লিপিবদ্ধ
করেছেন। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে এ সম্পর্কে
এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। ‘অমুসলিমদের সাথে
মুসলিমদের আচরণবিধি’ শিরোনামে যিস্মীদের লাঞ্ছিত করার
বিস্তারিত পদ্ধতি নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা আলাদা প্রবন্ধ
লিখবো। এখানে উদাহরণস্বরূপ শুধু একটি হাদিস ও একটি
আছার উল্লেখ করছি:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن
سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: «لا تبدعوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم
أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه». (صحيح مسلم :
(2167

“ইহুদী ও নাসারাদের আগে সালাম দিও না। আর তাদের
কাউকে পথে দেখলে তাকে পথের সংকীর্ণতম অংশে চলতে
বাধ্য করো।” -সহিহ মুসলিম, ২১৬৭ (ইফা, ৫/১৮৪)

শামের খৃষ্টানদের সাথে সন্ধির সময় উমর রাযি. এর
শর্তাবলী, যা ইতিহাসে 'শুরতে উমারিয়াহ' নামে প্রসিদ্ধ-

عن عبد الرحمن بن غنم، قال: «كُتبت لعمر بن الخطاب رضي
الله عنه حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا
كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا،
إنكم لما قدمتم علينا سألتناكم الأمان لأنفسنا وذراريها وأموالنا
وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا
ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب،
ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحبي ما كان منها في خطط
المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في
ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل
من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم، وأن لا نؤمن في
كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم
أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع
أحدا من قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراه، وأن نوقر
المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسا، ولا
نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين
ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، ولا نركب
السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا
نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمر، وأن
نجز مقادير رءوسنا، وأن نلزم زينا حيث ما كنا، وأن نشد
الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر صلبنا وكتبتنا في شيء من
طريق المسلمين ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصليب على
كنائسنا، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرة
المسلمين، وأن لا نخرج سعانينا ولا باعونا، ولا نرفع أصواتنا
مع أمواتنا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق
المسلمين، ولا نجاوزهم موتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى

عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم.

فلما أتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقيلنا منهم الأمان، فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمنناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاوة». راجع: معجم ابن المقرئ (365) السنن الكبرى للبيهقي، (18717) أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل للخلأل (1000) وتفسير ابن كثير

“এ হচ্ছে শাম দেশের অমুক অমুক নগরের অধিবাসীগণের পক্ষ হতে আল্লাহর বান্দা আমীরুল-মুমিনীন উমরকে প্রদত্ত লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহ- “আপনারা যখন আমাদের নিকট আগমন করিলেন, তখন আমরা নিজেদের জন্য, আমাদের সম্ভান-সম্ভতির জন্য, আমাদের ধন-সম্পত্তির জন্য এবং আমাদের ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্য আপনাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করলাম। উক্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে: আমরা আমাদের নগরে বা তার চারপাশে কোথাও কোন নতুন গীর্জা ও ইবাদতখানা নির্মান করবো না; কোন পুরাতন গির্জা মেরামত করবো না; ইতিপূর্বে যে গীর্জা ও ইবাদতখানা মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে সেগুলোকে পুনরায় গির্জা ও ইবাদতখানায় রূপান্তর করবো না; আমাদের কোন গির্জায় দিনে বা রাতে কোন

মুসলমান অবস্থান করতে চাইলে তাকে বাঁধা দিবো না;
আমাদের গির্জাগুলোর দ্বারসমূহ পথিক ও মুসাফিরদের জন্য
উন্মুক্ত রাখবো; কোন পথিক মুসলমান আমাদের
আবাসস্থলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তিনদিন পর্যন্ত
তার মেহমানদারী করবো; আমাদের গির্জায় বা বাসস্থানে
কোন গুপ্তচরকে আশ্রয় দিবো না; মুসলমানদের সাথে
কোনরূপ প্রতারণমূলক আচরণ করবো না; আমাদের
সন্তানদের কুরআন শিখাবো না; প্রকাশ্যে কোন প্রকার শিরক
করবো না, কাউকে শিরকের প্রতি আহ্বানও জানাবো না;
আমাদের কোন আত্মীয় ইসলামগ্রহণ করতে চাইলে তাকে
বাধা দিবো না; মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো;
কোন মুসলমান আমাদের মজলিসে বসতে চাইলে আমরা
উঠে গিয়ে তার জন্য জায়গা করে দিবো; মুসলমানদের
লেবাস-পোশাকের ন্যায় কোন লেবাস-পোশাক আমরা
পরিধান করবো না; টুপি পরবো না; পাগড়ী ব্যবহার করবো
না; (দামী) জুতো পরবো না; মাথায় সিঁথি কাটবো না;
মুসলমানদের ভাষার ন্যায় ভাষা ব্যবহার করবো না;
মুসলমানদের উপনামের ন্যায় উপনাম গ্রহণ করবো না;
অশ্বাদি ও বাহনে গদি ব্যবহার করবো না; গলায় তরবারি
ঝুলিয়ে চলাফেরা করবো না; কোন প্রকারের অস্ত্র রাখবো
না; কোন প্রকারের অস্ত্র বহন করবো না; আংটিতে আরবী
ভাষায় কোন কিছু খোদাই করবো না; মদের বেচা-কেনা

করবো না; মাথার সম্মুখভাগের চুল ছেটে ফেলবো; যেখানেই থাকি না কেন সর্বত্র ও সর্বদা টিকি রাখবো; দেহে পৈতাধারণ করবো; গির্জায় প্রকাশ্য স্থানে ত্রুশ রাখবো না; মুসলমানদের রাস্তায় বা তাদের বাজারে ত্রুশ বা নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করবো না; গির্জায় উচ্চ শব্দে ঘন্টা বাজাবো না; মুসলমানদের উপস্থিতিতে গির্জায় উচ্চস্বরে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করবো না; ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কোনরূপ মিছিল বের করবো না; মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করবো না; মুসলমানদের রাস্তা বা বাজারের মধ্য দিয়ে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাবো না; কোন মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত দাসকে ব্যবহার করবো না; পথিক মুসলমানদের প্রয়োজনে তাকে পথ দেখিয়ে দিবো এবং কোন মুসলমানের ঘরে উঁকি মারবো না।

আবদুর রহমান বিন গানাম আশআরী রহ. বলেন, উপরোক্ত চুক্তিপত্র নিয়ে আমি উমর রা. এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাতে নিম্নোক্ত শর্তগুলো সংযোজিত করেন: আমরা কোন মুসলমানকে প্রহার করবো না। উক্ত শর্তসমূহকে মেনে নিয়ে আমরা নিরাপত্তা লাভ করলাম। আমরা উক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত ভঙ্গ করলে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাদের (মুসলমানদের) উপর কোন

দায়িত্ব থাকবে না। এমতাবস্থায় আমাদের সাথে শত্রুর ন্যায়
আচরণ করা আপনাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে।” –সুন্নে
বাইহাকী, হাদিস: ১৮৭১৭ তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইফা,
৪/৫৬৬

বর্তমানে প্রায় সব আলেমের মুখেই শুনা যায়, ইসলাম
যিস্মীদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, তাদেরকে মুসলিমদের
সমান অধিকার দেয়। তারা বলেন, অমুসলিম থেকে জিযয়া
নেয়া হয়, শুধু মাত্র রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স হিসেবে, ইসলামী হুকুমত
কর্তৃক যিস্মীদের নিরাপত্তা বিধানের বিনিময় হিসেবে,
যেমনভাবে মুসলমানদের থেকেও যাকাত নেয়া হয়। কিন্তু
প্রশ্ন হলো, তাহলে কুরআনে তাদেরকে লাঞ্চিত করার
আদেশ কেন দেয়া হয়েছে, হাদিসে তাদেরকে পথের
সংকীর্ণতম অংশে ঠেলে দেয়ার আদেশ কেন দেয়া হয়েছে,
উমর রাযিআল্লাহু আনহুই বা কেন তাদের উপর নানারকম
লাঞ্ছনাজনক শর্ত আরোপ করেছিলেন? কোথায় উমর রাযি.
এর শর্তাবলী আর কোথায় তাদের দাবীকৃত
'অমুসলিমদেরকে মুসলিমদের সমঅধিকার প্রদান'।

তাদের কথাবার্তায় বারবার প্রতিধ্বনিত হয়, “শুধু কুফরের
কারণে কাউকে হত্যা করা, বা তার মানহানি করা বৈধ
নয়।” যেন কুফর কোন অপরাধই নয়? কাফের জীবনভর

কুফরের উপর বহাল থাকলেও কোন সমস্যা নেই! তবে কি কুফরের কারণে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহকে যে শাস্তি প্রদান করেছেন তাও ঠিক হয়নি! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক! কোন বোকা বলতে পারে, আল্লাহ তায়ালা কুফরের কারণে তাদের শাস্তি দেননি, বরং সমকামিতা ইত্যাদি অপরাধের কারণে তাদের শাস্তি দিয়েছেন। তাহলে কি সমকামিতা ও মাপে কম দেয়া কুফরের চেয়েও বড় অপরাধ? এ অপরাধগুলোর কারণে শাস্তি দেয়া বৈধ হলে, ধর্ষণের কারণে হত্যা করা বৈধ হলে, কেন কুফরের কারণে শাস্তি দেয়া বৈধ হবে না? অথচ কুফর হলো খোদাদ্রোহীতা যা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তাঁর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হলো কাফেররা। -সূরা আনফাল, ৫৫।

আসলে এখন সবকিছুই উল্টে যাচ্ছে, অতীতে জমিয়্যতে উলামায়ে হিন্দ, “হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই” শ্লোগান দিয়েছে। আজ তাদের উত্তরসূরী আরশাদ মাদানী আরেক ধাপ আগে বেড়ে বলছেন, “হিন্দুরা আমাদের বড় ভাই, আমরা তাদের ছোট ভাই!” আগামীকাল হয়তো দেখবো, মুসলমানরা দাওয়াতের স্বার্থে (?) কাফেরদের জুতো সোজা করে দিচ্ছে! এভাবেই আমাদের ইসলামের পরিবর্তে এক নতুন ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে। আর আমরা ইহুদীদের মত দরবারী-মন্দ

আলেমদের অন্ধ অনুসরণ করে জাহান্নামের পথে ছুটে চলেছি। আর এভাবেই আমাদের উপর রাসূলের ভবিষ্যৎবানী প্রতিফলিত হচ্ছে- “তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণকে পূর্ণরূপে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি ঠুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! এরা কি ইহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন, তবে আর কারা?” -সহিহ বুখারী, ৭৩২০ (ইফা, ১০/৫০৭) সহিহ মুসলিম, ২৬৬৯

৮.ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (চতুর্থ পর্ব:- দাসপ্রথা
বহাল রাখার হিকমত ও তাৎপর্য)

যুদ্ধবন্দীদের গোলাম-বাঁদী বানানোর হিকমত

(গত পর্বগুলোতে আমরা ইসলাম প্রচারে আক্রমণাত্মক জিহাদ ও জিয়য়ার হিকমত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (লিংক কমেন্টে) এ পর্বে ইসলাম প্রচারে গোলাম-বাঁদী বানানোর হিকমত নিয়ে আলোচনা করবো। তবে বিষয়টি জটিল হওয়ায় প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেছে। তাই দুই পর্বে ভাগ করে প্রবন্ধটি পেশ করবো ইনশাআল্লাহ)

এ মাসয়ালায় এসে বহু রথী-মহারথীদেরও পা পিছলে গেছে। এমনকি গত শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত শুধু হাতেগোনা দুই একজনই পাওয়া যায় যারা এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রাখে। অন্যথায় অধিকাংশই এ বিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন ওজরখাহী করতে থাকে, মনগড়া নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাকে, যেমন তারা বলে, “ইসলাম ঐ যমানার পারিপার্শ্বিক কারণে যুদ্ধবন্দীদের গোলাম বানানোর আদেশ দিয়েছে। যেহেতু কাফেররাও তখন বন্দীদের গোলাম বানাতো তাই মুসলমানদের জন্য গোলাম বানানো ব্যতীত কোন উপায় ছিল না” ইত্যাদি। মূলত এসব হলো পাশ্চাত্যদের নিকট নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি বন্ধক রেখে দেওয়ার ফলাফল। তাই বর্তমান আকাবিররাও ওদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই ভালো-মন্দ নির্ণয় করে থাকেন। কাফেরদের দৃষ্টিতে মানুষকে গোলাম বানানো মন্দ তাই তাদের নিকটও তা মন্দ।

অথচ রাসুলের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, কাফেরদের গোলাম বানানো অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়, কেননা এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের উত্তম জীবনাচার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে এবং এর প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে মুসলমান হয়ে যাবে। আবু

হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل » صحيح
:البخاري (3010)

“আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিদের দেখে অবাক হন যাদেরকে
শিকলাবদ্ধ করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।” -সহিহ
বুখারী: ৩০১০

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

قال ابن الجوزي: (معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة
الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر
والتقييد هو السبب الأول، ولما كان هو السبب في دخول الجنة
(أقام المسبب مقام السبب) (فتح الباري: 6/145)

“ইবনুল জাওয়ী রহ. বলেন, হাদিসের অর্থ হলো তাদেরকে
বন্দী করে নিয়ে আসা হবে, যখন তারা ইসলামের সত্যতা
বুঝতে পারবে তখন স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করবে।
সুতরাং বন্দী করাটা হবে ইসলাম গ্রহণের কারণ আর
ইসলাম গ্রহণ হবে জান্নাতে প্রবেশের কারণ। তাই বন্দী
করে নিয়ে আসাকেই জান্নাতে প্রবেশের কারণ বলা
হয়েছে।” -ফাতহুল বারী: ৬/১৪৫

এরপর হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

رأيت ناسا من :ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه
أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها. قلت: يا رسول الله
من هم؟ قال قوم من العجم يسببهم المهاجرون فيدخلونهم في
الإسلام مكرهين. (فتح الباري: 6/145)

“উল্লেখিত হাদিসটির মত আরেকটি হাদিস হলো যা (ইমাম বাযযার) আবুত তুফাইল রাযি. এর সূত্রে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, ‘আমি আমার উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে জোরপূর্বক জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে দেখেছি। আবুত তুফাইল বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো কিছু অনারবী লোক, যাদেরকে মুহাজিররা বন্দী করে নিয়ে আসবে, ফলে তারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে।” -ফাতহুল বারী: ৬/১৪৫

অর্থাৎ তাদেরকে নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিলে তারা কখনোই ইসলাম গ্রহণ করতো না। কিন্তু যখন তাদেরকে জোরপূর্বক বন্দী করে নিয়ে আসা হলো, এবং তারা কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদিস শুনলো এবং মুসলমানদের জীবনাচার দেখলো তখন স্বেচ্ছায় ইসলাম

গ্রহণ করলো।

ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. (মৃ: ৩৫৪ হি.) বলেন,

والقصد في هذا الخبر: السبي الذي يسبيهم المسلمون من دار
الشرك، مكتفين في السلاسل يقادون بها إلى دور الإسلام، حتى
يسلموا فيدخلوا الجنة، ولهذا المعنى أراد صلى الله عليه وسلم
بقوله في خبر الأسود بن سريع: أو ليس خياركم أولاد
المشركين، وهذه اللفظة أطلقت أيضا بحذف (من) عنها يريد:
"أو ليس من خياركم". (صحيح ابن حبان، 1 : 344 ط
(مؤسسة الرسالة، 1408 هـ

“এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধবন্দীদের মুসলামনরা কাফের
রাষ্ট্র থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়ে আসবে।
ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ
অর্থেই অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমাদের শ্রেষ্ঠতম
ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে মুশরিকদের সন্তানরা’ (যাদেরকে
তোমরা বন্দী করে নিয়ে এসে মুসলমান বানাও)।” -সহিহ
ইবনে হিব্বান, ১/৩৪৪

عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، كنتم خير أمة
أخرجت للناس، قال: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل
في أعناقهم، حتى يدخلوا في الإسلام». صحيح البخاري: 4557

“আবু হাযেম রহ বলেন, ‘তোমরা সর্বোত্তম জাতি যাদের উত্থান হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য’ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, ‘তোমরা মানবজাতির জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর, তোমরা তাদেরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়ে আসবে, ফলে তারা ইসলামে প্রবেশ করবে।’” - সহিহ বুখারী: ৪৫৫৭

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

أي أنفعهم لهم وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببا في إسلامهم

অর্থাৎ তোমরা মানব জাতির জন্য সবচেয়ে উপকারী ও কল্যাণজনক, কেননা তোমরা তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ হবে। -ফাতহুল বারী: ৮/২২৫

কাফেরদের গোলাম বানানোর দ্বারা তারা কিভাবে দলে দলে মুসলমান হয়েছে- ইমাম নববীর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে এর সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, তিনি বলেন,

معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمدالله يسبون الكفار وقد سبوا في زماننا مرارا كثيرة يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا شرح النووي على مسلم

(18/ 21)

“বর্তমানে শাম ও মিসরের সেনাবাহিনীর অধিকাংশই হলো যুদ্ধবন্দী গোলাম, তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে ইসলামগ্রহণ করেছে, এরপর আলহামদুলিল্লাহ তারাই এখন হাজার-হাজার কাফেরকে বন্দী করছে। -শরহ মুসলিম, ১৮/২১

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসী রহ. (মু: ৬২০ হি.) বলেন,

ومنع أحمد من فداء النساء بالمال؛ لأن في بقائهن تعريضا لهن للإسلام، لبقائهن عند المسلمين وجوز أن يفادى بهن أسارى المسلمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع، ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه، فاحتمل تفويت غرضية الإسلام من أجله. ولا يلزم من ذلك احتمال فواتها، لتحصيل المال. فأما الصبيان، فقال أحمد: لا يفادى بهم؛ وذلك لأن الصبي يصير مسلما بإسلام سائيه، فلا يجوز رده إلى المشركين. (المغني: 9/224 ط. مكتبة القاهرة هـ1388)

“ইমাম আহমদ রহ. নারী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে থাকলে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা থাকে। তবে তাদের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করা যেতে পারে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামা বিন আকওয়া

রাযি. এর বাঁদীর মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করেছেন। তাছাড়া নারীদের মুসলিম হওয়া সুনিশ্চিত নয়, পক্ষান্তরে তাদের বিনিময়ে যাদের মুক্ত করে আনা হবে তারা তো মুসলিম। কিন্তু বাচ্চাদের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করা যাবে না। কেননা বাচ্চারা মুসলিমদের দাস হওয়ার কারণে তারাও মুসলিম হয়ে যাবে, তাই তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত দেওয়া যাবে না।” -আলমুগনী, ৯/২২৪

এ থেকে আমরা দুটি বিষয় বুঝতে পারি,

১. নারীদের বন্দী করে দাসী বানালে তাদের মুসলিম হওয়ার আশা থাকে।
২. শিশুরা বন্দী করে আনার দ্বারাই মুসলিম হয়ে যাবে। এমনকি তারা পরবর্তীতে নিজেদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেও তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হবে না। বরং নাবালেগ হলে বন্দী-প্রহার ইত্যাদি শাস্তির মাধ্যমে জোরপূর্বক ইসলামে ফিরে আসতে বাধ্য করা হবে। আর বালেগ হলে তাদের ক্ষেত্রেও মুরতাদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

যারা দাবী করেন, ইসলাম স্বাধীনভাবে যে কোন ধর্ম পালনের অনুমতি দেয়, তাদের নিকট প্রশ্ন, এখানে এই শিশুদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ দেওয়া হলো

কোথায়?

মূলত শিশুরা ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের লালনপালনকারীদের অনুসরণ করে, তাই যদি তারা মুসলমানদের ঘরে বেড়ে উঠে তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা মনে-প্রাণে মুসলিম হিসেবেই বেড়ে উঠবে। যেমনটা আমরা রাসুলের প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে জানতে পারি, “প্রতিটি শিশুই স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তারা পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-খৃষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানায়। -সহিহ বুখারী, ১৩৫৮ সহিহ মুসলিম, ২৬৫৮ তাই শিশুদের ধর্মগ্রহণে কোন ইখতিয়ার দেওয়া হয়নি।

পক্ষান্তরে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষদের যদি জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয় তাহলে তারা মুখে কালেমা পড়লেও অন্তর হতে ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাই তাদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান বানাতে বলা হয়নি। বরং বিভিন্ন কৌশলে চাপ প্রয়োগ করে মুসলমান হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৯. ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (পঞ্চম পর্ব)

যেহেতু ইসলামে দাসপ্রথা বহাল রাখার প্রধান কারণ হলো- তাদেরকে মুসলমানদের সংস্পর্শে রেখে ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসদের সাথে সদাচারের প্রতি খুব বেশী উৎসাহিত করেছেন, এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মনিব নিজে যে মানের খাবার খায় গোলামকেও সেই মানের খাবার খাওয়াতে বলেছেন। মনিব নিজে যে ধরণের পোশাক পরে তাকেও সেই ধরণের পোশাক সরবরাহ করার আদেশ দিয়েছেন। -সহিহ বুখারী, ৩০ সহিহ মুসলিম, ১৬৬১।

এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যা শায়িত অবস্থায়ও বারংবার একথা বলছিলেন, الصلاة وما ملكت أيمانكم “তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং দাসদাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।” -সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬২৫

বলাবাহুল্য, মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে যখন বন্দী দাস-দাসীরা তাদের উত্তম জীবনাচার প্রত্যক্ষ করবে, বিশেষকরে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে দেখবে, পাশাপাশি মুসলমানদের অধীনে থাকার দরুন ইসলাম গ্রহণে অন্য কোন বাধাও থাকবে না, তখন তারা

সহজেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে আমরা এমনটাই দেখতে পাই। সাহাবা-
তাবেয়ীগণ যে কাফেরদের বন্দী করে এনেছেন তারা প্রায়
সকলেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। বরং তাঁরা নিজেরা
কিংবা তাদের সন্তানরা বড় বড় আলেম-সেনাপতি-আমির
হয়ে ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। যদি
এদেরকে গোলাম-বাঁদী না বানানো হতো তাহলে হয়তো
তারা সারাজীবন কাফেরই থেকে যেতো।

এখন ভাবার বিষয় হলো দুটোর মধ্য কোনটা উত্তম:-

১:- ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে কিছুদিনের জন্য গোলাম হওয়ার
লাঞ্ছনা ও যিল্লতি সহ্য করা। বিনিময়ে মুমিন হয়ে চিরস্থায়ী
আখেরাতের সফলতা লাভ।

২:- দুনিয়াতে গোলাম হওয়ার লাঞ্ছনা ও যিল্লতি হতে বেঁচে
থাকা, বিনিময়ে আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করা।

যে ব্যক্তি নিজের বিবেক-বুদ্ধি কাফেরদের নিকট গচ্ছিত
রাখেনি তার বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে, প্রথমটির
সাথে দ্বিতীয়টার কোন তুলনাই চলে না। শায়েখ আনোয়ার
আওলাকীর ভাষায়, “যদি আমার পূর্বপুরুষকে খালেদ বিন
ওয়ালিদ রাযি. গোলাম বানিয়ে তার দ্বারা নিজের জুতোও

পরিষ্কার করিয়ে থাকেন, তবুও তাতে আমি খুশি, কেননা এটা তার জন্য কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে ভালো।”

তবে যেহেতু দাস-দাসী বানানো হলো ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম, তাই ইসলাম চায় না, দাস-দাসীরা চিরকাল দাস হিসেবেই জীবনযাপন করুক, এজন্য ইসলামে দাস মুক্তির (বিশেষ করে মুসলিম দাস মুক্তির) বহু ফযীলত ও বিধান রয়েছে। হাদিসে এসেছে, “যে ব্যক্তি কোন মুমিন দাসকে আযাদ করবে তো দাসের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।”- সহিহ বুখারী ২৫১৭ সহিহ মুসলিম, ১৫০৯ সহিহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, “এ হাদিস শুনে আলী বিন হুসাইন রহ. দশহাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদকৃত একটি দাসকে আযাদ করে দেন।” -সহিহ বুখারী, ২৫১৭

যে ব্যক্তিকে দাসীকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পরে আযাদ করে বিয়ে করে তাকে দ্বিগুণ সওয়াবের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে। -সহিহ বুখারী, ৯৭ সহিহ মুসলিম, ১৫৪

দাসী যদি মনিবের ঔরসে সন্তান জন্মদান করে তবে সে মনিবের মৃত্যুর পরে আযাদ হয়ে যায়। -সুন্নে ইবনে

মাজাহ, ২৫১৬ মুসনাদে আহমদ, ২৭৫৯

দাসদাসীরা যদি মুকাতাবাত তথা বিনিময় প্রদানের শর্তে আযাদ হওয়ার চুক্তি করতে চায় তবে মনিবদেরকে এ চুক্তি মঞ্জুর করার আদেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি মনিব ও অন্যান্য মুসলমানদের এই চুক্তির বিনিময় আদায়ের ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। বরং এটাকে যাকাতের একটি মাসরাফ-খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। -সুরা নুর, ২৪ সুরা তাওবা ৬০

তেমনিভাবে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ দাস আযাদ করার আদেশ করা হয়েছে। যেমন:-

ক. কেউ যদি কোন মুসলমানকে ভুলে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার অপরাধের কাফফারা হলো একটি মুসলিম দাস আযাদ করা, দাস আযাদ করার সামর্থ্য না থাকলে দুইমাস লাগাতার রোযা রাখা। -সুরা নিসা, ৯২

খ. কেউ স্ত্রীর সাথে যিহার করলে অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করলেও তার কাফফারা হলো সামর্থ্য থাকলে দাস আযাদ করা। -সুরা মুজাদালা, ৩

গ. কেউ যদি রমযান মাসে ইচ্ছাকৃত রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার কাফফারাও হলো সামর্থ্য থাকলে দাস আযাদ করা। - সহিহ বুখারী, ১৯৩৬ সহিহ মুসলিম, ১১১১

হাদিসে এসেছে, “কেউ যদি দাসকে থাপ্পড় মারে কিংবা প্রহার করে তো এর কাফফারা হলো তাকে আযাদ করে দেওয়া।” -সহিহ মুসলিম, ১৬৫৭

উল্লিখিত হাদিসসমূহের কারণে সাহাবায়ে কেলাম ব্যাপক পরিমাণে দাস আযাদ করতেন, বিশেষকরে দাসদের ইসলাম গ্রহণের পর। মুযাজ রাযি. একবার কিছু ক্রীতদাস হাদিয়া পান। তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে তারা পিছনে ইজ্জেদা করতে আসে। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা কার জন্য নামায পড়ো? তারা বলে, আল্লাহর জন্য। এ কথা শুনে মুযাজ বললেন, তবে যাও তোমরাও আল্লাহর জন্য (আযাদ)। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, ২২৩৯৩

প্রসিদ্ধ সাহাবী হাতেব বিন আবী বালতাতা রাযি. মৃত্যুর সময় তার দাস-দাসীদের মধ্যে যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে তাদের আযাদ করে দেয়ার ওসিয়্যত করে যান। -মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ১৩৬৪৪ ও ১৩৬৪৫

সারকথা হলো, দাসপ্রথার মাধ্যমে ইসলাম কাফেরদের মুসলমান বানানোর জন্য একটি পরিপূর্ণ নেয়াম বা সিস্টেম তৈরি করেছে, যার সূচনা হবে তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করে দাস বানানোর মাধ্যমে, আর সমাপ্তি হবে তাদেরকে আযাদ করা - বিশেষকরে ইসলাম গ্রহণ করার পরে- আযাদ করার মাধ্যমে। আর মাঝখানে তাদের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সদাচার করা হবে ইসলামের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে। উল্লিখিত হাদিসগুলোর সমষ্টি থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি। এক্ষেত্রে ভুল ধারণা তৈরির কারণ হলো, অনেকেই শুধু দাস-দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার কিংবা তাদেরকে আযাদ করার প্রতি উৎসাহিত করার হাদিসগুলো লক্ষ্য করে, কিন্তু কাফেরদের দাস-দাসী বানানোর প্রতিও যে একাধিক হাদিসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এড়িয়ে যায়, আর এভাবেই এ ব্যাপারে তাদের একটা খণ্ডিত ধারণা তৈরি হয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে, যদি কাফেরদের মুসলিম বানানোই ইসলামের দাসপ্রথা বহাল রাখার প্রধান কারণ হয় তবে ইসলাম গ্রহণকেই কেন তাদের মুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হলো না? কেন ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তারা আযাদ হয়ে যাবে না?

এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে, আমার মতে এর সবচেয়ে সুন্দর উত্তর হলো, যদি ইসলাম গ্রহণকেই দাসমুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হতো, তাহলে সেটা অনেকটা ঘাড়ে তলোয়ার ধরে জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর মতোই হতো। কেননা দাসত্ব এতই ঘৃণিত বিষয় যে, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দাসত্বের জীবনকে মেনে নিতে পারে না। তাই যদি ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই দাসরা আযাদ হয়ে যেতো, তবে ইসলাম সম্পর্কে অবগতির পূর্বেই দাসেরা শুধু মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করতো। এরপর হয়তো তারা পালিয়ে কাফেরদের কাছে চলে যেতো কিংবা মুনাফিক হয়ে মুসলিম সমাজে বসবাস করে আমাদের ক্ষতিসাধন করতো। ফলে দাসপ্রথা বহাল রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কিছুদিন দাস হিসেবে মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামের সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবগতি লাভের পাশাপাশি তাদের সাথে মুসলিমদের উত্তম আচরণ প্রত্যক্ষ করে আন্তরিকভাবে মুসলমান হওয়া- এ লক্ষ্য অধরাই রয়ে যেতো।

চলবে ইনশাআল্লাহ

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (প্রথম পর্ব- ‘তলোয়ারে
নয় উদারতায়’ শীর্ষক শ্লোগানের উৎপত্তি; সংক্ষিপ্ত
ইতিহাস)[https://dawahilallah.com/showthread....%
26%232488%3B](https://dawahilallah.com/showthread....%26%232488%3B))

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (দ্বিতীয় পর্ব- আক্রমণাত্মক
জিহাদের হিকমত ও তাৎপর্য)
[https://dawahilallah.com/showthread....%26%232
479%3B](https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B))

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (তৃতীয় পর্ব, জিযয়ার
বিধানের হিকমত ও তাৎপর্য)
[https://dawahilallah.com/showthread....%26%232
479%3B](https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B))

ইসলামপ্রচারে তরবারীর ভূমিকা (চতুর্থ পর্ব:- দাসপ্রথা বহাল
রাখার হিকমত ও তাৎপর্য)
[https://dawahilallah.com/showthread....%26%232
479%3B](https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B))

১০. ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (শেষ পর্ব)

আমরা প্রবন্ধের একদম শেষদিকে চলে এসেছি। পূর্বোক্ত
আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, ‘তরবারির জোরে ইসলাম

প্রচারিত হয়নি’ কথাটি আমাদের চূড়ান্ত দুশমন কাফেরদের একটি ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য। একটি অর্থের বিচারে কথাটিকে সঠিক বলা গেলেও তারা সে উদ্দেশ্যে কথাটি বলেনি। তারা ঢালাওভাবে ইসলাম প্রচারে তরবারীর যে কোনো ভূমিকাকে অস্বীকার করেছে। তাদের এই শ্লোগান প্রচারের পর থেকে যেসব ফলাফল আমাদের সামনে এসেছে সেগুলো দেখলেই বিবেকবান সকলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই কথাটি প্রচারিত হবার পর তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের অন্যতম ফরয বিধান ইকদামী জিহাদকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং ইকদামী জিহাদকে অস্বীকার করতে গিয়ে অস্বীকারকারীরা সাহাবায়ে কেরামকেও কালিমাযুক্ত করে ছেড়েছে। সাহাবাদের মত মহান চরিত্রের ব্যক্তিদের চরিত্রের উপর আঘাত হনতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা ইকদামী জিহাদ অস্বীকারকারীদের তালিকা দিচ্ছি না। দিলে পাঠক বুঝতে পারতেন এ জালে কত তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিরও ফেঁসে গেছেন। উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি, ‘ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়নি’ এটা চাহ মিথ্যা কথা। বরং ইসলাম প্রচারে তরবারীর গুরুত্ব অপরিসীম। জিহাদপ্রেমী এক আলেমকে এক শাগরেদ প্রশ্ন করে, ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে না আখলাকের মাধ্যমে? শাগরেদকে অবাক

করে দিয়ে তিনি উত্তর দেন, “ইসলাম তো তরবারীওয়ালা আখলাকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।” আসলে এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই যে আজকে সব আলেম মিলে তরবারীকে আখলাকের বিপরীত মেরুতে দাড়া করিয়ে দিচ্ছেন, তো আগামীকাল যখন কোন নাস্তিক-মুরতাদ কিতাবের পাল্টা উল্টে দেখিয়ে দিবে, রাসূল বলছেন, “আমি যোদ্ধা নবী;” “আমাকে তরবারী সহ প্রেরণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করে;” আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা ইমান আনে;” (সহিহ বুখারী, ২৫ সহিহ মুসলিম, ২০ শামায়েলে তিরমিযি, ৩০৩ মুসনাদে আহমদ ৫১১৪) তো এই হাদিসগুলোর জবাবে মুহতারাম আলেমগণ কি বলবেন? তখন কি এই তাঁরাই মানুষের বেইমান-মুরতাদ হওয়ার কারণ হবেন না?

পরিশেষে বলবো, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে, তাকে হাকিম-আলিম মহাপ্রজ্ঞাবান-মহাজ্ঞানী বলে বিশ্বাস করে তার জন্য আবশ্যিক হলো, আল্লাহর বিধানের হিকমত বুঝে আসুক বা না আসুক, তা নিঃসঙ্কোচে মেনে নেওয়া। কুরআন মুমিনদের কাছে এ দাবীই করেছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. (سورة الأحزاب: 36)

“আল্লাহ ও তার রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না।” -সূরা আহযাব, ৩৬

বরং এর বিপরীত করাকে কুফর গণ্য করেছে, ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
سورة النساء : (فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
65)

“না, (হে নবী) তোমার প্রভুর শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়।”- সূরা নিসা, ৬৫

সুতরাং যদি আমাদের ধ্যানধারণা এমনই হয় যে, আল্লাহ তায়ালার বিধান বুঝে এলে মানবো না হলে মানবো না, ভালো লাগলে মানবো অন্যথায় নয়, তাহলে আমরা মুমিন

হতে পারবো না। আর বাস্তবতা হলো যদি আমরা দুনিয়াবী সব ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে আমাদের পুরো জীবন আল্লাহ তায়ালার বিধানাবলীর হিকমত অনুধাবনে ব্যয় করি তবুও আমাদের সীমিত মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ তায়ালার সব বিধানের পূর্ণ হিকমত বুঝা সম্ভব না। এজন্যই যখন মক্কার কাফেররা সুদ হারাম হওয়ার বিধানের প্রতি আপত্তি করে বলেছিল, **إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا** (বিক্রিও তো সুদেরই মত হয়ে থাকে) তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে ব্যবসার উপকারিতা এবং সুদের ক্ষতি ও ভয়াবহতা তুলে ধরেননি। বরং তাদের জবাবে শুধু এটাই বলেছেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।” সূরা বাকারা, ২৭৫

ব্যাস, যদি আল্লাহর প্রতি ইমান থাকে, তবে তার আদেশ-নিষেধই যথেষ্ট। লাভ-ক্ষতি বিবেচনা ও হিকমত অনুধাবন জরুরী নয়। আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি বলেন,

“প্রকৃত ব্যাপার হলো- আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি হুকুমের

ভেতর নিঃসন্দেহে কোনও না কোনও হিকমত নিহিত থাকে, কিন্তু সে হিকমত যে প্রত্যেকেরই বুঝে আসবে এটা অবধারিত নয়। কাজেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান থাকলে প্রথমেই তার হুকুম শিরোধার্য করে নেওয়া উচিত। তারপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রশান্তি লাভের জন্য হিকমত ও রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করে তাতে কোন দোষ নেই। দোষ হচ্ছে সেই হিকমত উপলব্ধি করার উপর হুকুম পালনকে মূলতবী রাখা, যা কোনও মুমিনের কর্মপন্থা হতে পারে না।” -
তাওযীছল কুরআন, ১/১৬২

তাই আসুন শয়তানের সৃষ্ট সকল যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে উঠে এবং কাফেরদের তৈরি মানবতার তথাকথিত মূল্যবোধ ত্যাগ করে, অসীম প্রজ্ঞাবান মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিধানাবলীর সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি, সাহাবায়ে কেরামের মহান আদর্শ *سمعنا وأطعنا* (আমরা আল্লাহর বিধান মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং খুশীমনে মেনে নিয়েছি -সুরা বাকারা, ২৮৫) এর বাস্তব অনুশীলন করি। এরপর যদি তা পালন করতে পারি তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আর যদি মানবীয় দুর্বলতাবশত কোন বিধান পালন করতে নাই পারি তবে অনুতপ্ত হই। এতে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু বুঝে না আসা বা পালন করা কষ্টকর হওয়ার কারণে

তাঁর বিধানের উপর আপত্তি তোলা, কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা করে আল্লাহ তায়ালার বিধানই পাঁলে দেওয়া, যারা এ বিধান পালন করছে তাদের বাতিল আখ্যা দেয়া, এতো সরাসরি আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি, তবে এর সাথে নিচের লিংক থেকে শায়েখ আনোয়ার আওলাকির ভিডিওটা দেখে নিলে এ বিষয়ে আরো স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

<https://www.youtube.com/watch?v=6JiG7cKv3M>
c

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (প্রথম পর্ব- ‘তলোয়ারে নয় উদারতায়’ শীর্ষক শ্লোগানের উৎপত্তি; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232488%3B>)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (দ্বিতীয় পর্ব- আক্রমণাত্মক জিহাদের হিকমত ও তাৎপর্য)
<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B>)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (তৃতীয় পর্ব, জিয়য়ার
বিধানের হিকমত ও তাৎপর্য)

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B>)

ইসলামপ্রচারে তরবারীর ভূমিকা (চতুর্থ পর্ব:- দাসপ্রথা বহাল
রাখার হিকমত ও তাৎপর্য)

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B>)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা:- (পঞ্চম পর্ব)

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232476%3B>)

১১.নবীজির জান-মান রক্ষায় সাহাবায়ে কেরামের চেতনা ও
আদর্শ

এক. কথাটা যেই বলুক বড়ই সত্য কথা বলেছে, ‘রাসূলের
অপমানে কাঁদে না যদি তোর মন, মুসলিম নয় মুনাফিক তুই
রাসূলের দূশমন।

দুই: খুবই আশ্চর্য লাগছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে, কিন্তু এরপরো আমরা কোটি কোটি মুসলমান এখনো জীবিত আছি! অথচ সাহাবীদের চেতনা তো ছিল, হয় শাতিমে রাসূলকে হত্যা করবো না হয় নিজে শহিদ হবো? আজ কি আমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে ফ্রান্সের নাগরিকদের হত্যা করবে, তাদের কোন দূতাবাস উড়িয়ে দিবে?

তিন. আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম বিশ্ব ফ্রান্সের পণ্য ব্যাপকভাবে বয়কট করা শুরু করেছে। ফ্রান্সের এতে টনক নড়েছে। তারা মুসলিম বিশ্বকে বয়কট না করার আহ্বান জানিয়েছে। ইনশাআল্লাহ বয়কট চলতে থাকলে তারা এ ঘৃণ্য অপকর্ম বন্ধ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এধরণের বয়কট কোন স্থায়ী সমাধান নয়। তারা হয়তো কিছুদিনের জন্য ক্ষান্ত হবে, কিন্তু সুযোগ পেলে আবারো এ ধরণের কাজ করবে। তাই শাতিমদের শায়েস্তা করার স্থায়ী ও টেকসই পথ হলো জিহাদের মাধ্যমে কাফেরদের শক্তি নিঃশেষ করে দেয়া এবং শাতেমদের এক এক করে হত্যা করা। এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
 بَدَّءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَتُحْسِنُونَهُمْ ۖ قَالَ اللَّهُ أَلْحَقُ أَنْ تَحْسَنُوهُ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ فَاتْلَوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِرُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ
عَلَىٰ مَنْ يَسَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রাসুলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন, তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেবেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, তার হিকমত পরিপূর্ণ।”। -সূরা তাওবাহ: ১৩-১৫

চার. নিঃসন্দেহে আমাদের দিল ব্যথিত হচ্ছে, কিন্তু কতটুকু? আমরা কি এখনো হাসি-তামাশা করছি না? আজ যদি আমাদের মা-বোন-কন্যা বা স্ত্রী ধর্ষিতা হতো তাহলে কি আমাদের মুখে হাসি আসতো? রাতে ঘুম হতো? শক্তি নাই বলে কি জীবনটা পূর্বের মতোই চলতে থাকবে? এটা কি প্রমাণ করে না রাসূলের ভালোবাসা আমাদের নিকট আমাদের পরিবার-পরিজনের চেয়েও কম?

পাঁচ. আমরা হয়তো জায়নামাযে বসে কাঁদছি? বদদোয়া
করছি। এ বদদোয়াও সুনাহর অংশ। কিন্তু শুধু কান্না কি
হাঁতে চুড়ি পরা অবলা নারীদের অভ্যাস নয়, যাদের নিকট
জুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার মতো ক্ষমতা থাকে না। তাহলে
আমরা কেমন পুরুষ? আল্লাহ তায়লা তো আমাদের দায়িত্ব
দিয়েছিলেন, রাসূলকে কষ্টপ্রদানকারীদের থেকে প্রতিশোধ
নেয়ার। কিন্তু আমরা যেন সেই দায়িত্ব আবার আল্লাহকেই
দিয়ে দিতে চাচ্ছি। আমাদের হাবভাবে মনে হয়, আমরাও
যেন বনী ইসরাইলের মতোই বলতে চাচ্ছি, হে আল্লাহ
আমরা যুদ্ধ করতে পারবো না, আপনার সাহায্যের ওয়াদা
থাকলেও আমরা জিহাদ করবো না, জিহাদের প্রস্তুতিও নিবো
না। আপনিই যা করার করুন। (নাউযুবিল্লাহ)

ছয়. কোন হতভাগা মুসলিম এ কথাও বলছে যে, ফ্রান্সের এ
কাজ তো কতিপয় উগ্রপন্থীর কর্মের প্রতিক্রিয়া। তারা
শাতিমদের হত্যা করেছে বলেই তো আজ ফ্রান্স এ কাজ
করছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, ইতিহাসে এর অনেক
নজীর রয়েছে যে, পরাজিত জাতি নিজেদের মুক্তিদাতা
প্রকৃত বীরদের চিনতে ভুল করেছে। স্থায়ী লাঞ্ছনা ও যিল্লতি
হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে যখন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং
এর কারণে সাময়িক কষ্টের শিকার হতে হয়েছে, তখন

মুক্তির মশালধারীকেই অভিযুক্ত করা হয়েছে। মুসা
আলাইহিস সালামকেও বনী ইসরাইল বলেছিলো,

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَنْ يُهْلِكَ عَذُوكُمْ وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তারা বললো, আমাদেরকে তো আপনার আগমনের আগেও
উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং আপনার আগমনের পরেও
(উৎপীড়ন করা হচ্ছে) মুসা বললো, তোমরা এই আশা
রাখো, আল্লাহ তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং
যমিনে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর
দেখবেন, তোমরা কি রূপ কাজ করো। -সূরা আরাফ: ১২৯

সুতরাং কুরআন হতে শিক্ষাগ্রহণ করুন। বনী ইসরাইলের
মতো কথা বলবেন না।

সাত. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা
শারীরিক কষ্ট দিয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাদের ক্ষমা করেছেন, কিন্তু যারা রাসূলের ইজ্জতে আঘাত
করেছে, তাকে নিয়ে কটুক্তি করেছে, রাসূল তাদেরকে ক্ষমা
করেননি। কেননা রাসূলকে শারীরিক কষ্ট-আঘাত করলে তা
তাঁর দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি-ব্যঙ্গ করা হলে সেই
আঘাত আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামের উপর

আসে। যে ধর্মের নবীকে অপমান করা হয়, সেই ধর্মের আর কিই বা বাকী থাকে?

এখন আমি এমন কিছু হাদিস ও আছার পেশ করবো যা থেকে বুঝা যাবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের প্রতি সাহাবীদের মনোভাব কি ছিল। এক্ষেত্রে তাদের চেতনা ও আদর্শ কি ছিল? আর যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করা তাকে শারীরিক কষ্ট দেয়ার চাইতেও বেশি গুরুতর, তাই শারীরিক কষ্ট থেকে নবীজিকে প্রতিরক্ষার হাদিস-আছারগুলো তাঁর সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

১. শাতিম আবু জাহলের প্রতি মুয়ায বিন আফরা ও মুয়ায বিন আমরের মনোভাব

عن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار - حديثه أسنانهما، تمنيت أن أكون بين فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا - أضلع منهما جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيتنه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت

لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماي، فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه فقال: «أيكما قتله؟»، قال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟»، لا، فنظر في السيفين، فقال: «كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن: قالاً ، وكانا معاذ ابن عفراء، ومعاذ بن عمرو «عمرو بن الجموح بن الجموح. صحيح البخاري: 3141 صحيح مسلم: 1752

আবদুর রাহমান বিন আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দণ্ডায়মান, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে রয়েছে। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের অপেক্ষা শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি, তখন তাঁদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চাচা! আপনি কি আবু জাহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা; তাকে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালমন্দ করে। সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে অবধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় মুগ্ধ হলাম। এরপর দ্বিতীয়জন আমাকে

খোঁচা দিয়ে অনুরূপ বলল। কিছুক্ষণ পরই আমি আবু
 জাহেলকে দেখলাম, সে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
 তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার
 সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। তারা
 তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল
 এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। এরপর রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে ফিরে এসে তাঁকে
 অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাঁকে হত্যা
 করেছে? তারা উভয়ে দাবী করল, আমি তাকে হত্যা
 করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
 তোমাদের তরবারী তোমরা মুছে ফেলোনি তো? তারা বলল,
 না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের
 তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা
 করেছো। অবশ্য তার থেকে প্রাপ্ত মালামাল মুয়ায ইবনু
 আমর ইবনু জামুহের জন্য। তারা দু'জন হল, মুয়ায ইবনু
 আ'ফরা ও মুয়ায ইবনু 'আমর ইবনু জামুহ। -সহিহ বুখারী:
 ৩১৪১; সহিহ মুসলিম: ১৭৫২

২. শাতিম প্রিয়তমা হলেও তার নিস্তার নেই

عن ابن عباس: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه فينهاها، فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها - وسلم فقتلها، فوقع بين رجلها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجمع الناس، فقال: "أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو ينزلزل حتى قعد بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها، فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعت في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا اشهدوا أن دمها هدر". رواه أبو داود (4361) وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ص: 454) : رواه ثقات. وقال الشوكاني في الدراري المضية شرح الدرر البهية (2/ 406) : رجال إسناده ثقات. وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود: إسناده قوي

ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত, জনৈক অন্ধ লোকের একটি ক্রীতদাসী ছিলো। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভৎসনা করতো; কিন্তু তাতেও সে

বিরত হতো না। এক রাতে সে যখন নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতে শুরু করলো এবং তাঁর
সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, সে একটি ধারালো ছোরা
নিয়ে তার পেটে রেখে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো।
তার দু'পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে
রঞ্জিত হলো। ভোরবেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ঘটনাটি অবহিত হয়ে লোকজনকে সমবেত করে বলেন,
আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি একাজ করেছে,
তার উপর যদি আমার কোন অধিকার থেকে থাকে, তবে
যেন সে উঠে দাড়ায়।

একথা শুনে অন্ধ লোকটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে
কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে বসে বললো, হে আল্লাহর
রাসূল! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। সে আপনাকে
গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা
বলতো। আমি নিষেধ করতাম; কিন্তু সে বিরত হতো না।
আমি তাকে ধমক দিতাম; কিন্তু সে তাতেও বিরত হতো না।
তার গর্ভজাত মুক্তার মতো আমার দু'টি ছেলে আছে, আর
সে আমার খুব প্রিয়পাত্রী ছিলো। গত রাতে সে আপনাকে
গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক
কথা বললে, আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার
পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত বৃথা গেলো (অর্থাৎ তাকে হত্যার কারণে কিসাস বা দিয়ত নেয়া হবে না)। -সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৬১ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, শাওকানী ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

শাতেমের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি (যিস্মা/সন্ধি/আমান)
থাকলেও তাকে হত্যা করা হবে এবং এক্ষেত্রে ইমামের
অনুমতিরও প্রয়োজন নেই

عن علي: أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه داود (4362)) وقال الإمام ابن تيمية في (ص: 61) : وهذا الحديث جيد ... وله شاهد (الصارم المسلول حديث ابن عباس الذي يأتي

আলী রাযি. বলেন, জনৈক ইহুদী নারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কটুক্তি ও গালি-গালাজ করতো। এ কারণে কোন একব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্* সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ নারীর খুনের বদলা বাতিল বলে ঘোষণা করেন। -সুনানে

আবু দাউদ: ৪৩৬২; ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন,

وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سب بطريق الأولى لأن هذه المرأة كانت موادة مهادنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادة مطلقاً (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: 62)

এই হাদিস প্রমাণ করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে নারী হলেও তাকে হত্যা করা হবে এবং গালিদাতা যিম্মি হলেও তাকে হত্যা করা হবে। কেননা এই মহিলার সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর সকল ইহুদীদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে নিয়েছিলেন। -আসসারিমুল মাসলুল: ৬২

আঘাতে জর্জরিত ও মৃত্যুমুখ অবস্থায় সাদ বিন রবী রাযি.
এর আনসারীদের প্রতি ওসিয়ত

بعثني رسول الله : عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال
صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، وقال لي
إن رأيتَه فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله: كيف
فجعلت أطوف بين القتلى فأصبتَه وهو في آخر : تجدك؟ قال
رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف
ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك: «خبرني كيف تجدك؟» قال:
على رسول الله السلام، وعليك السلام قل له: يا رسول الله،
أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند
الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر
يطرف، قال: وفاضت نفسه رحمه الله رواه الحاكم 4906 وقال
ووافقه الذهبي، ثم «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه
أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد الرحمن
بن أبي صعصعة حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: «من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟» فذكر
الحديث بنحو منه. وقال الذهبي تاريخ الإسلام (1/ 119) فهو
شاهد لما رواه خارجة. ويشهد له أيضا ما رواه مالك في
الموطأ (3/663) عن يحيى بن سعيد بمعناه مرسلا
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن
إن رأيتَه فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول :الربيع، وقال لي
فجعلت أطوف بين القتلى :لك رسول الله: كيف تجدك؟ قال
فأصبتَه وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة
برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك: «خبرني

كيف تجدك؟» قال: على رسول الله السلام، وعليك السلام قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، قال: وفاضت نفسه رحمه الله

যায়েদ বিন সাবেত রাযি. বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাদ ইবন রবী রাযি. কে খোঁজ করতে পাঠালেন এবং আমাকে বলে দিলেন, যদি তুমি তাকে দেখতে পাও, তবে তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে বলবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি অবস্থা? আমি নিহতদের মাঝে তাকে খুঁজে পেলাম, তখন তিনি মৃত্যুমুখে ছিলেন, তার শরীরে তীর-তরবারী-বর্ষার সত্তরটি আঘাত ছিল। আমি তাকে বললাম, হে সাদ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি অবস্থা? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ও তোমার প্রতি সালাম। তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলো, আমি তো জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আর আমার আনসারী কওমকে বলো, যদি তোমাদের কারো জান বাকী থাকাবস্থায় কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে যায় তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের কোন উয়র বাকী থাকবে না! এ কথা বলেই তিনি জীবন উৎসর্গ করলেন। -মুয়াত্তা

মালেক: ৩/৬৬৩; মুস্তাদরাকে হাকেম: ৪৯০৬ ইমাম যাহাবী
রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

রাসূলের প্রতিরক্ষায় সাতজন আনসারীর জীবন উৎসর্গকরণ

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم
أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه،
قال: «من يردهم عنا وله الجنة؟» - أو «هو رفيقي في الجنة»
-، فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا،
أو «هو رفيقي في الجنة» - «فقال: «من يردهم عنا وله الجنة؟
، فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى
قتل السبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: «ما
(1789) أنصفنا أصحابنا» ورواه مسلم

আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উছদ যুদ্ধের দিন কেবল সাতজন
আনসার ও দুজন কুরাইশ (মুহাজির) সাথীসহ (শত্রুবাহিনী
কর্তৃক) অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তারা তাকে বেষ্টন করে
ফেলে, তখন তিনি বললেন, কে আমার পক্ষ থেকে শত্রুদের
প্রতিহত করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অথবা বললেন,
সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে। তখন আনসারদের মধ্য হতে
একব্যক্তি অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ শুরু করল এবং পরিশেষে শহীদ
হলো। তারপর পুনরায় তারা তাঁকে বেষ্টন করে ফেললো

এবং অনুরূপভাবে (লড়াই করতে করতে তাঁদের) সাতজনই শহীদ হলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা সঙ্গীদের প্রতি সুবিচার করিনি। (আমরা বেঁচে রইলাম, অথচ তারা শহীদ হলেন।) –সহিহ মুসলিম: ১৭৮৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যারা তানযীমে যুক্ত আছেন তাদের জন্য আমিরদের অনুমতি ব্যতীত আক্রমণ করা ঠিক হবে না। এটা সামগ্রিক বিচারে তানযীমের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তবে যারা তানযীমে যুক্ত নেই তারা লোন উলফ হামল করতে পারেন। তাদের জন্য লোনউলফ ম্যাগাজিনে (পৃ: ১৭) ফরাসী নাগরিকদের টার্গেট হিসেবে বহু পূর্বেই সিলেকশন করে দেয়া হয়েছে আর এখন তো ফরাসিদের অপরাধের মাত্রা আরো বেড়েছে।

চলবে ইনশাআল্লাহ

১২.নবীজির জান-মান রক্ষায় সাহাবায়ে কেরামের চেতনা ও আদর্শ (দ্বিতীয় পর্ব)

রাসূলের প্রতিরক্ষায় হযরত তালহা রাযি. এর কারনামা

عن قيس بن أبي حازم، قال: «رأيت يد طلحة التي وقى بها
(3724) النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت». صحيح البخاري

কায়েস বিন আবু হাযেম রহ. বলেন, আমি তলহা রাযি. এর
ঐ হাতকে অবশ অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দিয়ে তিনি
(উহুদ যুদ্ধে শত্রুদের আক্রমণ হতে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম কে হিফায়ত করেছিলেন। -সহিহ বুখারী: ৩৭২৪

عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في اثني عشر رجلا
من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون،
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «من للقوم؟» فقال
طلحة: أنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كما أنت»
فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فقال: «أنت» فقاتل،
فقال «حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: «من للقوم؟
طلحة: أنا، قال: «كما أنت»، فقال رجل من الأنصار: أنا، فقال:
فقاتل، حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم» «أنت
رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي
رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله، فقال
أنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من للقوم؟» فقال طلحة
فقاتل طلحة قتال الأحد عشر، حتى ضربت يده، فقطعت
أصابعه، فقال: حس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو
قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، ثم رد الله
المشركين» سنن النسائي (3149) وقال الذهبي في سير أعلام

(7/ النبلاء (1/ 27) رواته ثقات. وقال الحافظ في فتح الباري
إسناده جيد (360)

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যখন কিছু লোক (যুদ্ধ হতে) ফিরে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে বারোজন আনসার কর্তৃক বেষ্টিত ছিলেন, তাদের মধ্যে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি.-ও ছিলেন। মুশরিকরা তাদেরকে আক্রমণ করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বললেন, এ দলের জন্য কে আছে? তালহা রাযি. বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পূর্বে যেমন ছিলে সেরূপ থাকো। তখন একজন আনসারী ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি। এ ব্যক্তি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। আবার তিনি লক্ষ্য করলেন এবং দেখতে পেলেন যে, মুশরিকরা আক্রমণ করছে, তিনি বললেন, এ দলের জন্য কে আছে? এবারও তালহা রাযি. বললেন, আমি। তিনি বললেন, তুমি পূর্বের মতই থাকো। এক আনসারী ব্যক্তি বললেন, আমি আছি। তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ তুমি। এ ব্যক্তিও যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন।

এরপর তিনি এভাবে বলতে থাকেন এবং আনসারীরা এক একজন করে বের হয়ে পূর্ববর্তীদের ন্যায় যুদ্ধ করে শহীদ

হন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি. অবশিষ্ট থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দলের জন্য কে আছে? তালহা রাযি. বললেন, আমি আছি। তিনি এগারো জনের যুদ্ধ একাই করলেন। পরিশেষে তার হাত অবশ হয়ে গেলো এবং হাতের আঙ্গুলগুলো কর্তিত হলো। এতে তিনি উহ্* শব্দের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি বলতে 'বিসমিল্লাহ', তা হলে তোমাকে ফিরিশতাগণ উপরে উঠিয়ে নিতেন, আর লোকেরা তা দেখতে পেতো। এরপর আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের ফিরিয়ে দিলেন। -সুনানে নাসায়ী: ৩১৪৯ হাফেয যাহাবী ও ইবনে হাজার রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

রাসূলকে কষ্টপ্রদানকারী কাফেরদের প্রতি সা'দ বিন মুয়ায রাযি. এর মনোভাব

عن عائشة: «أن سعاداً، قال، وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبَرِّ، فقال: اللهم، إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء، فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم، فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبتة فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار، إلا الدم يسيل إليهم،

فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد
 يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه». رواه البخاري
 قوله: (وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبَرِّ) الكلم: (1769) (3901) ومسلم
 الجرح، وَتَحَجَّرَهُ: اشتداده حتى يصير مثل الحجر قويا لا وجع
 به، ووقع في رواية لأحمد: «وكان قد برئ حتى ما يرى منه
 إلا مثل الخرص». وهو الحفظة الصغيرة كالقُرط

আয়েশা রাযি. বলেন, সা'দ রাযি. (খন্দকের যুদ্ধে বাহুতে যে)
 আঘাত পান তা শুকিয়ে যাচ্ছিল (এবং তিনি ক্রমান্বয়ে সুস্থ
 হয়ে উঠছিলেন)। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি
 জানেন, আমার নিকট আপনার রাসূলকে যে সম্প্রদায়
 অস্বীকার করেছে, তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে
 তাদের বিরুদ্ধে আপনার পথে যুদ্ধ করার চাইতে অধিক
 পছন্দনীয় বিষয় আর নেই। হে আল্লাহ! যদি কুরাইশদের
 সাথে যুদ্ধ করা এখনও বাকী থাকে তবে আপনি আমাকে
 জীবিত রাখুন, যেন আমি আপনার পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
 করতে পারি। হে আল্লাহ! আমি মনে করি যে, আমাদের
 এবং তাদের মধ্যে আপনি যুদ্ধ রহিত করেছেন। যদি তাই
 হয়, তবে আপনি আমার এই ক্ষতস্থান প্রবাহিত করে দিন
 এবং এতেই আমাকে মৃত্যু (শাহাদত) নসীব করুন। তখন
 তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে
 বনু গিফারের একটি তাবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহের

कारणे तारा घाबडे गेल। तखन तारा बलल, हे ताबुबासी!
तोमादेर दिक् थेके ए कि आसछे? देखा गेल ये, साद
रायि. एर ऋतस्थान थेके तखन प्रबल धाराय रक्त प्रवाहित
हछिल एवॆ एतेइ तिनि इन्तेकाल करेन। -सहिह बुखारी:
७९०१; सहिह मुसलिम: १९७९

शाहादातेर पूरुवे खुबाइब रायि. एर अभिव्यक्ति

काफेरार खुबाइब रायि. सह आरो कयेकजनके बन्दी करे
कुराइशदेर काछे बिक्री करे देय। कुराइशरा बदरेर
युद्धे तादेर ये आख्नीयस्त्रजन निहत हयेछे तादेर
प्रतिशोधस्वरूप तादेरके हत्या करे। खुबाइब रायि. के
शूलिते चड़ानोर पर तारा ताके जिज्जासा करे, तुमि कि
एटा पछन्द करो ये, मुहाम्मद तोमार शूलिते থাকवे,
आर तुमि मुक्ति पेये यावे? तखन खुबाइब रायि. ये जबाब
देन तइ प्रकृत मुमिनेर जबाब हओया दरकार, तिनि दृष्ट
कर्णे बलेन,

لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه

ना, महान आल्लाहर शपथ! आमि एटा पछन्द करि ना ये,
नबीजिर पाये सामान्य काँटा बिँधवे आर एर विनिमये आमि
मुक्ति पेये याबो। -तबारानी, मुजामे कबीर: ५२८४

রাসূলের প্রতিরক্ষায় আবু তালহা রাযি.

عن أنس رضي الله عنه، قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم محبوب به عليه بحجة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، فيقول: «انشرها لأبي طلحة». فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك.(صحيح البخاري: 3811 صحيح مسلم: 1811)

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবু তালহা রাযি. ঢাল হাতে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সনুখে প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আবু তালহা রাযি. সুদক্ষ তীরন্দায ছিলেন। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে দু' বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি শরাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই বলতেন, তোমার

তীরগুলি আবু তালহার জন্য রেখে দাও।

এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবু তালহা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হয়তো শত্রুদের নিষ্ক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ।
-সহিহ বুখারী: ৩৮১১; সহিহ মুসলিম: ১৮১১

মুহাম্মদ বিন মাসলামা কর্তৃক শাতিম কাব বিন আশরাফকে
হত্যা

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف، فإنه قد أذى الله ورسوله»، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن قل، «: أقتله؟ قال: «نعم»، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عانا وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي [ص:91] شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين - وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين أو: فقلت له: فيه وسقا أو وسقين؟ فقال: أرى فيه وسقا أو وسقين - فقال: نعم،

ارهنوني، قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهناك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهناك أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو قال سفيان: يعني -وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهناك اللأمة السلاح - فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة، :امراته وأخي أبو نائلة، وقال غير عمرو، قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيحي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمي بعضهم - قال عمرو: جاء معه برجلين، وقال: غير عمرو: أبو عبس بن جبر، والحارث بن أوس، وعباد بن بشر، قال عمرو: جاء معه برجلين، فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه، فدونكم فاضربوه، وقال مرة: ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كالبيوم ريحا، أي أطيب، وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، قال عمرو: فقال أتأذن لي أن أتأذن :أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال لي؟ قال: نعم، فلما استمكن منه، قال: دونكم، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه صحيح البخاري (4037) صحيح مسلم (1801)

জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, (একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কাব বিন আশরাফের হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছো? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান যে আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম) কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ বলতে পারো। এরপর মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. কাব বিন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে সাদকা চেয়ে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই (বাধ্য হয়ে) আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি।

কাব বিন আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম! সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, আমরা তো তাঁকে অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই।

কাব বিন আশরাফ বলল, ধারতো পেয়ে যাবে তবে কিছু

বন্ধক রাখো। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, কি জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, আপনি আরবের অন্যতম সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কি করে আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখবো আমরা? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি? (কেননা তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে তাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটাতো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। অবশেষে তিনি (মুহাম্মদ বিন মাসলামা) তাকে (কা'ব বিন আশরাফকে) পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কাব বিন আশরাফের দুধ ভাই আবু নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কাব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে (উপর তলা থেকে) নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছে? সে বলল, এইতো মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নাইলা এসেছে। (তাদের কাছে যাচ্ছি) কাবের স্ত্রী বললো, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা

ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কাব বিন আশরাফ বলল,
মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নাইলা,
(অপরিচিত কোন লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা
বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলেও তার যাওয়া উচিত।
(বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. সঙ্গে আরো
দুই ব্যক্তি নিয়ে (তথায়) গিয়েছিলেন ... এবং তাদেরকে
বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি (কোন বাহানায়)
তার চুল ধরে শূঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে
যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন
তোমরা তরবারী দিয়ে তাকে আঘাত করবে। ...
সে (কাব) চাঁদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে
সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি.
বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর
কখনো দেখিনি। ... কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের
সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে।
মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, আমাকে আপনার মাথা
শুকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ এরপর তিনি
মাথা শূঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শূঁকালেন।
তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে (আরেকবার
শূঁকাবার জন্য) অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর
তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা
তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে এ সংবাদ
জানালেন। -সহিহ বুখারী: ৪০৩৭; সহিহ মুসলিম: ১৮০১

রাসূলকে কষ্টপ্রদানকারীদের হত্যা করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের প্রতিযোগিতা

بعث رسول الله «: عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال
صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك، وعبد الله
بن عتبة، في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن» فقال
لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر، قال:
فتلطفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم، قال: فخرجوا
فغطيت رأسي: يقبس يطلبونه، قال: فخشيت أن أعرف، قال
وجلست كأنني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب، من أراد أن
يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربوط حمار
عند باب الحصن، فتنعشوا عند أبي رافع، وتحدثوا حتى ذهبت
ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدأت الأصوات،
ولا أسمع حركة خرجت، قال: ورأيت صاحب الباب، حيث
وضع مفتاح الحصن في كوة، فأخذته ففتحت به باب الحصن،
قال: قلت: إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى
أبواب بيوتهم، فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي
رافع في سلم، فإذا البيت مظلم، قد طفئ سراجيه، فلم أدر أين
الرجل، فقلت: يا أبا رافع قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو
الصوت فأضربه وصاح، فلم تغن شيئا، قال: ثم جئت كأنني
أغيثه، فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي، فقال: ألا
أعجبك لأمك الويل، دخل علي رجل فضرمني بالسيف، قال:

فعمدت له أيضا فأضربه أخرى، فلم تغن شيئا، فصاح وقام أهله، قال: ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم، أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية، فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية، فقال: أنعى أبا رافع، قال: فممت أمشي ما بي قلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم (4040) فبشرته. صحيح البخاري

وقال ابن إسحاق: لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن أبي فحدثني الزهري عن عبد الحقيق وهو بخيبر، فأذن لهم. قال الله بن كعب بن مالك قال: كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا. وكذلك الأوس. فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لكعب؟ فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر. (فتح الباري (لابن حجر 7 / 342)

বারা' রাফি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রাফিকে (হত্যার) উদ্দেশ্যে

আবদুল্লাহ বিন আতিক ও আবদুল্লাহ বিন উতবাকে একদল লোকসহ প্রেরণ করেন। যেতে যেতে তারা দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছালে আবদুল্লাহ বিন আতিক রাযি. তাদেরকে বলেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি যাই, দেখি কি করে সুযোগ করা যায়। আবদুল্লাহ বিন আতিক রাযি. বলেন, দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার জন্য আমি কৌশল অবলম্বন করব। ইতিমধ্যে তারা একটি গাধা হারিয়ে ফেলল এবং একটি আলো নিয়ে এর সন্ধানে বের হল।

তিনি বলেন, আমাকে চিনে ফেলবে আমি এ আশংকা করছিলাম। তাই (কাপড় দিয়ে) আমি আমার মাথা ও পা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে রইলাম যেন আমি পেশাব করার জন্য বসেছি। তখন দ্বার রক্ষী ডাক দিয়ে বলল, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে ভিতরে ঢুকে পড়ুন। আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পার্শ্বে গাধা বাঁধার স্থানে আত্মগোপন করে থাকলাম।

আবু রাফির নিকট সবাই বসে রাতের খানা খেয়ে গল্পগুজব করল। এভাবে রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেল। যখন কোলাহল থেমে গেল এবং কোন নড়াচড়া শুনতে পাচ্ছিলাম না, তখন আমি বের হলাম। দুর্গের চাবি যে ছিদ্রপথে রাখা হয়েছিল তা আমি পূর্বেই দেখেছিলাম। তাই রক্ষিত স্থান থেকে চাবিটি

নিয়ে আমি দুর্গের দরজাটি খুললাম।

আমি মনে মনে ভাবলাম, লোকেরা যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সহজেই আমি পালিয়ে যেতে পারব। এরপর দুর্গের ভিতরে তাদের যত ঘর ছিল সবগুলোর দরজা আমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। এরপর সিঁড়ি বেয়ে আবু রাফির কক্ষে উঠলাম। বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে ঘরটি ছিল ভীষণ অন্ধকার। লোকটি কোথায়, কিছুতেই আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি তাকে ডাকলাম, হে আবু রাফি। সে বলল, কে ডাকছ? তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে আমি একটু এগিয়ে গেলাম এবং তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল। এ আঘাতে কোন কাজই হয়নি।

এরপর আবার আমি তার কাছে গেলাম, যেন আমি তাকে সাহায্য করব। আমি এবার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবু রাফি' তোমার কি হয়েছে? সে বলল, কি আশ্চর্য ব্যাপার, তার মায়ের সর্বনাশ হোক, এইতো এক ব্যক্তি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে, আবদুল্লাহ* বিন আতিক বলেন, তাকে লক্ষ্য করে পুনরায় আমি আঘাত করলাম, এবারও কোন কাজ হলো না। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠল। তারপর পুনরায় আমি সাহায্যকারীর ভান করে কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। এসময় সে পিঠের উপর

চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল (এ দেখে) আমি তরবারির অগ্রভাগ তার পেটের উপর রেখে এমন জোরে চাপ দিলাম যে, আমি তার হাড়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির নিকট এসে পৌঁছলাম। ইচ্ছা ছিল নেমে যাব। কিন্তু (নামতে গিয়ে) আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম এবং এতে আমার পা ভেঙ্গে গেল। সাথে সাথে (পাগড়ী দিয়ে) আমি তা বেঁধে ফেললাম এবং আস্তে আস্তে হেঁটে সাথীদের নিকট চলে এলাম। এরপর বললাম, তোমরা যাও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ দাও। আমি তার মৃত্যু সংবাদ না শুনে আসবো না। উষালগ্নে মৃত্যু ঘোষণাকারী (প্রাচীরে) উঠে বলল, আমি আবু রাফীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। আবদুল্লাহ* বিন আতিক রাযি, বলেন, এরপর আমি উঠে চলতে লাগলাম। এ সময় আমার (পায়ে) কোন ব্যাথাই ছিল না। আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছার আগেই আমি তাদের ধরে ফেললাম এবং (গিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তার (আবু রাফির) মৃত্যুর সংবাদ জানালাম। -সহিহ বুখারী: ৪০৪০

ইমামুল মাগাযী মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. ইমাম যুহরী রহ.
 এর সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন কাব রাযি, থেকে বর্ণনা করেন,
 তিনি বলেন,

كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان
تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئاً إلا قالت الخزرج: والله
لا تذهبون بهذه فضلاً علينا. وكذلك الأوس. فلما أصابت الأوس
كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له من العداوة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لكعب؟ فذكروا ابن
أبي الحقيق وهو بخيبر. (سيرة ابن هشام: 2/274؛ فتح الباري
لابن حجر 7/ 342)

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য
এ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যে, ‘আউস’ ও ‘খায়রাজ’
গোত্রদ্বয় তার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করতো। আউস
কোন কিছু করলে খায়রাজ বলতো, ‘আল্লাহর শপথ তারা
এর দ্বারা আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবে না।
খায়রাজ কোন কিছু করলে আউসও তদ্রূপ বলতো। যখন
আউস কাব বিন আশরাফকে হত্যা করলো, তখন খায়রাজ
পরস্পর আলোচনা করলো, এমন কে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে কাবের মতো।
তখন তাদের আবু রাফে বিন আবুল হুকাইক কথা মনে
পড়লো। (এরপর তারা তাকে হত্যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলো) –সীরাতে
ইবনে হিশাম: ২/২৭৪; ফাতহুল বারী: ৭/৩৪২

১৩.যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব-১)

অনেকে মনে করেন, শাসক মুরতাদ হয়ে গেলেই শুধু তাকে অপসারিত করার জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়। আর যেহেতু শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে তাই শত কুফর-ইরতেদাদে লিপ্ত হলেও তারা শাসকগোষ্ঠীর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টা স্বীকার করেন না। তাদের কথাবার্তায় মনে হয়, শাসক মুরতাদ হওয়ার শুধু একটাই পদ্ধতি, তা হলো শাসক নিজেকে নাস্তিক বা মুসলিম নয় বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিবে, কিন্তু এই বন্ধুরা বুঝতে চান না, শাসকের কাঙ্ক্ষিত লোপ না পেলে শাসক কোন দিনও এই ঘোষণা দিতে যাবে না। ঘোষণা না দিয়ে শত কুফরী করেও যদি মুসলিম থাকে যায়, বরং আলেমদের সমর্থন পাওয়া যায়, সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেওয়া যায়, তাহলে ঘোষণা দিয়ে শুধু শুধু জনরোষের শিকার হওয়ার কি প্রয়োজন?

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিদ্রোহের পরিবর্তে তারা বর্তমান শাসকদের সংশোধনের জন্য দাওয়াতের পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়, কিন্তু এই পদ্ধতির প্রবক্তা মাওলানা আবুল

হাসান আলী নদভী রহিমাল্লাহ তার কিতাব 'রিদ্দাতুন ওলা
আবা বাকরীন লাহা'য় (পৃ: ৭-৮) শাসক ও এলিট শ্রেণীর
অধিকাংশই যে, ঘোষণা দেওয়া ব্যতীত ভিতরে ভিতরে
ব্যাপকভাবে নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে এ গেছে, এ ব্যাপারে
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাহলে আমরা শাসকদের
মুরতাদ বললে তারা আমাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষেপে যান
কেন, আমাদের খারেজী-চরমপন্থী ইত্যাদি উপাধি দেন কেন?

আসলে শাসকদের মুরতাদ বা মুসলিম হওয়া নিয়ে তাদের
সাথে আমাদের মূল বিরোধ নয়, বরং মূল দ্বন্দ্ব হলো,
শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ নিয়ে, এজন্য নিশ্চিতভাবেই বলা যায়,
যদি কোনদিন কোন শাসক প্রকাশ্যে নাস্তিক হওয়ার ঘোষণা
দিয়েও দেয়, তখনও তারা ইমাম না থাকা, শক্তি না থাকা,
বড় ফিতনার ভয় ইত্যাদি বাহানায় যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে
চেষ্টা করবে। আর এভাবেই তারা উবাদা বিন সামেতের
হাদিস *إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان* 'তবে
(শাসকদের থেকে) সুস্পষ্ট কুফর দেখলে যার স্বপক্ষে
তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে দলিল
রয়েছে, তখন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে' (সহিহ বুখারী,
৭০৫৬; সহিহ মুসলিম, ১৭০৯) এবং এ হাদিসের আলোকে
মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের ব্যাপারে উম্মাহর
ইজমায়ী সিদ্ধান্তকে কার্যত অস্বীকার করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো,

হাদিসের এমন মিসদাক-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা এবং হাদিসের উপর আমলের জন্য এমন এমন শর্ত আরোপ করা যা পূর্বেও কখনোও পাওয়া যায়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাওয়া যাবেও না, এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আর আমাদের মত চরমপন্থীদের দলিল হওয়া ছাড়া এ হাদিসের দ্বারা উম্মাহর কি বা ফায়েদা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বুঝলেন না, মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ না করে সবর করা বা তাকে দাওয়াত দিয়ে সংশোধন করাই উত্তম, মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে গেলেই বড় ফিতনার আশংকা !!!!

যাক, এই সংশয়ের বিষয়ে প্রবন্ধের শেষে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করবো, এখন আলোচনার বিষয়বস্তুতে ফিরে আসি, প্রকৃতপক্ষে শাসক মুরতাদ হওয়া, শাসকের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করার একটি ক্ষেত্র মাত্র। মুরতাদ হওয়া ছাড়াও আরো কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে অপসারিত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উলামায়ে কেরাম এমন কিছু ক্ষেত্র বর্ণনা করেছেন এবং এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্র তো এমন যেসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে সহিহ হাদিস রয়েছে, এবং উলামায়ে কেরাম এসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন। আর এসবগুলো কারণই

বর্তমান শাসকদের মাঝে পুরোপুরি বিদ্যমান। তাই যদি তর্কের খাতিরে ওদের মুসলিম হিসেবে মেনেও নেই, তারপরও নিম্নোলিখিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে ওদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আমরা প্রথমে সে ক্ষেত্রগুলোর তালিকা পেশ করবো, এরপর প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার কারণে এক বা দুই পর্বে একটি একটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

যেসব ক্ষেত্রে মুরতাদ না হলেও শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা যায়:

- ১ - নামায় তরক করা।
- ২ - কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা না করা।
- ৩ - শাসকের পাপাচার ও জুলুম অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, যার কারণে মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ৪ - কাফের-মুরতাদদের সাথে জিহাদ পরিত্যাগ করা, ওদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা এবং ওদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা।

এ পর্বে নামায় পরিত্যাগকারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ

করার বিষয়ে সহিহ হাদিস ও আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। আর আগামী পর্বে এ বিষয়ে কিছু সংশয়ের উত্তর দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আমরা যে আলেমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করবো, তারা সবাই হানাফী, মালেকী কিংবা শাফেয়ী মাযহাবের, আর এই তিন মাযহাবে নামায তরক করা কুফরী নয়। বরং শুধু হাম্বলী মাযহাবেই নামায তরক করা কুফরী। এরপরও তিনো মাযহাবের আলেমগণ নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা আমাদের দাবী ‘নামায তরক করা শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র’ প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

عن عوف بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»، قيل يا رسول الله، أفلا نناذبهم بالسيف؟ فقال: «: ويلعنونكم»، قيل (1855): رواه مسلم. «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة

আউফ বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া করবে তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের

मध्ये निकृष्ट शासक हलो तारा, यादरके तोमरा अपछन्द करवे एवं ताराओ तोमादरके अपछन्द करवे, यादरके तोमरा ला'नत करवे एवं ताराओ तोमादरके ला'नत करवे। बला हलो, हे आल्लाहर रासूल! आमरा कि तरवारि द्वारा तादर मोकाबेला करवो ना? रासूल सल्लाल्लाह आलाइहि ओया साल्लाम बललनः ना, यतदिन तारा तोमादर माबे नामाय कायैम करे। -सहिह मुसलिम, १८५५

عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع»، قالوا: يا رسول الله، (1854) ألا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلوا» رواه مسلم

उम्मे सालामा रायिआल्लाह आनहा थेके वर्णित, रासूल साल्लाल्लाह आलाइहि ओयासाल्लाम बलन, 'एमन किछु लोकके तोमादर आमिर नियुक्त करा हवे यादर किछु काज तोमादर काछे ভালो मने हवे आर किछु काज मन्द मने हवे, (अर्थां भालो-मन्द सब काजइ करवे), सुतरां ये तादर (मन्द काजगुलोक) अपछन्द करवे से मुक्ति पावे, आर ये प्रतिवाद करवे सेओ मुक्ति पावे, किन्तु ये सल्लुष्टि प्रकाश करवे, एवं सहयोगिता करवे से मुक्ति पावे ना। साहाबाये केराम प्रश्न करलन, आमरा कि एमन आमिरदर साथे युद्ध करवो ना, रासूल साल्लाल्लाह आलाइहि ओयासाल्लाम

বললেন, না, যতদিন তারা নামায পড়বে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। -সহিহ মুসলিম, ১৮৫৪

১. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে বাত্তাল রহিমাল্লাহ (মৃ: ৪৪৯ হি.) বুখারী শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ ‘শরহ সহিহিল বুখারী’তে বলেন,

والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم . . . وروى الأجرى، عن البغوى، عن القواريرى: حدثنا حكيم بن حزام وكان من عباد الله الصالحين حدثنا عبد الملك بن عمير، عن الربيع بن عميلة، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم أمراء يفسدون، وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فله الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليه الوزر وعليكم الصبر. (شرح صحيح البخاري لابن بطال:

1423 ط. مكتبة الرشد: 5/127)

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে কিংবা নামায কায়েম করা ছেড়ে দিলেই শুধু তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ও তাদের অপসারিত করা ওয়াজিব হয়।

এছাড়া শুধু জুলুম-অত্যাচারের কারণে তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না, ... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অচিরেই এমন

কিছু আমির তোমাদের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করবে, যারা (জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে) অশান্তি সৃষ্টি করবে, তবে তাদের দ্বারা যতটুকু কল্যাণ হবে তা তাদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির থেকে বেশি, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে তারা প্রতিদানের হকদার হবে এবং তোমাদের উপর তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আবশ্যিক হবে, আর যারা আল্লাহর নাফরমানী করবে তারা গুনাহের ভাগীদার হবে, আর এক্ষেত্রে তোমাদের কর্তব্য হবে সবর ও ধৈর্য্যধারণ। -শরহু সহিহিল বুখারী, ৫/১২৭

ইবনে বাত্তাল আরো বলেন,

فى هذه الأحاديث حجة فى ترك الخروج على أئمة الجور،
ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام
المتغلب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد. (شرح صحيح
البخاري لابن بطال: 10/8 ط. مكتبة الرشد: 1423)

এ সকল হাদিস প্রমাণ করে জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না, বরং তার আনুগত্য করতে হবে, ততদিন পর্যন্ত যতদিন সে জুমুআ কায়েম করবে, এবং জিহাদ জারী রাখবে। -শরহু সহিহিল বুখারী, ১০/৮

২. ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝে আসে যে ফাসেক ও জালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ না করার যে আদেশ হাদিসে দেওয়া হয়েছে তা ঐ শাসকের ক্ষেত্রে যে নামায কায়েম করে, জিহাদ জারী রাখে, এবং তার দ্বারা যে কল্যাণ হয় (যেমন নামায কায়েম করা, মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ইত্যাদি) তা তার দ্বারা হওয়া ক্ষতির চেয়ে বেশি। এ বিষয়টিই ইমাম ইবনুল উযির ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৪০ হি.) তার কালজয়ী গ্রন্থ আররাওয়ুল বাসিমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি বলেন,

ومن ذلك كلام ابن بطّال الذي أورده المعترض، وقد مرّ، وهو على المعترض لا له، فإنّه روى عن الفقهاء أنّهم اشترطوا في طاعة المتغلب إقامة الجمعات والأعياد، والجهاد، وإنصاف المظلوم غالباً. (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: 2/384 ط. دار عالم الفوائد)

ইবনে বাত্তালের যে কথার উপর আপত্তিকারী আপত্তি করেছে, সে কথা তো আপত্তিকারীর বিপক্ষেই যায়, কেননা ইবনে বাত্তাল ফুকাহায়ে কেরাম থেকে নকল করেছেন যে, তারা জোরপূর্বক ক্ষমতাদখলকারীর আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে জুমুআ ও ইদ কায়েম করা, জিহাদ জারী রাখা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাজলুমের পক্ষে সুবিচার করা ইত্যাদি বিষয়ের শর্ত করেছেন। -আররাওয়ুল বাসিম,

২/৩৮৪

৩. কাযী ইয়ায রহিমাল্লাহ (ম্: ৫৪৪ হি.) বলেন,

لا خلاف بين المسلمين أنه لا تتعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تتعقد لها وتستديم على التأويل، فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب 6/246: إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. (إكمال المعلم (ط. دار الوفاء: 1419 هـ

উলামায়ে কেলাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। অতএব শাসক যদি এজাতীয় কাজগুলোর কোন একটি, যেমন, কুফর, শরীয়া পরিবর্তন

অথবা বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। -ইকমানুল মু'লিম, ৬/২৪৬

৪. ইমাম নববী রহিমাছল্লাহু (মৃ: ৬৭৬ হি.) কাযী ইয়ায রহিমাছল্লাহুর উপরোল্লিখিত বক্তব্য সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন,

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تتعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. وقال بعض البصريين: تتعقد له وتستدام له، لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. (شرح مسلم للنووي: 12/229 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392)

কাযী ইয়ায রহিমাছল্লাহু বলেন, উলামায়ে কেলাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো

খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। কাযী ইয়ায বলেন, শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়া পরিবর্তন করে অথবা বিদ'আত করে, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা। -শরহ মুসলিম, ১২/২২৯

৫. মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস কুরতুবী মালেকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৫৬ হি.) 'তালখীসু সহিহি মুসলিম' নামে সহিহ মুসলিমের একটি সারসংক্ষেপ তৈরী করেন, এরপর আলমুফহিম নামে সেই সংক্ষিপ্তগ্রন্থের শরহ লিখেন, এই কিতাবে তিনি বলেন,

قوله على المرء المسلم السَّمْع والطاعة ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وَجِبَ خَلْعُهُ عَلَى

المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين
كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومَنَع من ذلك،
وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في
وجوب خَلْعِهِ. (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم:
1497: 4/39 ط. دار ابن كثير)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “মুসলিমের
উপর শ্রবণ ও আনুগত্য ওয়াজিব”, প্রমাণ করে,
মুসলমানদের জন্য ইমাম, আমির ও কাযীর আনুগত্য করা
ওয়াজিব, আর এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে কোন দ্বিমতও
নেই, যতক্ষণ না শাসক গুনাহের আদেশ করে। যদি শাসক
গুনাহের আদেশ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে গুনাহের
কাজে তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। এখন সেই
গুনাহটা যদি কুফর হয়, তাহলে সকল মুসলমানের উপর
ফরজ হলো, তাকে অপসারণ করা। এমনিভাবে সে যদি
নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতো দ্বীনের
মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো
পালনে বাধা দেয়, তদ্রূপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা
দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ না করে, তখনও তার
অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। -
আলমুফহিম, ৪/৩৯

৬. মুফাসসির আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭১
হি.) বলেন,

الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه
تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم
وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو
الترك إلى دعائها أو شي من الشريعة، لقوله عليه السلام في
حديث عبادة: (وَأَلَّا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا
بِوَأَحَا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بَرَهَانٌ وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: (لَا
مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ) الْحَدِيثِ. أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. وَعَنْ أَمِّ سَلْمَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّهُ يَسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءَ
فَتَعْرِفُونَ وَتَنْكُرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ
مَنْ رَضِيَ وَتَابِعَ- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا
صَلُّوا أَيُّ مَنْ كَرِهَ بَقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بَقَلْبِهِ. أَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ.
(الجامع لأحكام القرآن: 1/271 ط. دار الكتب المصرية: 1384)

ইমাম ফাসেক হয়ে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে সে
অপসারিত হয়ে যাবে, এবং প্রকাশ্য ও সুবিদিত ফিসকের
কারণে তাকে অপসারণ করতে হবে, আর অন্যান্য
আলেমদের মতে ইমাম অপসারিত হবে না, যতক্ষণ না সে
কুফরে লিপ্ত হয় কিংবা নামায় পরিত্যাগ করে, অথবা
নামায়ের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয়, কিংবা শরিয়তের
কোন বিধান কায়ম করা ছেড়ে দেয়। কেননা উবাদা বিন

সামেতের সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বাইয়াত নিয়েছেন, আমরা আমিরদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ করবো না, তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। আউফ বিন মালিকের সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করবে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। ইমাম মুসলিম উল্লিখিত হাদিসদ্বয় বর্ণনা করেছেন। উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এমন কিছু লোককে তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হবে যাদের কিছু কাজ তোমাদের কাছে ভালো মনে হবে আর কিছু কাজ মন্দ মনে হবে, (অর্থাৎ ভালো-মন্দ সব কাজই করবে), সুতরাং যে তাদের (মন্দ কাজগুলোকে) অপছন্দ করবে সে মুক্তি পাবে, আর যে প্রতিবাদ করবে সেও মুক্তি পাবে, কিন্তু যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, এবং সহযোগিতা করবে সে মুক্তি পাবে না। সাহাবায়ে কেলাম প্রশ্ন করলেন, আমরা কি এমন আমিরদের সাথে যুদ্ধ করবো না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায পড়বে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। ... এই হাদিসটিও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

-তাহফসীরে কুরতুবী, ১/২৭১

৭. তাফসীরে বাইযাবীর লেখক ইমাম বাইযাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৮৫ হি.) ‘তুহফাতুল আবরার’ নামে ইমাম বাগাভী রচিত হাদিসের কিতাব ‘মাসাবীহুস সুন্নাহ’র একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, এ কিতাবে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

وإنما مُنِعَ عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين، وعنوان الإسلام، والفرق بين الكفر والإيمان، حذرا من هيج الفتن واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشد نكايّة من احتمال نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم. (تحفة الأبرار وزارة الأوقاف والشؤون 2/546. شرح مصابيح السنة: ط (الإسلامية بالكويت: 1433 هـ

নামায হলো দ্বীনের ভিত্তি, ইসলামের পরিচায়ক ও ঈমান-কুফরের মাঝে পার্থক্য, তাই যতদিন পর্যন্ত শাসকরা নামায কায়েম করে ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করলে ফিতনা হবে এবং লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। -

তুহফাতুল আবরার, ২/৫৪৬

7. আল্লামা হ্বীবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৭৪৩ হি.) মেশকাত

শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ ‘আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনানে’
বলেন,

وأجمعوا على أن الإمامة لا تتعقدُ لكافر ولو طرأ عليه الكفرُ
الكاشف (.انزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها
عن حقائق السنن: ص: 2560 مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة
(المكرمة)

আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ
করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে
খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী
প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবে
যাবে। এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা
নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় তাহলেও। -

আলকাশিফ আন হাকায়িকিস *সুনান, পৃ: ৮/২৫৬০

৯. শাফেয়ী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম হাফেয ইবনুল
মুলাক্কিন রহিমাল্লাহ (ম্: ৮০৪ হি.) সহিহ বুখারীর শরাহ
‘আততাওযীহ’তে বলেন,

وفي هذه الأحاديث حُجَّةٌ في ترك الخروج على أئمة الجور
ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء يجمعون على أن الإمام
المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والجهاد. (التوضيح
(لشرح الجامع الصحيح: 32/282 ط. دار النوادر: 1429 ۰

যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা এবং তাদের কথা শোনা ও আনুগত্য আবশ্যিক হওয়ার প্রমাণ এ হাদীস সমূহে বিদ্যমান রয়েছে। ফুকাহায়ে কেলাম এ ব্যাপারে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য ততদিন আবশ্যিক, যতদিন তারা নামাযের জামাত এবং জিহাদ কায়েম রাখে। -আততাওয়ীহ, ৩২/২৮২

তিনি আরো বলেন

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». احتجَّ بهذا الحديث الخوارجُ، فرأوا الخروجَ على أئمة الجور والقيامَ عليهم عندَ ظُهورِ جورهم، والذي عليه جُمهورُ الأئمة المنعُ، إلا بكفرهم بعد التوضيح لشرح الجامع (إيمانهم أو تركهم إقامة الصلوات الصحيح: 18/66)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইমামের আনুগত্য ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে কোন অন্যায় কাজের আদেশ দেয়। যদি সে কোন অন্যায় কাজের আদেশ দেয় তাহলে তার কোন আনুগত্য নেই'। এ হাদীস দ্বারা খারেজীরা দলিল দিয়ে থাকে, ফলে তারা জালেম শাসক থেকে জুলুম

প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাকে
অপসারণ করা জায়েয মনে করে। তবে জুমহূরের মত হলো
তা না করা, তবে হাঁ, তারা যদি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী
করে অথবা নামায কায়েম করা ছেড়ে দেয়, তখন তাদের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। -আততাওযীহ, ১৮/৬৬

১০. হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুল মালাক রহিমাহুল্লাহ (মূ:
৮৫৪ হি.) ‘মাসাবীহুস সুন্নাহ’র শরাহ ‘শরহুল মাসাবীহ’তে
উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة" منعه
صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما داموا مُقيمي الصلاة الفارقة
بين الإيمان والكفر، يحذر هيجان الفتنة التي هي أشد من
المصابرة على ما ينكر منهم، وفيه دليل على عدم انعزال الإمام
بالفسق. (شرح المصابيح لابن ملك: 4/246 ط. إدارة الثقافة
الإسلامية: 1433 هـ)

শাসকরা যতদিন পর্যন্ত ইমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী
নামায কায়েম করে ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।
কেননা এক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করলে ফিতনা হবে এবং
লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। এই হাদিস প্রমাণ করে
ফিসকের কারণে ইমাম অপসারিত হবে না। -শরহুল

মাসাবীহ, 8/২৪৬

১১. মোল্লা আলী ক্বারী রহ. উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু
আনহার হাদিসের ব্যাখ্যায় (মু: ১০১৪ হি.) বলেন,

أي أفلا نعزلهم ولا (قال: قلنا: يا رسول الله أفلا نناذبهم)
نطرح عهدهم ولا نحاربهم (عند ذلك) أي إذا حصل ما ذكر
قال: لا) أي لا تناذبوهم (ما أقاموا فيكم الصلاة) أي مدة)
إقامتهم الصلاة فيما بينكم ; لأنها علامة اجتماع الكلمة في
الأمة، قال الطيبي: فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة وأن تركها
موجب لنزع اليد عن الطاعة كالكفر على ما سبق في حديث
عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا. (مرقاة المفاتيح: 6/2396 ط.
دار الفكر: 1423)

রাবী বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে সময়
আমরা কি তাদেরকে সরিয়ে ফেলব না, তাদের সাথে কৃত
অঙ্গীকার ছুড়ে ফেলব না, এবং তাদের সাথে লড়াই করব
না? তিনি বললেন না, অর্থাৎ যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে
নামায কায়েম করে ততক্ষণ তা করো না। কেননা এটি
মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় থাকার প্রমাণ বহন করে।
আল্লামা হ্বীবী বলেন, উক্ত হাদীসে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত
রয়েছে যে, নামাযের বিষয়টি অনেক গুরুতর এবং শাসক
নামায না পড়লে তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে ফেলা

আবশ্যিক হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি কুফরি প্রকাশ
পাওয়ার মতো। যেমনটি উবাদা বিন ছামেতের ‘তবে যদি
তোমরা কুফরি দেখ’ শীর্ষক হাদীসে গত হয়েছে। -
মিরকাতুল মাফাতীহ, ৬/২৩৯৬

১২. হিন্দুস্তানের অন্যতম আলেম শায়েখ আব্দুল হক
মুহাদ্দিসে দেহলভী রহিমাল্লাহ (মৃ: ১০৫২ হি.) মিশকাত
শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ ‘লামাআতুত তানকীহ’তে উম্মে সালামা
রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وقوله: (أفلا نناذبهم) بالسيف، وفي المشارق: أي: ندافعهم
إذا رميته :ونباعدهم بالقتال، انتهى. وفي (مجمع البحار): نبذته
وأبعدته، أي: نقاتلهم. وقوله: (لا) أي: لا تناذبوهم ما أقاموا
الصلاة، وفيه أن ترك الصلاة موجب لمناذبتهم، ونزع اليد من
طاعتهم؛ لأن الصلاة عماد الدين، والفارق بين الكفر والإيمان
بخلاف سائر المعاصي، وفيه تشديد وتهديد عظيم على ترك
(هـ 1435: الصلاة. (لمعات التنقيح: 6/454 ط. دار النوادر

সাহাবায়ে কেলাম প্রশ্ন করলেন, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ
করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
না, যতদিন তারা নামায কায়েম করবে ততদিন তাদের
সাথে যুদ্ধ করবে না। এ হাদিস প্রমাণ করে, নামায ছেড়ে
দেওয়ার কারণে শাসকদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের আনুগত্য
পরিহার করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কেননা নামায হলো দ্বীনের

ভিত্তি এবং ঈমান-কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়। কিন্তু অন্যান্য গুনাহের বিষয়টা নামাযের মত নয়। (তাই অন্যান্য গুনাহের কারণে ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। হাদিস থেকে নামাযের গুরুত্ব ও নামাযের পরিত্যাগের ভয়াবহ পরিণতি বুঝে আছে। -লামাআতুত তানকীহ, ৬/৪৫৪

১৩. ইমাম নববীর অমরগ্রন্থ ‘রিয়ায়ুস সালিহিন’ আমরা সবাই চিনি। মুহাক্কিক আলেমদের নিকট এ কিতাবের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শরহ হলো আল্লামা ইবনে আল্লামান দিমাশকী শাফেয়ী রহ. (মৃত্যু ১০৫৭ হি.) রচিত ‘দালিলুল ফালিহীন’, এ কিতাবে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন-

أي أنطيعهم على سوء (قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننايذهم) وصفهم المذكور، فلا ننايذهم، أي نخالفهم بترك الطاعة لهم (قال: لا) أي: لا تنايذوهم (ما) مصدرية ظرفية (أقاموا فيكم الصلاة) أي مدة إقامتهم لها فيكم، وفيه دليل تعظيم الصلاة. ويؤخذ منه: أن ترك إقامة الصلاة كالكفر البواح لقوله في حديث وقد تقدم في باب الأمر. «عبادة:» لا إلا أن تروا كفرا بواحا يا رسول: بالمعروف، وكذا تقدم فيه من حديث أم سلمة: «قالوا الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.» رواه مسلم، وبه يتبين تفسير ننايذهم في حديث الباب، لأن تفسير السنة

بالسنة أولى، وفي المصباح: نابذته الحرب: كاشفته إياها
وجاهرته بها. (دليل الفالحين: 5/124 ط. دار المعرفة: 1425
هـ)

হে আল্লাহর রাসূল তারা এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কি
আমরা তাদের আনুগত্য করবো, না কি তাদের আনুগত্য
পরিহার করে তাদের সাথে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হবো। রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা
তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে তোমরা তাদের সাথে
দ্বন্দ্ব জড়িয়ে না। এ হাদীস থেকে নামাযের গুরুত্ব বোঝা
যায়। এথেকে এও বোঝা যায় যে, নামায প্রতিষ্ঠা ছেড়ে
দেওয়া কুফরে বাওয়াহের মতই। কেননা উবাদা রাযি. এর
হাদীসে এসেছে ‘ততক্ষণ কিতাল করবে না, যতক্ষণ না
কুফরে বাওয়াহ দেখতে পাবে’। আমরা বিল মারুফের
অধ্যায়ে এই হাদিসটি গত হয়েছে এবং সেখানে উম্মে
সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসটিও
অতিবাহিত হয়েছে, ‘সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা কি
তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায কায়েম করবে
ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না’ সহিহ মুসলিম। এই
হাদিস দ্বারা বুঝে আসে, আমাদের আলোচ্য হাদিসে مناقبة

(দ্বন্দ্ব) দ্বারা যুদ্ধ উদ্দেশ্যে। কেননা হাদিসের ব্যাখ্যা হাদিস দ্বারা করাই উত্তম। -দালিলুল ফালিহীন, ৫/১২৪

চলবে ইনশাআল্লাহ

১৪.যে সকল কারণে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা
ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব-২)

গত পর্বে আমরা নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ
ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সহিহ হাদিস ও নির্ভরযোগ্য
আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরেছি, এ পর্বে কিছু সংশয়ের
উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো সংশয়টা
হলো, উবাদা বিন সামেতের হাদিসে তো শাসকের পক্ষ
থেকে কুফরী প্রকাশ পাওয়া ব্যতীত বিদ্রোহ করতে নিষেধ
করা হয়েছে, আর নামায ছেড়ে দেওয়া হানাফী, মালেকী ও
শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী তো কুফরী নয়, তাহলে কিভাবে
নামায তরকের কারণে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা হবে?

এর উত্তর হলো, নামায পরিত্যাগ করা কুফর না হলেও
কুফরের আলামত বা নিদর্শন। কুফরের বিষয়টি যেহেতু
একটু জটিল, আর শরিয়তের মূলনীতি হলো, শরিয়ত তার
বিধিবিধানের ভিত্তি সুস্ব ও জটিল বিষয়ের উপর না রেখে

সুস্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য বিষয়ের উপর রাখে, তাই শরিয়ত নামায তরক করাকে শাসকের কুফরের আলামত ধরে নিয়ে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের আদেশ দিয়েছে। উপরে আমরা উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখায় ইমাম বাইযাবী, ইবনে মালাক ও শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর যে বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে এ বিষয়টি খুব সহজেই বুঝে আসে, কেননা তারা সকলেই নামায তরক করাকে কুফরীর আলামত হিসেবে গণ্য করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এর পবিত্র সীরাতেও আমরা এর নযীর দেখতে পাই, আনাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. (صحيح البخاري: 382): 610 صحيح مسلم

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শত্রুর উপর) ভোরবেলা অতর্কিতে আক্রমণ করতেন। (তবে) তিনি (আক্রমণের পূর্বে) আযান শোনার জন্য মনোযোগ সহকারে অপেক্ষা করতেন, যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন, নতুবা আক্রমণ করতেন। সহিহ বুখারী, ৬১০ সহিহ মুসলিম, ৩৮২

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার রহিমাল্লাহ (মু: ৮৫২ হি.) বলেন,

قال الخطابي: فيه أن الأذان شعار الإسلام، وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. (فتح الباري: 2/90 ط. دار الفكر)

খাতাবী রহ, বলেন, এই হাদিস প্রমাণ করে, আযান ইসলামের শিয়ার বা নিদর্শন। সুতরাং যদি কোন ভূখন্ডের অধিবাসীরা সকলে মিলে আযান ছেড়ে দেয় তাহলে মুসলিম শাসকের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হয়ে যাবে। -
ফাতহুল বারী, ২/৯০

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করা না করার ভিত্তি ইসলামের আলামত অর্থাৎ আযান শোনা বা না শোনার উপর রাখছেন, অথচ এখানে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, যারা আযান দিচ্ছে না তারা নওমুসলিম হওয়ার কারণে আযান শিখতে পারেননি। যেমনিভাবে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তারা মুসলিম না হয়ে শুধুমাত্র মুসলমানদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আযান দিচ্ছে। এই বিষয়টিই হাফেয ইবনে হাযার তুলে ধরেছেন, তিনি হাদিসের ব্যাখায় বলেন,
وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. (فتح الباري: 6/112 ط. دار الفكر)

হাদিসে দলিল ও আলামত দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত করার প্রমাণ রয়েছে, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র আযান শোনার দ্বারাই যুদ্ধ হতে বিরত থেকেছেন। -
ফাতহুল বারী, ৬/১১২

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, সফরে নামায কসর করার বিধান। মূলত সফরের কষ্টের কারণে সফরে নামায কসর করার বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কষ্টের বিষয়টি যেহেতু দূর্বোধ্য ও আপেক্ষিক, কারো কাছে একটি বিষয় কষ্টকর হলেও অন্যের জন্য তা একেবারেই সহজ, তাই শরিয়ত কসরের ভিত্তি কষ্টের উপর না রেখে নির্দিষ্ট দূরত্বের সফরের উপর রেখেছে, যা একটি সুস্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য বিষয়, তাই এখন শরয়ী সফর (প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার) করলেই মানুষ কসর করতে পারবে, যদিও এই সফর অত্যাধুনিক ও আরামদায়ক বাহনে কোন কষ্ট ছাড়াই হয়। -
দেখুন, মাবসুতে সারাখসী, ১৭/১৫৬ দারুল মা'রেফা, ১৪১৪ হি.; কাশফুল আসরার, ইমাম আব্দুল আযীয বুখারী ৩/৪৬৮ দারুল কুতুব, ১৪১৮ হি। শরিয়তে এর অসংখ্য নযির রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ কিছু নযির উল্লেখ করলাম, আরো নযির জানার জন্য দেখুন, হেদায়া, ১/১৯-২০, দারুল ইহইয়াউত তুরাস, এবং হেদায়ার শরাহ ইনায়া ১/৬৪ দারুল

ফিকর; আলমুহিতুল বুরহানী, ১/৭৪ দারুল কুতুব, ১৪২৪ হি.
 এবং বাজলুল মাজহুদ, ২/১৩২ মারকাযুশ শায়েখ আবুল
 হাসান, ১৪২৭ হি.; ফাতহুল কাদির, ১/১০৭, দারুল ফিকর;
 আলইখতিয়ার, ৪/১২৯ মাতবাআতুল হালাবী, ১৩৫৬ হি.;
 তাবয়ীনুল হাকায়িক, ৩/৩৩; তুহফাতুল ফুকাহা, ২/৩৩২,
 দারুল কুতুব, ১৪১৪; আলওয়াশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ:
 ২৫৫ মাজমাউল আনহুর, ১/৬০ দারু ইহইয়াউত তুরাস
 এবং রদ্দুল মুহতার, ১/৩৩১ দারুল ফিকর, ১৪১২ হি.)

এ হলো, উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা হাদিসের
 ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য, কিন্তু থানভী রহিমাহুল্লাহ এই
 হাদিসের এমন ব্যাখ্যা করেছেন, যার দ্বারা হাদিসের কোন
 ফায়দাই বাকী থাকে না, তিনি বলেন,

حديث ثاني ميں ترك صلاة أس زمانه ميں كفر هي كي
 علامت تهي، پس اس كا حاصل كفر بي هوا (امداد الفتاوى:
 مكتبة دار العلوم كراچي: 1431 هـ. 5/127 ط

‘হাদিসে নামায পরিত্যাগকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে
 বলা হয়েছে, কেননা রাসূলের যমানায় নামায তরক করা
 কুফরের আলামত ছিল। সুতরাং ‘যতদিন পর্যন্ত শাসক
 নামায পড়বে ততদিন তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করবে না’ এর
 অর্থ এটাই যে যতদিন সে মুসলমান থাকবে ততদিন তার

বিপক্ষে যুদ্ধ করবে না। -ইমদাদুল ফাতওয়া, ৫/১২৭

এরপর তিনি সেই যমানায় নামায তরক করা যে কুফরের
আলামত ছিল এর স্বপক্ষে নিচের হাদিসগুলো উদ্ধৃত করেন,

جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». رواه
(82): مسلم

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد
وَقَالَ: هذا حديث حسن صحيح (2621): كُفْرًا». رواه الترمذي

عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: كان أصحاب محمد صلى
الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير
(2622): الصلاة. رواه الترمذي

জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের মাঝে এবং কুফর ও
শিরকের মাঝে প্রতিবন্ধক হলো নামায তরক করা। -সহিহ
মুসলিম, ৮২

আবু মুসা আশআরী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাদের মাঝে ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য হলো, নামায। সুতরাং যে নামায ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে। জামে তিরমিযি, ২৬২১ ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

আব্দুল বিন শাকিক বলখী রহিমাল্লাহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল তরক করাকে কুফরী মনে করতো না। - জামে তিরমিযি, ২৬২২

কিন্তু থানভী রহিমাল্লাহু এই বক্তব্যের উপর আমাদের পাঁচটি আপত্তি রয়েছে,

১. নামায তরক করা শুধু রাসূলের যমানায় কুফরের আলামত হবে কেন, রাসূলের হাদিস কি শুধু তার যমানার জন্যই, না কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিম উম্মাহর জন্য? উপরে ইমাম বাইযাবী, ইবনে মালাক ও শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর যে বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি, তারা সকলেই নামাযকে ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী ও নামায তরক করাকে কুফরীর আলামত হিসেবে গণ্য করেছেন, তাদের এই বক্তব্যের ভিত্তি

যে, থানভী রহিমাহুল্লাহর উল্লেখ করা হাদিসগুলো তা সহজেই বোধগম্য।

২. উপরে আমরা যে আলেমদের বক্তব্য নকল করেছি থানভী রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য তাদের বক্তব্যের বিপরীত, বরং যেহেতু ইমাম কুরতুবী ও অনেকেই নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন এবং থানভী রহিমাহুল্লাহর পূর্বে কোন আলেম ‘নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষেও যুদ্ধ করা যাবে না’ একথা বলেননি, তাই বলা যায় থানভী রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য শরিয়তের দলিল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের বক্তব্যের পরিপন্থী একটি শায় ও বিচ্ছিন্ন মত।

৩. থানভী রহিমাহুল্লাহ হাদিসের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা তার পূর্বের একাধিক আলেম স্পষ্টরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী বলেন,

ظاهره: ما حافظوا على «وقوله: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامها وداموا على ذلك وأظهروه، وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الإسلام، ... والأوّل المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 4/66 ط. (. أظهر دار ابن كثير: 1417 هـ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যতদিন তারা নামায কায়েম করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না, এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যতদিন তারা নির্ধারিত নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত প্রকাশ্যে নামায আদায় করবে, ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের অর্থ হলো, যতদিন তারা ইসলামের উপর থাকবেন ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু হাদিসের প্রথম অর্থটিই বেশি স্পষ্ট।
-আলমুফহিম, ৪/৬৬

ইমাম ইবনে রসলান শাফেরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৪৪ হি.) ও সুনানে আবু দাউদের শরহ 'শরহ সুনানি আবী দাউদে' হবহ্ব একই কথা বলেছেন, তার ইবারত দেখুন,

قيل: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ لفظ مسلم: قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ وكذا (قال) سليمان (ابن داود على فعل ذلك (قال: لا ما صلوا) الصلوات الخمس. أي: ما أقاموا فيكم الصلاة المعهودة بحدودها وأحكامها وأظهروا فعلها. والأول أظهر. ... ما داموا على كلمة الإسلام، وقيل: معناه ط: دار الفلاح: 18/377: (شرح سنن أبي داود لابن رسلان 1437) هـ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যতদিন তারা নামায কায়েম করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না, এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যতদিন তারা নির্ধারিত নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত প্রকাশ্যে নামায আদায় করবে, ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের অর্থ হলো, যতদিন তারা ইসলামের উপর থাকবেন ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। ... কিন্তু হাদিসের প্রথম অর্থটিই বেশি স্পষ্ট।
-শরহ সুনানি আবী দাউদ, ১৮/৩৭৭

৪. খানভী রহিমাল্লাহ হাদিসের যে ব্যাখ্যা করেছেন, এর দ্বারা হাদিস থেকে নতুন কোন ফায়েদা পাওয়া যায় না, বরং এই হাদিস ও উবাদা বিন সামেতের হাদিস একই অর্থবোধক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আমরা হাদিসের যে ব্যাখ্যা করেছি, সে অনুযায়ী দুটি হাদিসই নতুন নতুন ফায়দা দেয়। অর্থাৎ কুফর ও নামায তরক উভয় কারণেই শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের আদেশ বুঝে আসে। আর উসূলে ফিকহের মূলনীতি হলো, التأسيس أولى من التأكيد لأن الإفادة خير من الإعادة অর্থাৎ দুটি নসের এমন ব্যাখ্যা করা যে, সে দুটি একই অর্থে হয়ে যায় এবং একটি অপরটির তাকীদ

হয়, এরচেয়ে এটাই উত্তম যে, নসদুটির এমন ব্যাখা করা হবে যার দ্বারা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেয় এবং তা থেকে নতুন নতুন ফায়েদা পাওয়া যায়। (দেখুন, কাশফুল আসরার, ইমাম আব্দুল আযীয বুখারী, ৩/১৪৮ দারুল কুতুব; তাইসীরুত তাহরীর, আমীর বাদশা, পৃ: ৩৫৯ দারুল বায; আলকুল্লিয়্যাত, আবুল বাকা কাফাভী হানাফী, পৃ: ১০৬৫ মুয়াসসাসাতুল রিসালাহ, ১৪১৯ হি.; শরহুল কাওয়ামিদিল ফিকহিয়্যাহ, আহমদ যারকা, পৃ: ৩১৫ দারুল কলম, ১৪০৯ হি.; আলইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, ইমাম আবুল হাসান আমিদী, ৩/২৫-২৬, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪২৬ হি.; আলবাহরুল মুহিত, ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী, ১/১১৪ দারুল কুতুব, ১৪২১ হি.; ফাতহুল কাদীর, ৮/১৭৫ দারুল ফিকর)

৫. সবচেয়ে বড় কথা হলো, থানভী রহিমাহুল্লাহ হাদিসের এই অর্থ করেছেন, পূর্বে উল্লিখিত উবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণিত, ‘তবে যদি তোমরা স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও’ শীর্ষক হাদিসের কারণে, কেননা এ হাদিসের বাহ্যিক বিবরণ থেকে বুঝে আসে, কুফর ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা যায় না। কিন্তু খোদ থানভী রহিমাহুল্লাহই আলোচনার ধারাবাহিকতায় একটু পরে গিয়ে বলেছেন, ‘ইসলামের পরিপন্থী কানুন তৈরী করে মানুষকে গুনাহে বাধ্য

করা কুফরের হুকুমে, তাই কোন শাসক এরকম কানুন তৈরী করলে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে'। (এ বিষয়ে তার পূর্ণ ইবারত সহ বিস্তারিত আলোচনা আমরা দ্বিতীয় পর্বে করবো ইনশাআল্লাহ) এবং টিকায় এ মতের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে তিনি বলেন,

چنانچہ فقہاء کا اذان وختان کے (جو کہ سنن میں سے ہیں) ترک عام کو استخفاف دین یا موجب محاربه تارکین فرمانا -صریح دلیل ہے ایسے عموم کے بحکم کفر ہونے کی ملاحظہ ہو در مختار و رد المحتار باب الأذان ومسائل شتی -حکم الختان - 12- أشرف علي

'আযান ও খতনা সুল্লতে মুয়াক্কাদা হওয়া সত্ত্বেও ফুকাহায়ে কেলাম আযান ও খতনা ব্যাপকভাবে ছেড়ে দেওয়াকে দ্বীনকে গুরুত্বহীন মনে করার দলিল গণ্য করেছেন এবং যারা এবিষয়গুলো ব্যাপকভাবে ছেড়ে দিবে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলেছেন, এটা প্রমাণ করে যে কানুনের মাধ্যমে মানুষকে ব্যাপকভাবে গুনাহে বাধ্য করা কুফরীর হুকুমে'। -ইমদাদুল ফাতাওয়া, -৫/১৩০

তো প্রশ্ন হলো, যদি ব্যাপকভাবে আযান বা খতনা ছেড়ে দেওয়া এবং ইসলামের পরিপন্থী আইন করে মানুষকে গুনাহে বাধ্য করা কুফরীর হুকুমে হতে পারে, তাহলে নামায

তরক করা কেন কুফরীর হুকুমে হতে পারবে না, অথচ পূর্বে উদ্ধৃত আলেমদের বক্তব্যে আমরা দেখেছি, আল্লামা হুইবী, মোল্লা আনী কারী ও ইবনে আল্লান রহিমাল্লাহু সবাঈ নামায তরককে الكفر অর্থাৎ কুফরের মত বা কুফরের হুকুমে ধরেছেন।

আল্লামা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমও থানভী রহিমাল্লাহু মতটিই গ্রহণ করেছেন, তিনি এর স্বপক্ষে কাযী ইয়াযের নিম্মোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন,

معنى: «ما صلوا» ما داموا على الإسلام، فالصلاة إشارة إلى ذلك. (تكملة فتح الملهم: 3/293 ط. دار إحياء التراث العربي)

রাসূলের বাণী, ‘যতদিন তারা নামায পড়ে’ অর্থাৎ যতদিন তারা ইসলামের উপর বাকী থাকে, নামাযের কথা বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে’। -তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/২৯৩

কিন্তু পূর্বে আমরা দেখেছি, কাযী ইয়ায রহিমাল্লাহু বলেছেন,

لا خلاف بين المسلمين أنه لا تتعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تتعقد لها وتستديم على التأويل، فإذا طرأ مثل هذا على وال من

كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية
وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب
6/246 :إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. (إكمال المعلم
(ط. دار الوفاء: 1419 هـ)

উলামায়ে কেলাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। অতএব শাসক যদি এজাতীয় কাজগুলোর কোন একটি, যেমন, কুফর, শরীয়া পরিবর্তন অথবা বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। -ইকমালুল মু'লিম, ৬/২৪৬

তো এখানে আমরা দেখছি, কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ সুম্পষ্টরূপে বলছেন, শাসকের থেকে কুফর, নামায তরক, শরিয়ত পরিবর্তন ইত্যাদি কাজ প্রকাশ পেলে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর ইলমের সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, কোন বক্তব্য অপর (চাই তা কুরআন-সুন্নাহর বাণী হোক বা কোন আলেমের বক্তব্য) বক্তব্যের বিরোধী হয়ে গেলে যেটা মুহকাম বা দ্ব্যর্থহীন সেটা অনুযায়ী আমল করা হবে, আর যে বক্তব্য মুতাশাবিহ বা দ্ব্যর্থবোধক সেটাকে মুহকামের সাথে মিলিয়ে এমনভাবে ব্যাখা করা হবে যেন দুই বক্তব্যের মাঝে কোন বিরোধ না থাকে, পরিভাষায় একে **رَدُّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ** (মুতাশাবিহকে মুহকামের দিকে ফিরানো, মুহকাম অনুযায়ী ব্যাখা করা) বলা হয়। -(দেখুন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত, ৭; আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস, ২/২৮২ দারু ইহইয়াউত তুরাস ১৪০৫ হি.; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৩৬৫ দারু তাইয়েবাহ, ১৪১৯ হি.; বাদায়েউস সানায়ে' ১/২১ দারুল কুতুব, ১৪০৬ হি.; বাহরুল রায়েক, ১/২৫৯ দারুল কিতাবিল ইসলামী; ই'লামুল মুওয়াক্কিলীন, ৪/৫৮ দারু ইবনুল জাওয়ী, ১৪২৩ হি.; ফাতহুল বারী, ইবনে রজব, ৭/২৪০ মাকতাবাতুল গুরাবা আলআছারিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.) সুতরাং এই উসুলের আলোকে আমরা বলতে পারি, কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ যে নামায

তরক করাকে কুফরের দিকে ইশারা করেছেন এর অর্থ হলো, নামায তরক করা কুফরের আলামত, তাই যেভাবে কুফরী পাওয়া গেলে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তেমনিভাবে নামায তরক করলেও শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আর যদি কাযী ইয়ায রহিমাল্লামাহর বক্তব্যের যে অর্থ তাকী উসমানী সাহেব বুঝেছেন, সেটাই সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলেও এটা নামায পরিত্যাগকারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ না করার তেমন কোন দলিল হতে পারে না। কেননা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী ও ইবনে রাসলান রহিমাল্লামাহ হাদিসের এই অর্থকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং হাদিসের স্বাভাবিক অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য আবারও একটু দেখে নিই,

ظاهره: ما حافظوا على «وقوله: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامها وداموا على ذلك وأظهروه، وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الإسلام، ... والأول المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 4/66 ط. (. أظهر دار ابن كثير: 1417 هـ وشرح سنن أبي داود لابن رسلان: 18/377 ط: دار الفلاح: 1437 هـ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যতদিন তারা

নামায কায়েম করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না,
এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যতদিন তারা নির্ধারিত
নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত প্রকাশ্যে নামায
আদায় করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না।
কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের অর্থ হলো, যতদিন তারা
ইসলামের উপর থাকবেন ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ
করা যাবে না। ... কিন্তু হাদিসের প্রথম অর্থটিই বেশি স্পষ্ট।
-আলমুফহিম, ৪/৬৬; শরহ সুনানি আবী দাউদ, ১৮/৩৭৭

চলবে ইনশাআল্লাহ

প্রথম পর্বের লিংক

[https://dawahilallah.com/showthread....76;-
&%232535;\)](https://dawahilallah.com/showthread....76;-&%232535;)

১৫.যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা
ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব- ৩ শরিয়তের বিধান পরিবর্তন)

পর্ব -৩ বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ

গত দুই পর্বে আমরা নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধের বিধান বর্ণনা করেছি, এই পর্বে ইনশাআল্লাহ মুসলিম নামধারী যে শাসকরা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান নিয়ে আলোচনা করবো, এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে বিধান পরিবর্তন শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে দলিল-প্রমাণ পেশ করা, বাকী এ কাজটা কুফর কি না? আলেমগণ এমন শাসককে কাফের বলেছেন কি না? এ ব্যাপারে আমরা এ প্রবন্ধে কোন আলোচনা করবো না।

ফতোয়া: যে শাসক কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ শাসন করে না। বরং কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে -তাকে কাফের-মুরতাদ বলা হোক না হোক সর্বাবস্থায়- তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ফরয।

ফতোয়ার দলিল:-

এক. কুরআন থেকে বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ ফরয হওয়ার দলিল-

প্রথম দলিল :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ. (سورة البقرة: 278)

হে ইমানদারগণ, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং (লোকদের নিকট এখনোও) তোমাদের যে সুদ পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও। -সূরা বাকারা, ২৬৮

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন,

هذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك الربا. فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالنتار وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة، والزكاة، أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو عن الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على

أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون عليها
- 544 : 28 : مجموع الفتاوى) ... حتى يكون الدين كله لله
(هـ- 1416 : ط. مجمع فهد لطباعة المصحف الشريف 545)

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তায়েফবাসীর ব্যাপারে, যখন তারা ইসলামগ্রহণ করে এবং নামায-রোযাও পালন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা সুদভিত্তিক লেনদেন ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দেন যে, যদি তারা সুদী মুয়ামালা পরিত্যাগ না করে তাহলে তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। অথচ **সুদকে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষে নিষিদ্ধ করেছেন এবং সুদ অন্যের সন্তুষ্টক্রমেই নেওয়া হয়। সুতরাং যদি সুদগ্রহণকারীরাই আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ ওয়াজিব হয়ে যায়, তাহলে তাতারদের মত যারা শরিয়তের অনেক বা অধিকাংশ বিধান পালনে অস্বীকৃতি জানায় তাদের কথা তো বলাইবাহুল্য।**

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন সংঘবদ্ধ দল ইসলামের প্রকাশ্য ও স্বতস্বিদ্ধ কোন বিধান ত্যাগ করে, তবে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যিক। এমনকি যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্যও দেয় কিন্তু

নামায, রোযা, হজ, যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকে কিংবা নিজেদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রয়োগে অস্বীকৃতি জানায়, মদ, জুয়া, সুদ, যিনা, মাহরামকে বিবাহ করা, অন্যায়ভাবে কারো জান-মাল নষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়কে নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ওদের উপর জিযিয়া আরোপ করা থেকে বিরত থাকে তবে এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যতক্ষণ না শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। -মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৪৪-৫৪৫

দ্বিতীয় দলিল:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. (سورة التوبة : 29)

তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না, এবং সত্যদিনের অনুসরণ করে না, যতক্ষণ না তারা লাপ্তিত-অপদস্থ হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে। -সুরা তাওবা, আয়াত, ২৯

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. বলেন,

اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب إذا كانوا موصوفين بصفات
أربعة ، وجبت مقاتلتهم إلى أن يسلموا، أو إلى أن يعطوا
الجزية.

..... فالصفة الأولى : أنهم لا يؤمنون بالله

..... والصفة الثانية : من صفاتهم أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر
الصفة الثالثة : من صفاتهم قوله تعالى : {وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ} وفيه وجهان : الأول : أنهم لا يحرمون ما حرم
في القرآن وسنة الرسول . والثاني : قال أبو روق : لا يعملون
بما في التوراة والإنجيل، بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من
قبل أنفسهم

الصفة الرابعة : قوله : {وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الكتاب}

تفسير الرازي: 16 : 25 ط. دار إحياء التراث العربي: 1420)
(ه).

আল্লাহ তায়ালা আয়াতে বলছেন, আহলে কিতাবরা চারটা
অপরাধে অপরাধী হওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করা
ওয়াজিব হয়ে গেছে,

এক. তারা আল্লাহ তায়ালায় প্রতি ঈমান রাখে না

দুই. শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে না

তিন. “আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম
সাব্যস্ত করে না”। এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে,
ক. তারা কুরআন-সুন্নাহয় নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম
সাব্যস্ত করে না।
খ. তারা তাওরাত-ইনজীলের বিধান অনুযায়ী আমল করে
না। বরং তারা সেগুলোকে বিকৃত করেছে এবং নিজেরা
মনগড়া অনেক বিধান প্রণয়ন করেছে।
চার. তারা সত্যদিনের অনুসরণ করে না।

দেখুন, আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধের
একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করছেন যে, তারা আল্লাহ
তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না এবং
নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন আইন তৈরী করে। তাহলে যদি
আল্লাহ তায়ালার বিধান না মেনে নিজেদের মনগড়া কিছু
বিধানের অনুসরণের কারণে কাফের-মুশরিকদের সাথেই
যুদ্ধ করা আবশ্যিক হয় তাহলে যে মুসলিম শাসকবর্গ আল্লাহ
তায়ালার বিধানকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে কাফের-
মুশরিকদের তৈরী বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করছে
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি ওয়াজিব হবে না?

সাইয়েদ কুতুব রহ. এই বাস্তবতাটি অতি সুন্দর ভাষায়
ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি বলেন,

هذه الآية - والآيات التالية لها في السياق - كانت تمهيداً لغزوة تبوك؛ ومواجهة الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب . . وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة؛ وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع . . القائمة . فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب؛ إنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء ومثلهم . الأقسام وواقعهم؛ وأنها مبررات ودوافع للأمر بقتالهم . في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه كعقيدتهم وواقعهم .

: وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة

أولاً : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

ثانياً : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله

ثالثاً : أنهم لا يدينون دين الحق

ثم بين في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين

الحق(في ظلال القرآن: تفسير سورة التوبة، 3 : 1631 ط. :

(دار الشروق: 1412 هـ

এই আয়াত ও এর পরবর্তী আয়াতসমূহ তাবুক যুদ্ধ এবং রোম ও তাদের দোসর আরব খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধের ভূমিকাস্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছে। এ থেকে বুঝে আসে, যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে আয়াতে উল্লিখিত অবস্থাগুলো ওদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ...

বিষয়গুলো এজন্য উল্লেখ করা হয়নি যে, এগুলো ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত। বরং এগুলো হলো তাদের বাস্তব আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির বিবরণ এবং তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়ার কারণ বা অনুঘটক। সুতরাং যাদের আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি এরূপ হবে তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।-ফি যিলালিল কুরআন, ৩/১৬৩১

অন্যত্র তিনি বলেন,

إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض، وتحقيق منهجه في حياة الناس؛ ومطاردة الشياطين ومناهج الشياطين؛ وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس، والناس عبيد الله وحده لا يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هو اه ورأيه

إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض، بإخراج الناس ... من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين، فلم يُسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول: خرجنا ندافع عن وطننا المههدد! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا! إنحن المسلمين! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر، وحذيفة بن محصن، والمغيرة بن شعبة جميعاً لرستم - قائد جيش الفرس في القادسية -، وهو يسألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية قبل المعركة: ما الذي جاء بكم؟ فيكون الجواب: الله ابتعثنا لنخرج

من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه. ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر . (في ظلال القرآن: تفسير سورة الأنفال، 3 : 1440 ؛ وراجع لهذه الحكاية: تاريخ الطبري: 517 - 524 ط. دار التراث: 1387 هـ ؛ البداية والنهاية: 7 : 46 ط. دار إحياء التراث العربي: 1408، ؛ وحياة الصحابة للشيخ العلامة يوسف الكاندهلوي: 1 : 257 هـ -) 259 ط. مؤسسة الرسالة الأولى، 1420 هـ

এবিষয়গুলো হলো পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান বাস্তবায়ন, শয়তানের অনুসারী ও তাদের রচিত জীবনবিধান দূরীকরণ এবং যারা মানুষকে গোলাম বানায় তাদের ক্ষমতা ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার কারণ ও প্রেরণা। কেননা মানুষ শুধু আল্লাহর গোলাম, সুতরাং কেউ মানুষকে নিজের মনগড়া বিধিবিধান দ্বারা শাসন করতে পারবে না।

এ বিষয়গুলো হলো মানুষকে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দাসত্বের দিকে নিয়ে আসার মাধ্যমে তাকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেওয়ার যৌক্তিকতা ও কারণ। এ যৌক্তিকতা ও প্রেরণা মুসলিম

যোদ্ধাদের মনে গেথে গিয়েছিল, তাই তাদের কাউকে যখন প্রশ্ন করা হতো, তোমরা কেন যুদ্ধ করতো এসেছো? তখন তাদের কেউ এ উত্তর দিতো না যে, আমরা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জিহাদে বের হয়েছি, কিংবা আমাদের উপর রোম-পারস্যের আগ্রাসন রোধ করার জন্য ময়দানে নেমেছি, অথবা রাজ্যবিস্তার ও গণীমত লাভ করার জন্য যুদ্ধে এসেছি।

বরং তাদের সবাই একবাক্যে সেই উত্তরই দিতো যা রিবয়ী বিন আমের, হুযাইফা বিন মিহসন এবং মুগীরা বিন শোবা রাযি, পারস্যের সেনাপতি রুস্তমকে দিয়েছিলেন, সে লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত একজন একজন করে এই তিন মুসলিম দূতকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কেন এসেছো? জবাবে তারা সকলেই বলে, আমরা আল্লাহর আদেশে বের হয়েছি- মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে বের করে আনার জন্য এবং সকল ধর্মের যুলুম-অত্যাচারমূলক বিধান থেকে মুক্ত করে ইসলামের আদল ও ইনসাফভিত্তিক বিধি-বিধানের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য। আল্লাহ তার দ্বীন দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা এ দ্বীনগ্রহণ করবে আমরা তাদের ভূমি তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবো, আর যারা (ইসলামগ্রহণ বা জিযিয়া দিয়ে ইসলামের বশ্যতা)

গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো, যতক্ষণ না আমরা বিজয় লাভ করি কিংবা শাহাদাত লাভ করতে জান্নাতে পৌঁছতে পারি।- ফি যিলালিল কুরআন, ৩/১৪০ রিবয়ী বিন আমের ও তার সঙ্গী সাহাবীদের ঘটনাটি জানার জন্য দেখুন, তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, ইমাম তবারী, ৫১৭-৫২৪ আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ইবনে কাসীর, ৭/৪৬ হায়াতুস সাহাবা, ইউসুফ কান্ফলবী, ১/২৫৭

সুন্নাহ থেকে দলিল:

প্রথম দলিল:

سمعتها: عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين، قال تقول: ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً كثيراً، ثم سمعته يقول: «إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت - أسود، يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا». رواه مسلم: (1298)

إن أمر عليكم عبد مجدع - قال: أراها قالت - : وفي رواية أسود يُقِيمُ فيكم كتابَ الله فاسمعوا وأطيعوا. أخرجه أبو عوانه (، 35537100) في صحيحه

وفي رواية: «يأخذكم بكتاب الله». أخرجه أبو عوانه في صحيحه أيضاً (7097)

وفي رواية: يا أيها الناس، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل.

والترمذي في جامعه (16649): أخرجه أحمد في مسنده (1706)، وقال الترمذي: (هذا حديثٌ حسن صحيح). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: (إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن يحيى بن حصين وأمه- يعني جدته أم الحصين- لم يخرج لهما سوى (مسلم)

وفي رواية: «ما أقام لكم دين الله». أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: (2391) وقال محققه: (إسناده صحيح رجاله ثقات كلهم).

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي (يقودكم بكتاب الله) أي: يأمركم بدين الله ويحكم به. (لمعات التنقيح: 6/449 ط. دار النوادر، 1435 هـ

وقال الشيخ المباركفوري: قوله: (ما أقام لكم كتاب الله) أي حكمه المشتمل على حكم الرسول. (تحفة الأحوذى: 5 : 297 ط. دار الكتب العلمية)

ইয়াহইয়া বিন হাসীন বলেন, আমি আমার দাদী থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জ্ব বলতে শুনেছি, যদি কোনো নাক-ঠোঁট কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়, যে তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী পরিচালনা করে, তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করবে। -সহিহ মুসলিম,

১২৯৮

মুসনাদে আহমদ ও জামে' তিরমিযির বর্ণণায় এভাবে এসেছে, “তোমরা তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর বিধান কায়েম করবে।” - জামে তিরমিযি, ১৭০৬ ; মুসনাদে আহমদ, ১৬৬৪৯

মুসনাদে ইসহাকের বর্ণণায় এভাবে এসেছে, “তোমরা তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের জন্য দীন প্রতিষ্ঠা করবে”। - মুসনাদে ইসহাক, ২৩৯১

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৫৪৪ হি.) উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

قوله: "عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله" أى بالإسلام وحكم كتاب الله، وإن جار. (إكمال المعلم: 6 : 265 ط. دار الوفاء: 1419)

“তোমাদেরকে আন্নাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, অর্থাৎ ইসলাম ও কোরআন-সুন্নাহর বিধান দ্বারা পরিচালনা করে, যদিও সে যুলুম করে” (তথাপি তোমরা তার আনুগত্য করো)। - ইকমালুল মু'লিম, ৬/২৬৫

দ্বিতীয় দলিল:

عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر، لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على لأقاتلن من فرق بين الصلاة: الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر، رضي الله عنه: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق». صحيح البخاري: (20): (2443) صحيح مسلم

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর যখন আবু বকর খলীফা নিয়োজিত হন এবং আরবরা ব্যাপকভাবে মুরতাদ হয়ে যায় তখন উমর রাযি. বলেন, আপনি কিভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন অথচ (তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেও কালেমা তো পড়েছে আর) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা কালেমা পড়ে, সুতরাং যে কালেমা পড়বে সে তার জানমাল আমার থেকে নিরাপদ করে নিল, তবে সে ইসলামের কোন হক বিনষ্ট করলে ভিন্ন কথা। আর তার হিসাব তো আল্লাহ তায়ালাই নিবেন। তখন আবু বকর রাযি.

বললেন, যারা নামায-রোযার মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবোই, কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ যদি তারা আমাকে একটি রশিও না দেয় যা তারা রাসুলের নিকট যাকাত হিসেবে প্রেরণ করতো তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। উমর রাযি. বলেন, (আবু বকরের কথা শুনে) আমি বুঝতে পারি আল্লাহ তায়ালা আবু বকরের অন্তরকে যুদ্ধের জন্য খুলে দিয়েছেন, সুতরাং তাঁর মতই সঠিক। -সহিহ বুখারী, ২৪৪৩ সহিহ মুসলিম, ২০

ইমাম নববী রহ. বলেন,

وفيه وجوب قتال ما نعى الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كان أو كثيرا لقوله رضى الله عنه: «لو منعوني عقالا أو عناقا». (شرح النووي على مسلم: 1 : 212 (بط. دار إحياء التراث العربي: 1392 هـ

এ হাদিস প্রমাণ করে, যারা নামায পড়তে বা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, তেমনিভাবে যারা ইসলামের আবশ্যকীয় বিধানগুলো পালনে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরও একই হুকুম। চাই তা কম হোক বা বেশি, কেননা আবু বকর রাযি. বলেছেন, যদি তারা আমাকে একটা রশি বা একটা বকরীর বাচ্চাও (যাকাত হিসেবে) দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের সাথে আমি

যুদ্ধ করবো। -শরহ মুসলিম, ১/২১২

ইমাম বুখারী এই হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب قتل من أبى قبول الفرائض

যারা ফারায়েয কবুল করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের হত্যা করার বিধান। -সহিহ বুখারী, ১২/২৭৫ দারুল মা'রেফা।

এর ব্যাখায় হাফেয ইবনে হযার বলেন,

أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع، قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده، قال ابن بطال: مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك. (فتح الباري: 12 (ط. دار الفكر 276 - 275).

অর্থাৎ যারা ইসলামের আবশ্যকীয় বিধানাবলী পালনে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের হত্যার বৈধতা। মুহাম্মাব বলেন, যদি কেউ ইসলামের কোন ফরয বিধান, যেমন যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে যদি সে যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টিকে স্বীকার করে তাহলে তার থেকে জোরপূর্বক

যাকাত উসুল করা হবে, তবে তাকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায় তবে তার সাথে যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ইমাম মালেক মুয়াত্তাগ্রন্থে বলেন, “যদি কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং মুসলমানরা তার থেকে যাকাত নিতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে তাদের উপর ওয়াজিব হবে তার সাথে যুদ্ধ করা”, ইবনে বাত্তাল রহ বলেন, ইমাম মালেকের উদ্দেশ্য হলো, যদি যাকাত ফরয হওয়াকে স্বীকার করে যাকাত দিতে অস্বীকার জানায় তাহলে যুদ্ধ করতে হবে, আর এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। -ফাতহুল বারী, ১২/২৭৫-২৭৬

তৃতীয় দলিল:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، قَالَ: «قَالَ سَلْمَانُ لِرَيْدِ بْنِ صُوحَانَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا افْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ؟ قَالَ: إِذَا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ، قَالَ: (30926) نَعَمْ الرَّؤْيِيُّ: إِذَا أَنْتَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

তারেক বিন শিহাব বলেন, সালমান রাযিআল্লাহু আনহু যায়েদ বিন সুহানকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন (আহলে) কুরআন ও শাসকের মধ্যে যুদ্ধ হবে তখন তুমি কি করবে, যায়েদ বললেন, আমি (আহলে) কুরআনের পক্ষ অবলম্বন করবো, সালমান রাযিআল্লাহু আনহু (খুশি হয়ে) বললেন,

তাহলে তুমি কতই না উত্তম যাবে। -মুসান্নাফে ইবনে
আবী শাইবা, ৩০৯২৬

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «يُقْتَبَلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ قَالَ: فَيَطُّ السُّلْطَانُ عَلَى
أَخْرَجَهُ. «صِمَاحُ الْقُرْآنِ فَلَأْيَا بِلَأْيٍ، وَلَايَا بِلَأْيٍ، مَا تَنْفَلْتَنَ مِنْهُ
(132): ابن أبي شيبة: (30927) وأبو عبيد في فضائل القرآن

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার টিকায় শায়েখ আওয়ামা
বলেন,

والمعنى - والله أعلم سيكون اقتتال بين أهل القرآن والسلطان،
وتكون الغلبة لأهل القرآن، وتكون شدة بشدة، قل ما تنفلتن
وتنجون منها. (تعليق الشيخ عوامه على المصنف : 15/562
ط. دار القبلة)

উল্লিখিত আছরটির অর্থ হলো, অচিরেই কুরআনের অনুসারী
ও বাদশার অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হবে, এবং কুরআনের
অনুসারীদেরই বিজয় হবে। তবে হবে যুদ্ধ ঘোরতর,
তোমাদের কম লোকই তার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে। -
মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ১৫/৫৬২

তিন. বিধান পরিবর্তনকারী শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার
ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য:-

১. হানাফী মাযহাবের শীর্ষাস্থনীয় ফকিহ ইমাম তহাবী রহ.
বলেন,

سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي أبا عبد
الله يذكر: أن العمري العابد، وهو عبد الله بن عبد العزيز بن
عبد الله بن عمر بن الخطاب، جاء إلى مالك، فقال له: يا أبا
عبد الله، قد نرى هذه الأحكام التي قد بُدِّلت، أفيسعنا مع ذلك
التخلف عن مجاهدة من بدَّلها، فقال له مالك: إن كان معك اثنا
عشر ألفاً مثلك لم يسعك التخلف عن ذلك، وإن لم يكن معك هذا
العدد من أمثالك فأنت في سعة من التخلف عن ذلك، وكان هذا
الجواب من مالك أحسن جواب، وإنما أخذهُ عندنا، والله أعلم من
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي
رويناه: "ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً من قلة"، وبالله التوفيق.
(شرح مشكل الآثار: 2/51)

আমি মুহাম্মদ বিন ঈসাকে বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ বিন
আব্দুল আযীয আলউমরী ইমাম মালেকের কাছে এসে
জিজ্ঞেস করেন, এই যে আমরা শরীয়তের বিধি-বিধান
পরিবর্তন হতে দেখছি, এখন কি আমাদের জন্য বিধান
পরিবর্তনকারীদের সাথে জিহাদ না করে বসে থাকা বৈধ
হবে? ইমাম মালেক বললেন, যদি তোমার সাথে তোমার
মত বারোহাজার লোক থাকে তাহলে তোমার জন্য যুদ্ধ হতে
বিরত থাকা বৈধ হবে না। আর যদি না থাকে তাহলে

তোমার জন্য জিহাদ না করার অবকাশ রয়েছে। (ইমাম তহাবী বলেন) ইমাম মালেক যে উত্তর দিয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর, আমাদের ধারণা অনুযায়ী ইমাম মালেক রহ. এই উত্তর দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, “বারোহাজারের বাহিনী সংখ্যাসম্পন্নতার কারণে কখনো পরাজয় বরণ করবে না” এর ভিত্তিতে।

বর্তমান যুগের জিহাদবিরোধী আলেমদের নিকট এসে কেউ উক্ত প্রশ্ন করলে সে নির্দিধায় বলে দিবে, “বিধান পরিবর্তনের কারণে শাসক কাফের হয়ে যায় না। আর কুফর ব্যতীত শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। তাছাড়া জিহাদের জন্য ইমাম প্রয়োজন। আমাদের তো ইমাম নেই।” অথচ ইমাম মালেক এসব কিছুই বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, “তোমার সাথে তোমার মতো বারোহাজার লোকের বাহিনী থাকলে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।” এ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে, শক্তি ও সক্ষমতা থাকলে বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। হাঁ, ইমাম মালেক এটাও বলেছেন, বারোহাজার লোক না থাকলে তখন (শক্তি না থাকার কারণে) যুদ্ধ ওয়াজিব হবে না। তবে বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা বৈধ নয়, যারা করবে তারা খারাজী, এমন কিছুই ইমাম মালেক বলেননি।

পাঠক আরো লক্ষ্য করুন, এখানে ইমাম তহাবী বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে ইমাম মালেকের ফতোয়াকে সমর্থন করেছেন, তার ফতোয়ার প্রশংসা করেছেন, অথচ ইমাম তহাবী যালেম শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধকে বৈধ মনে করেন না, তিনি তার রচিত আকীদার কিতাবে সুস্পষ্টরূপে বলেছেন,

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاية أمورنا. وإن جاروا
(العقيدة الطحاوية: ص: 24 ط. دار ابن حزم: 1416)

‘আমরা শাসক ও গভর্নরদের বিপক্ষে বিদ্রোহকে বৈধ মনে করে না। যদিও তারা যুলুম করে। -আলআকীদাতুত তহাবীয়াহ, পৃ: ২৪

এ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, যালেম শাসকের হুকুম আর বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের হুকুম এক নয়, যালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে যে সব হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে তা বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

পাঠক যদি এর সাথে ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ

কাশ্মিরীর এই কর্মনীতি যুক্ত করেন যে, “তিনি কোন মাসয়ালায় ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য না পেলে ইমাম আবু ইউসুফের মত গ্রহণ করতেন, আবু ইউসুফের মত না পেলে ইমাম মুহাম্মদের মত, তাও না পেলে ইমাম তহাবীর মত তালাশ করতেন। যদি তিনি ইমাম তহাবীর মত পেয়ে যেতেন তাহলে সেটাই গ্রহণ করতেন” তাহলে আশা করি বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের সাথে যুদ্ধই যে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত তা বুঝতে আপনার খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা দেখবো যে, ইমাম আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী ও মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. এর মতও এমনই এবং ইমাম আবু হানিফার মতও এমন হওয়াই যুক্তিযুক্ত (কাশ্মিরী রহিমাল্লাহুর মূলনীতিটি জানার জন্য দেখুন- তারাজিমু সিত্তাতিম মিনাল ফুকাহা, শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, পৃ: ৩৯ প্রকাশনা: মাকতাবুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়াহ, ১৪১৭ হি.

২. কাযী ইয়ায রহ বলেন,

لا خلاف بين المسلمين أنه لا تتعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تتعقد لها وتستديم على التأويل، فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب

6/246: إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. (إكمال المعلم
(ط. دار الوفاء: 1419 هـ)

উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহূরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। অতএব শাসক যদি এজাতীয় কাজগুলোর কোন একটি, যেমন, কুফর, শরীয়া পরিবর্তন অথবা বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। -ইকমালুল মু'লিম, ৬/২৪৬

৩. ইমাম নববী রহিমাছল্লাহু (মৃ: ৬৭৬ হি.) কাযী ইয়ায

রহিমাল্লাহর উপরোল্লিখিত বক্তব্য সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন,

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تتعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. وقال بعض البصريين: تتعقد له وتستخدم له، لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. (شرح مسلم للنووي: 12/229 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392)

কাযী ইয়ায রহিমাল্লাহ বলেন, উলামায়ে কেৰাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। কাযী ইয়ায বলেন, শাসকের উপর

যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়া পরিবর্তন করে অথবা বিদ'আত করে, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা। -শরহ মুসলিম, ১২/২২৯

ইমাম নববী অন্যত্র বলেন,

لا يجوز الخروجُ على الخُلفاءِ بمجردِ الظلمِ أو الفسقِ ما لم يُغَيَّرُوا شيئاً من قِواعدِ الإسلامِ. (شرح مسلم للنووي: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، 12 : 244 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392)

শুধুমাত্র জুলুম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে পরিবর্তন করে। শরহে মুসলিম, ১২/২৬৬

এ পর্বে এখানেই শেষ করছি, আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আরো কয়েকজন আলেমের বক্তব্য, পাশাপাশি এ মাসয়ালায় আল্লামা তাকী উসমানীর বক্তব্যের পর্যালোচনাও পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পর্বের লিংক -

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232535%3B>)

দ্বিতীয় পর্বের লিংক

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232536%3B>)

১৬.যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ
ওয়াজিব (পর্ব-৪ তাকী উসমানী দা. বা. এর মত
পর্যালোচনা)

গতপর্বে বিধান পরিবর্তনকারী শাসক -তাকে মুরতাদ বলা
হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তার- বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফরয
হওয়ার স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ ও কয়েকজন আলেমের
বক্তব্য পেশ করেছি। এ পর্বে আরো কয়েকজন আলেমের
উদ্ধৃতির পাশাপাশি এ মাসয়ালাতে আন্লামা তাকী উসমানী
দা. বা. এর বক্তব্যের পর্যালোচনা পেশ করছি ইনশাআল্লাহ-

৪. মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস কুরতুবী মালেকী রহিমাল্লাহ (মৃ: ৬৫৬ হি.) বলেন,

وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود وَمَنَعَ من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ. (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 4/39 ط. دار ابن كثير: 1497)

এমনিভাবে শাসক যদি নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতো দ্বীনের মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো পালনে বাধা দেয়, তদ্রূপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ না করে, তখনও তার অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। -আলমুফহিম, ৪/৩৯

৫. মুফাসসির আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী রহিমাল্লাহ (মৃ: ৬৭১ হি.) বলেন,

الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، وقال آخرون:

لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها
 أو شي من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: (وَألا
 ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه
 برهان وفي حديث عوف بن مالك: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة)
 الحديث. أخرجهما مسلم. (الجامع لأحكام القرآن: 1/271 ط. دار
 الكتب المصرية: 1384)

ইমাম ফাসেক হয়ে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে সে
 অপসারিত হয়ে যাবে, এবং প্রকাশ্য ও সুবিদিত ফিসকের
 কারণে তাকে অপসারণ করতে হবে, আর অন্যান্য
 আলেমদের মতে ইমাম অপসারিত হবে না, যতক্ষণ না সে
 কুফরে লিপ্ত হয় কিংবা নামায় পরিত্যাগ করে, অথবা
 নামায়ের দিকে আস্থান করা ছেড়ে দেয়, **কিংবা শরিয়তের
 কোন বিধান কায়েম করা ছেড়ে দেয়।** কেননা উবাদা বিন
 সামেত রাযি. বলেছেন, “রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে এ মর্মে বাইয়াত নিয়েছেন যে,
 আমরা আমিরদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ করবো না,
 (রাসূল বলেছেন) তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে
 পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ
 থেকে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে।” আউফ বিন মালিকের সূত্রে

বর্ণিত হয়েছে, “যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করবে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না।”

ইমাম মুসলিম উল্লিখিত হাদিসদ্বয় বর্ণনা করেছেন। -

তাফসীরে কুরতুবী, ১/২৭১

৬. ইমাম মুহাম্মদ আলআব্বী রহ . (মৃ: ৮২৭ হি.) বলেন,

لا خلاف أنه يجب على المسلمين عزل الإمام إذا فسق بكفر،
وكذلك إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها أو غير شيئا من
أصول الشرع.(إكمال إكمال المعلم: 5 : 180 ط. دار الكتب
العلمية)

এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে কোন মতভেদ নেই যে, ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে, তেমনিভাবে নামায পরিত্যাগ করলে, নামাযের দিকে আহ্বান করা পরিত্যাগ করলে কিংবা **শরিয়তের কোন মৌলিক বিধান পরিবর্তন করলে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।** -ইকমালাু ইকমালিল মু'লিম, ৫/১৮০

৭. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.)

বলেন,

فأیما طائفةٍ امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو
الصیام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدِّماء، والأموال،
والخمر، والزنا، والمیسیر، أو عن نکاح ذوات المحارم، أو عن
التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير
ذلك من واجبات الدين ومُحرّماتِهِ التي لا عُذرَ لأحد في
جعودها وتركها التي يُكفّرُ الجاحدُ لوجوبها، فإن الطائفةَ
المتتبعَةَ تُقاتلُ عليها وإن كانت مُؤرّةً بها، وهذا مما لا أعلمُ فيه
(28/503: خلافا بين العلماء. (مجموع الفتاوى

“মুসলমানদের কোনো দল যদি কোন ফরজ নামাজ, রোযা, হজ্জ ‘আদায় করতে’ অস্বীকৃতি জানায় বা অন্যায় রক্তপাত, অন্যের মাল ভক্ষণ, মদ, জিনা, জুয়া, মাহরামকে বিয়ে করা ইত্যাদি বিষয়কে নিজেদের উপর নিষিদ্ধ করতে সম্মত না হয় কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া ধার্য করাকে নিজেদের উপর আবশ্যিক করে না নেয়, তেমনভাবে দ্বীনের এমন ফরজ বা হারাম বিষয়াবলী মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে যেগুলোকে অস্বীকার করা বা ছাড়ার ব্যাপারে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হয় না এবং যার অস্বীকারকারী কাফের বলে বিবেচিত হয়,

তবে এইসব আমল পালনে অসম্মত দলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদিও তারা এ ইবাদাতগুলোকে স্বীকার করে। এ ব্যাপারে আমার জানামতে উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।” -মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫০৩

৮. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (মৃত্যু ১৩৫২ হি.) বলেন,

نعم إذا رأوا منه كفرا بواحا لا يبقى فيه تأويل، فحينئذ يجب عليهم أن يخلعوا ربقتهم عن أعناقهم، فإن حق الله أوكد. ثم هل من طاقة البشر أن لا يختار إلا حقا في جميع الأبواب، فإذا تعذر أخذ الحق في جميع الأبواب - وإن أمكن ذهننا - لا بد أن يحد له حد، وهو الإغماض في الفروع، فإذا وصل الأمر إلى الأصول حرم السكوت، ووجب الخلع. وهو معنى قوله: «وإن أمر عليكم عبد حبشي». فافهم. (فيض الباري: 6 : 459 ط. دار (الكتب العلمية: 1426 هـ).

“হাঁ, প্রজারা যদি শাসক থেকে কোন সুস্পষ্ট কুফর দেখতে পায়, যাতে তাবীলের কোন অবকাশ থাকে না, তখন তাদের উপর আবশ্যিক হবে তার থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া। কেননা মানুষের জন্য (মানবীয় দুর্বলতাবশত)

سبক্ষেترے ہک ابللمن کرا سبلل ہل نا، تلہ شاسکےر
 آوت-آاٹ بلآوتلر ککترے تار بلرلککے بلرلرہ کرا لالے
 نا، کبللکک یآن شاسکےر بلآوتل ہلسلامےر مائلک بلشےےر
 ساآے ساآرلرلک ہلے (اآرآاآ سے ہلسلامےر مائلک کون
 بلآان لرلرلرآن کراے) تلآن آول آاکا ہارام ہلے، ابلل
 تاکے ابلسارآ کرا فرآ ہلے۔ اآلہل راسول سالللالل
 آلالہلہل ولسالللالمےر بالل، “لآل و تلومالےر اولر کون
 ہالشلکے آاملر نللول کرا ہل لے تلومالےر آاللہر
 کلاآل انولاللل لرلآالنا کراے تلہلے تلومرا تار
 آانولآ کراے” اےر ابللنلرلہل اآرآ۔” -فرلؤل بالرل،
 ٦/٨٤٤

١. ہاکلمول املآت ہلرآت مالولانا آالرافل آالل آانل
 رلہ ہلمالےر بللککے بلرلرہےر بلآانکے ساآ لراکراے
 بلآلکک کراےآن، سلولم لراکراے تلنل بللن،

فسق ملآل بللنل آلم آآلار کراے او اس کا ملل ملآلوملن
 کا دلن هو، بللنل آن کو معاصل لر ملآلر کراے، ملآر لہ
 فسق آسل ولآ تلک هے آلکھ اس کا منشاء اسآآاف لآ
 اسآآال دلن اور اسآآان کفر لآ معصلآ نھ هو، بلکھ اآاظآ
 ملآرھ هو، آلسے آکآر کسل آاص ولآل اآآضاء سے کسل
 آاص شآص لر آکراھ کراے ملل السا هل هوآا هے، ورنھ

یہ بھی حقیقتاً کفر ہے، اور قسم ثالث میں داخل ہے، یا فی الحال تو منشاء إکراه کا استخفاف وغیرہ نہ ہو، لیکن اکراه بشكل قانون ایسے طور ر ہو کہ ایک مدت تک اس پر عمل ہونے سے فی المآل ظن غالب ہو کہ طبائع میں استخفاف پیدا ہو جاوے گا، تو ایسا إکراه بھی بناء بر أصل مقدمة الشيء بحکم ذلك الشيء بحکم کفر ہوگا۔ (أمداد الفتاوى:

5/130 ط. مكتبة دار العلوم کرائشي: 1431 هـ

“যদি শাসক ফিসকে মুতাআদী করে, অর্থাৎ এমন জুলুম-ফিসক করে যার সম্পর্ক প্রজাদের দ্বীনের সাথে হয় এবং তাদেরকে গুনাহতে বাধ্য করে, কিন্তু এই ফিসকের কারণ দ্বীনের প্রতি ঘৃণা কিংবা কুফরকে পছন্দ করার কারণে না হয়, অন্যথায় তা হাকিকি কুফর হবে, কিংবা এখন তো গুনাহতে বাধ্য করার কারণ শরিয়তের বিধানকে তাচ্ছিল্য করা না হয় কিন্তু কানুন তৈরী করে ব্যাপকভাবে গুনাহতে বাধ্য করা হয়, যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত চালু থাকার কারণে পরিশেষে শরিয়তের বিধানের প্রতি ঘৃণা তাচ্ছিল্য এসে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়, তো এভাবে কানুন তৈরী করে মানুষকে গুনাহতে বাধ্য করাও কুফরের হুকুমে।” -ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৫/১৩০

এরপর এর টীকায় তিনি বলেন,

چنانچہ فقہاء کا اذان وختان کے (جو کہ سنن میں سے ہیں)
ترك عام کو استخفاف دین یا موجب محاربه تارکین فرمانا
-صریح دلیل ہے ایسے عموم کے بحکم کفر ہونے کی
ملاحظہ ہو در مختار و رد المحتار باب الأذان ومسائل شتی
-حکم الختان - 12- أشرف علی

“এজন্যই আযান ও খতনা সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়া সত্ত্বেও
ফুকাহায়ে কেলাম আযান ও খতনা ব্যাপকভাবে ছেড়ে
দেওয়াকে দ্বীনকে গুরুত্বহীন মনে করার দলিল গণ্য
করেছেন এবং যারা এবিষয়গুলো ব্যাপকভাবে ছেড়ে দিবে
তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলেছেন, এটা প্রমাণ
করে যে কানুনের মাধ্যমে মানুষকে ব্যাপকভাবে গুনাহে বাধ্য
করা কুফরীর হুকুমে।” -ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৫/১৩০

এখানে থানভী রহ. কথা থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে, যে
শাসক শরিয়ত পরিপন্থী কানুন তৈরী করে এবং দীর্ঘদীন
পর্যন্ত তা জারী রাখে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করা যাবে, এবং

তিনি এ মাসয়ালাকে ব্যাপকভাবে আযান বা খতনা ছেড়ে দেওয়ার উপর কিয়াস করেছেন, মুফতি তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্হম থানভী রহ. এর বক্তব্যের যে আরবী ভাষান্তর করেছেন তা থেকে এ বিষয়টি আরো সহজে বুঝে আসে, তার ইবারত দেখুন,

والقسم السابع: أن يرتكب فسقا متعديا إلى دين الناس، فيكرههم على المعاصي، وحكمه حكم الإكراه المبسوط في محله، ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكما، وذلك بأن يصرَّ على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية، إما تفضيلا لها على شرع الله، وذلك كفر صريح، أو توائيا وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله، بما يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلاف الشريعة يحدث استخفافا لها في القلوب، فإن مثل هذا التوائي والتكاسل، وإن لم يكن كفرا صريحا بحيث يُكفَّرُ به مرتكبه، ولكنه في حكم الكفر، بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حلَّ قتالهم، لأنه من أعلام الدين، وفي (1): تركه استخفاف ظاهر به، راجع باب الأذان من رد المحتار : 384).

وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث، وهو الكفر البواح، فيجوز الخروج على التفصيل الذي سبق في حكمه. (تكملة فتح الملهم: (3/275) ط. دار إحياء التراث العربي

সপ্তম প্রকার, ইমাম এমন কোন ফিসক করে যার সম্পর্ক

মানুষের দ্বীনের সাথে, যেমন তাদেরকে গুনাহতে বাধ্য করে, তো এর হুকুম হলো “গুনাহে বাধ্য করার হুকুম” যা ফিকহের কিতাবে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই বাধ্যকরণ কখনো হাকিকি কুফর হয় আবার কখনো কুফরের হুকুমে হয়, যেমন শরিয়ত পরিপন্থী আইন-কানুন প্রয়োগ করার উপর জমে থাকা, যদি এটা এসব আইন-কানুনকে শরিয়তের চেয়ে উত্তম মনে করার কারণে হয় তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট কুফর, আর যদি অলসতাবশত দীর্ঘদিন যাবত শরিয়ত পরিপন্থী বিধান জারী করে রাখে, যার কারণে শরিয়তের প্রতি অন্তরে তুচ্ছতা এসে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়, তাহলে যদিও এটা এমন সুস্পষ্ট কুফরী নয় যার কারণে এমন শাসককে কাফের বলা হবে, কিন্তু এটাও কুফরের হুকুমে, এর দলিল হলো, ফুকাহায়ে কেরামের এই বক্তব্য- “যদি কোন দেশের লোকেরা আযান ছেড়ে দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হয়ে যাবে, কেননা আযান শরিয়তের শিয়ার বা নিদর্শন, তাই আযান ছেড়ে দেওয়া শরিয়তের প্রতি প্রকাশ্য তুচ্ছতার দলিল। দেখুন, রদ্দুল মুহতার, ১/৩৮৪ (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/২৭৫)

(মুফতি তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্হমের মত
পর্যালোচনা)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মুফতি তাকী উসমানী তো বর্তমান শাসকদের বিপক্ষে বিদ্রোহকে সমর্থন করেন না? তাহলে তার মতের বিপক্ষে তার বক্তব্য দিয়ে দলিল পেশ করা কি ঠিক হবে?

তো এর উত্তর হলো, প্রথমত, আমরা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্হমের বক্তব্যকে স্বতন্ত্র কোন দলিল হিসেবে উল্লেখ করিনি, বরং থানভী রহিমাহুল্লাহুর ভাষা প্রাচীন উর্দু হওয়ার কারণে কিছুটা জটিল, পক্ষান্তরে আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব তার বক্তব্যকে অত্যন্ত সহজ উসলুবে আরবীতে ভাষান্তর করেছেন, তাই থানভী রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য সহজে বুঝানোর জন্যই আল্লামা তাকী উসমানীর উদ্ধৃতি এসেছে।

এখন রইল, তিনি যে বর্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সমর্থন করেন না, তো এর উত্তর হলো, আল্লামা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্হম থানভী রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্যকে এ মাসয়ালার সবচেয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ বলে উল্লেখ করেছেন,

আর খানভী রহিমাল্লাহর বক্তব্যের যে আরবী ভাষান্তর তিনি করেছেন তা থেকে বর্তমান শাসকবর্গ, যারা যুগের পর যুগ শরিয়তের খেলাফ আইন-কানুন দ্বারা দেশ পরিচালনা করছে তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট, আর কোন আলেমের বক্তব্য যদি তার কাজের বিপরীত হয় তাহলে তার দ্বায়ভার আমাদের উপর বর্তাবে না, বরং এর দ্বায়ভার সম্পূর্ণরূপে তার উপরই বর্তাবে।

আসলে তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্হম যখন দেখলেন যে, অনেক আলেমদের মতানুযায়ী, বিশেষকরে আমাদের ইমাম আবু হানিফা রহিমাল্লাহর মাযহাব এবং উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আকাবিরদের একজন হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী খানভী রহিমাল্লাহর ফতোয়া থেকে বর্তমান শাসকদের বিপক্ষে বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট, অথচ তার নিজস্ব রুচি হলো শাসকদের বিপক্ষে বিদ্রোহ না করা, বরং তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে সংশোধন করা, তাই তিনি আবু হানিফা, খানভী সবার মত দ্বারা জগাখিচুড়ি তৈরী করে একটা হাস্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, প্রথমে তো তিনি এই ধারণা খন্ডন করলেন যে,

শাসক মুরতাদ হওয়া ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই তার বিপক্ষে
বিদ্রোহ করা যাবে না, এক্ষেত্রে তিনি বললেন,

وربما يفهم بعض الناس: أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج
عليه في حال من الأحوال ما دام متسمياً باسم الإسلام، وليس
الأمر على هذا الإطلاق، ولا سيما على مذهب الإمام أبي حنيفة
رحمه الله تعالى، يقول الإمام الجصاص في أحكام القرآن تحت
قوله تعالى: [لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ]. «وكان مذهبه مشهوراً
في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا
حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف، يعني قتال الظلمة، فلم
نحتمله وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله
المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه،
وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن». (تكملة
فتح الملهم: 3 : 271 ط. دار إحياء التراث العربي)

“কারো কারো ধারণা হলো, যালেম শাসকের বিপক্ষে কোন
অবস্থাতেই যুদ্ধ করা যাবে না, যতক্ষণ না সে মুসলিম
নামধারণ করে থাকে, কিন্তু বিষয়টা বাস্তবে এমন নয়,
বিশেষকরে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী, ইমাম
জাসসাস রহ. বলেন, “যালেম শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার
ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মাযহাব প্রসিদ্ধ, এ কারণেই

ইমাম আওয়ামী বলেন, আমরা আবু হানিফার সবকিছুই সহ্য করেছি, কিন্তু যখন সে আমাদের উপর তরবারী নিয়ে সওয়ার হলো –অর্থাৎ যালেম শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধের ফতোয়া দিলো – তখন আমরা আর সবর করিনি।

যায়েদ বিন আলীর বিদ্রোহের ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা তো অনেক প্রসিদ্ধ, তিনি তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন এবং তার সহায়তা করা ও তার সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মানুষকে গোপনে ফতোয়া দেন।

তেমনিভাবে হাসান রাযিআল্লাহু আনহুর দুই নাতি মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের বিদ্রোহের ঘটনায় তার সম্পৃক্ততাও সকলের জানা। -তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/২৭১

এরপর আল্লামা তাকি উসমানী দা.বা. যায়েদ বিন আলী এবং মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের বিদ্রোহের ঘটনায় আবু হানিফা রহিমাল্লাহুর সমর্থনের বিস্তারিত বিবরণ নির্ভরযোগ্য সূত্রের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন এবং ইয়াযীদের বিপক্ষে হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহুর বিদ্রোহ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিপক্ষে বড় বড় আলেম ও যাহেদদের বিদ্রোহের দিকেও ইঙ্গিত করেন, কিন্তু এরপর তিনি যে স্ববিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তা যেমনিভাবে হাস্যকর তেমনিভাবে উম্মাহর এই

ক্রান্তিলগ্নে তাদের এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য খুবই

হতাশাজনক, তিনি বলেন,

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا الله عنه - بعد مراجعة
-النصوص الشرعية وكلام الفقهاء والمحدثين في هذا الباب،
والله أعلم - أن فسق الإمام على قسمين: الأول: ما يكون
مقتصرًا على نفسه، فهذا لا يُبيح الخروج عليه، وعليه يُحمل
قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج
عليه، والثاني: ما كان متعديًا، وذلك بترويج مظاهر الكفر
وإقامة شعائره، وتحكيم قوانينه، واستخفاف أحكام الدين
والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه،
وتفضيل شرع غير الله عليه، فهذا ما يلحق بالكفر البواح،
ط 272 : ويجوز حينئذ الخروج بشروطه. (تكملة فتح الملهم

“শরিয়তের দলিল-প্রমাণ এবং মুহাদ্দিস ও ফকিহদের বক্তব্য

থেকে এ মাসয়ালায় আমার যা বুঝে আসছে তা হলো,

ইমামের ফিসক দুই প্রকার:

ক. যা তার নিজের উপর সীমাবদ্ধ থাকে, তো এধরণের

ফিসকের কারণে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। যে

আলেমগণ বলেছেন, যালেম ও ফাসেকের শাসকের বিপক্ষে

বিদ্রোহ করা যাবে না, তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটাই।

খ. ফিসকে মুতাআদী বা এমন ফিসক যা শাসকের নিজের উপর সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং প্রজাদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে, যেমন শাসক যদি কুফরের শায়ারের ও নিদর্শনাবলীর রেওয়াজ দেয়, প্রচার-প্রসার করে, কুফরী আইন-কানুন জারী করে, শরিয়তের বিধি-বিধানকে নগন্য মনে করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও শরিয়তের বিধান জারী করা হতে বিরত থাকে, শরিয়তের বিধানকে ঘৃণা করা এবং শরিয়তের বিধানের তুলনায় কুফরী আইন-কানুনকে উত্তম মনে করার কারণে, তাহলে তা সুস্পষ্ট কুফরীর হুকুমে হবে, এবং তখন শর্তসাপেক্ষে বিদ্রোহ বৈধ হবে।” -তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/২৭২

পাঠকের কাছে আবেদন প্রথমে আপনি তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্হমের পুরো বক্তব্য গভীর মনোযোগে পড়ুন, এরপর এ পর্যালোচনাগুলো দেখুন,

১. তিনি বলছেন, “যদি শাসক শরিয়তের বিধানকে ঘৃণা করে এবং শরিয়তের বিধানের তুলনায় কুফরী আইন-

কানুনকে উত্তম মনে করে কুফরী কানুন জারী করে তাহলে এটা সুস্পষ্ট কুফরের হুকুমে হবে”। অর্থাৎ তখনও এটা কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর হবে না বরং কুফরে বাওয়াহর হুকুমে হবে, অথচ এ ব্যাপারে পুরো উম্মত একমত যে, শরিয়তের কোন বিধান ঘৃণা করা, তাচ্ছিল্য করা কিংবা অন্য কোন বিধানকে শরিয়তের বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করা সুস্পষ্ট কুফরী, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. سورة محمد: 8-9

“আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে ধ্বংস। আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করেছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।” -সুরা মুহাম্মদ, ৮-৯

আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

أي ذلك الإضلال والإتعاس، لأنهم "كرهوا ما أنزل الله" من
 الكتب والشرائع. "فأحبط أعمالهم" أي ما لهم من صور

الخيرات، كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرب، ولا
(تفسير القرطبي: 16/233). يقبل الله العمل إلا من مؤمن

“এই ধ্বংস ও আমলের ব্যর্থতার কারণ হলো তারা আল্লাহ
তায়ালার নাযিলকৃত কিতাব ও বিধানাবলীকে অপছন্দ
করেছে। তাই আল্লাহ তায়ালার তাদের নেক আমল, যেমন
মসজিদ আবাদ করা, (মুসাফিরদের) মেহমানদারী করা,
ইত্যাদিকে বরবাদ করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালার
মুমিন ব্যতীত অন্য কারো আমল কবুল করেন না।” -

তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/২৩৩

হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম
রহ. বলেন,

وبتحسين أمر الكفار اتفاقا حتى قالوا لو قال ترك الكلام عند
أكل الطعام من المجوسي حسن أو ترك المضاجعة حالة الحيض
منهم حسن فهو كافر. (البحر الرائق: 5/133 ط. دار الكتاب
الإسلامي).

কাফেরদের কোন বিষয়কে ভাল মনে করলে সর্বসম্মতিক্রমে

কাফের হয়ে যাবে, এমনকি যদি কেউ বলে, অগ্নীপূজারীরা যে খাবারের সময় কথা না বলা, কিংবা হয়েছে অবস্থায় স্ত্রীর সাথে একশয্যায় না শোয়া এগুলো ভালোই তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। -বাহরুর রায়েক, ৫/১৩৩

ফিকহে হান্বলীর বরণ্য ব্যক্তিত্ব আল্লামা মুসা বিন আহমদ হাজাভী রহ. (মৃ: ১০৫৪ হি.) বলেন,

من أشرك بالله ... أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله أو كتبه
أو رسله قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا
وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم
ويسألهم إجماعا انتهى أو سجد لصنم أو شمس أو قمر أو أتى
كفر. الإقناع: (4) ... بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين
285). ط. داره عبد العزيز 1423

যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, আল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালা নাযিলকৃত কিতাবসমূহ কিংবা তাঁর প্রেরিত রাসূলগণকে নিয়ে উপহাস করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বা তার আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করে তবে সে
সর্বসম্মতিক্রমে ... কাফের হয়ে যাবে। -আলইকনা' 8/২৮৫

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة،
وأفعال تصدر من المنتهكين لدالاتها على الاستخفاف بالدين
بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه فعلها
النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو استقباحها كمن استقبح من
البحر الرائق: 5/129 رد المحتار:) . آخر إحياء شارب

4/222)

ইমানের জন্য (আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাদের বিধানের
প্রতি) সম্মানবোধ থাকা আবশ্যিক, এজন্যই হানাফী ফকিহগণ
এমন অনেক কথা ও কাজের কারণে মানুষকে তাকফীর
করেছেন যা থেকে শরিয়তের বিধানের প্রতি তাচ্ছিল্য বুঝে
আসে, কিংবা রাসূলের কোন সুন্নতের প্রতি ঘৃণা বুঝে
আসে, যেমন কেউ মোচ খুব ছোট করে ছাটলো এটা দেখে
কেউ ঘৃণা প্রকাশ করলো, (তো তার এই কাজের দ্বারা
যেহেতু মোচ ছোট করে ছাটা যা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত তার

প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায় তাই এটা কুফরী হবে।) -আলবাহরর
রায়েক, ৫/১২৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৪/২২২

২. তিনি প্রথমে এ মূলনীতি দাড়াই করছেন যে, ফিসকে
লায়েম বা যে ফিসক শুধু শাসকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে
সীমাবদ্ধ, প্রজাদের উপরে তার প্রভাব পড়ে না, সে
ফিসকের কারণে বিদ্রোহ বৈধ নয়, পক্ষান্তরে যে ফিসক
শাসকের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রজাদের
উপরও তার মন্দ প্রভাব পড়ে সে ফিসকের কারণে বিদ্রোহ
বৈধ। বরং এখানে তিনি তাদের মত খন্ডন করছেন যারা
মনে করে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কুফর ব্যতীত অন্য কোন
সূরতেই শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ যায়েজ নেই।

এরপর ফিসকে মুতাআদীর উদাহরণ টানতে গিয়ে তিনি
বলছেন, “যেমন, কুফরের রীতিনীতির প্রসার করা, কুফরের
শায়ায়ের বা নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠা করা, কুফরী কানুন জারী
করা, দ্বীনের বিধিবিধানকে তুচ্ছজ্ঞান করা, শক্তি থাকা
সত্ত্বেও শরীয়ী বিধান চালু করা হতে বিরত থাকা”। এ পর্যন্ত
তো অনেকটা ঠিকই ছিল, কিন্তু এরপর হযরত এক আশ্চর্য
কথা বলেন, তিনি এ বিষয়গুলো ফিসকে মুতাআদী হওয়ার
জন্য দুটি শর্ত আরোপ করলেন,

ক. শাসকরা এবিষয়গুলো পছন্দ করা এবং ইসলামের বিধানকে ঘৃণা করা।

খ. ইসলামী আইন জারী করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকা।

পাঠক একটু ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করুন, শাসক কুফরী আইনকে উত্তম মনে করা বা ইসলামী বিধি-বিধানকে ঘৃণা করা- ফিসক মুতাআদী হওয়া না হওয়ার সাথে এর কি সম্পর্ক? তাহলে কি শায়েখে মুহতারাম বলতে চাচ্ছেন যে, শাসক ইসলামী আইন উত্তম মনে করা সত্ত্বেও যদি কুফরী আইন জারী করে তখনও তা ফিসকে লায়েম হবে, ফিসকে মুতাআদী হবে না অর্থাৎ জনগণের উপর এর কোন মন্দ প্রভাব পড়বে না।

এমনিভাবে “ইসলামী আইন জারী করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকা” এখানেও প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি শাসক কাফেরদের চাপে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভয়ে অক্ষমতার দরুন - যেমনটা হযরত বুঝাতে চাচ্ছেন - ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে না পারলে সেটাও ফিসকে লায়েম হবে, জনগণের দ্বীনের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে

না। সুবহানাঙ্লাহ, এ কেমন আশ্চর্য ফিকহ!!

৩. শায়খে মুহতারাম ফিসকে মুতাআদী পাওয়া গেলে শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধকে জায়েয বলছেন এবং সাহাবীদের যমানা থেকে আবু হানিফার যমানা পর্যন্ত যারাই বিদ্রোহ করেছেন তাদের সবাই শাসকের ফিসকে মুতাআদীর কারণেই বিদ্রোহ করেছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। তথাপিও তিনি বর্তমান শাসকদের বিপক্ষে বিদ্রোহকে সমর্থন করেছেন না। তাহলে কি তিনি বলবেন যে, তখনকার শাসক ইয়াযীদ, মারওয়ান, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান, হাজ্জাজ, মানসুর যাদের বিপক্ষে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিদ্রোহ করেছেন তারা তো ফিসকে মুতাআদীতে লিপ্ত ছিল, তাদের দ্বারা জনসাধারণের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, কিন্তু বর্তমান শাসকরা ফিসকে মুতাআদীতে লিপ্ত নয়, তারা জুলুম-অত্যাচার করলেও ওদের দ্বারা জনগণের দ্বীনী ক্ষতি হচ্ছে না!!!

অথচ কে না জানে বাস্তবতা এর পুরো একশো আশি ডিগ্রি উল্টো। কেননা যাদের বিপক্ষে সাহাবী-তাবেয়ীগণ বিদ্রোহ করেছেন তাদের ফিসকই ছিল ফিসকে লাযেম। তাদের

যমানায় রাষ্ট্রে ইসলামী আইন জারী ছিল। আলেমগণ কাযী হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী না হলে শাসকরা এতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতো না। বেশি থেকে বেশি তারা কিছু জুলুম-অত্যাচার করতো আর বাইতুল মালের সম্পদ নিজেরা যথেষ্ট ভোগ করতো।

আর বর্তমান শাসকরা তো কুফর, নাস্তিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা সবকিছু মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে, বরং আইন তৈরী করে এগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছে, নিজেদের পেটুয়া বাহিনী দ্বারা এর কর্মীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। রাসুলকে গালি প্রদানকারী নাস্তিকরা তো এদের অধীনে সুরক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রতিবাদকারী নিরীহ মুসলিমদের বুকে গুলি চলছে। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ইসকন বাংলাদেশ দখল করার জন্য সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু কেউ এর বিপক্ষে মুখ করলে তাকে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও উস্কানীদাতা বলে জেলে পুরা হচ্ছে। “সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্ম প্রচারের অধিকার রয়েছে” এই অজুহাতে হেফাযতে ইসলামের এনজিও বিরোধী দাবী প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। কিন্তু মুসলিমরা হিন্দুদের মাঝে ইসলামপ্রচার করতে গেলে হিন্দুরা প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে মুসলিমদের

ধর্মপ্রচারে বাধা দিচ্ছে। এনজিওরা সাহায্যের নামে
 রোহিঙ্গাদের ধর্মান্তরিত করার কাজ নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছে,
 অথচ মুসলিমদের জন্য নিজেদের রোহিঙ্গা ভাইদের সরাসরি
 সাহায্য করার অনুমতি নেই। সাহায্য করতে চাইলে সরকারী
 ফান্ডে অর্থ প্রদান করতে হবে। এমনকি একবার ভীতি
 প্রদর্শনের জন্য রোহিঙ্গাদের সাহায্য করতে যাওয়া আলেম ও
 অন্যান্যদের একরাতের জন্য গ্রেফতারও করা হয়। এসব
 কিছুর পরও কি বলা হবে বর্তমান শাসকরা ইয়ায়ীদ,
 মারওয়ান, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ও মানসুরের চেয়ে
 ভালো? তাদের ফিসক শুধু নিজেদের উপরই সীমাবদ্ধ?

শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর তথাকথিত সব দারুল
 ইসলামেরই আজ এই দশা, পাকিস্তানের শাসকদের ব্যাপারে
 তো খোদ মুফতি তাকী উসমানী দা. বা. এর পরম শ্রদ্ধেয়
 ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইউসুফ বিনুরী রহ. আজ থেকে ত্রিশ বছর
 আগেই বলে গেছেন,

جس بنيادي مقصد کا بار بار اعلان کیا جاتا تھا کہ اسلامی
 حکومت قائم ہوگی اور یوں عالمِ اسلامی سے اتحاد ہوگا، اس
 کے لئے حکمرانوں اور حکومتوں نے کیا کیا؟ اپنے وعدوں
 کو کہاں تک پورا کیا؟ یہاں کون کون سے اسلامی قوانین

جاري هوء؟ كفر والحاد كو كهاس تك ختم كيا گيا؟ اسلامي معاشرت قائم كرنے كے لے كيا كيا اقدام كے گے؟ ان تمام سوالات كا جواب حسرت ناك نفي مں ملے گ، آخر امتحان كا يه عبوري دور تها، كون سي نعمت تهي جو حق تعالى نے نه دي هو؟ كون سي فرصت تهي جو نه ملي هو؟ ليكن واحسرتاه! كه ربع صدي سے زياده عرصه گزر گيا، مگر پاكستان كے مقصد وجود كا خواب شرمندہ تعبير نه هو، كون سا وعده پورا كيا گيا؟ كون سي اسلامي عدالت قائم هوئي؟ زاني اور شرابي كو كون سي سزادي گئي؟ بد اخلاقي كا كيا انسداد كيا گيا؟ ظلم، عدوان، رشوت ستاني، كنبه پروري، بے حيائي وعرياني، سودخوري وبدمعاشي كو ختم كرنے كے لے كون سا قدم اٹھايا گيا؟ بلكه اس كے برعكس يه هو كه سودخوري، شراب نوشي، بد اخلاقي اور بے حيائي كي نه صرف حوصله افزائي كي گئي، بلكه سرڪاري ذرائع سے اس كي نشر واشاعت ميں كوئي كسر باقي نهيں اٹھا ركهي گئي، "بينات" كے صفحات ميں ان دردناك مجلة بينات، العدد :) - داستانوں كو باربار دهرايا گيا هے

(جمادی الأخرى 1437 ص 17

“پاكستان پرتيষ্ঠار يه مूल लक्ष्य-उद्देश्य बारबार घोषणा कराहतो ये, ইসলামी हकुमत कायम हवे आर एभावेई ইসলামी विश्वर साथे पاكستانेर एक्य हवे, ए लक्ष्य पूरणे सरकार ओ शासकश्रेणी कि काज करेहे? निजेदर

কৃত ওয়াদা কতটুকু পূর্ণ করেছে, এদেশে ইসলামের কোন কোন বিধান বাস্তবায়ন হয়েছে? কুফর ও ধর্মদ্রোহীতা কোন স্তর পর্যন্ত মেটানো হয়েছে? ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত দুঃখজনক ও নেতিবাচক ভাবেই মিলবে। এটা তো পরীক্ষাস্বরূপ অন্তর্বর্তীকাল ছিল। আল্লাহ তায়ালা কোন নেয়ামত দিতে বাকী রেখেছিলেন? কোন সুযোগটা হাতছাড়া রয়ে গিয়েছিল?

হায় আফসোস! পচিশ বছরেরও বেশি পেরিয়ে গেল, কিন্তু পাকিস্তান গঠনের স্বপ্ন পূরণ হল না। কোন ওয়াদাটা রক্ষা করা হয়েছে? কোথায় ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? ব্যাভিচারী ও মদ্যপকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে? অনৈতিকতা ও বদআখলাকী কতটুকু মেটানো হয়েছে? জুলুম-অত্যাচার, ঘুষখোরী-সুদখোরী, বেহায়াপনা-বেলেগ্নাপনা ও জাতিয়তাবাদ দমন করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? বরং এর বিপরীত সুদখোরী, মদপান, অনৈতিকতা ও বেহায়াপনার প্রতি শুধু উৎসাহিত করাই হয়নি, এরচেয়েও আগে বেড়ে সরকারী মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে এগুলোর প্রচার-প্রসার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে!!! -বাইয়িনাত, সংখ্যা:

জুমাদাল উখরা ১৪৩৭ পৃ: ১৭

আসলে এই শাসকরা তো কাফেরদেরই দালাল, কাফেররা আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য সরাসরি কাফের গভর্নর নিয়োগ করার চাইতে নামধারী মুসলিম শাসকদের দ্বারাই কার্যসিদ্ধি করা নিরাপদ মনে করছে। লর্ড ম্যাকলের সেই কুখ্যাত উক্তিটা কি মনে নেই “ভারতীয়দের জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থারে একমাত্র উদ্দেশ্য হল এমন এক যুব সম্প্রদায় সৃষ্টি করা, যারা রঙ ও বংশের দিক থেকে ভারতীয় হলেও মন ও মস্তিষ্কের দিক থেকে হবে সম্পূর্ণ বিলাতী।”-দেওবন্দ আন্দোলন, মাওলানা আবুল ফাতাহ ইয়াহইয়া, পৃ: ১৫১

যারা শুধু নামে মুসলমান হওয়ার কারণে বর্তমান শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে নিষেধ করছেন তারা নিজেদের অজান্তেই ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানাবলীর গায়ে কালিমা লেপন করছেন। তারা যেন বলতে চাচ্ছেন, কাফেররা কোন মুসলিম দেশ দখল করে নিলে তাদের নিয়োগকৃত গভর্নরের মাধ্যমে যে কাজগুলো করাতো, হুবহু সেই কাজগুলো একই মাত্রায় বরং তারচেয়েও বেশি মাত্রায় কোন নামধারী মুসলিম শাসকের মাধ্যমে করালেও তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে

না!!! তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে মহা প্রজ্ঞাবান আল্লাহ
তায়ালার নাযিলকৃত শরিয়তে কি কাফেরদের এ চালবাজী
ধরার মতো কোন পদ্ধতি নেই? ইসলামে কি তাহলে মূল
বিষয়ের পরিবর্তে শুধু নামের উপর ভিত্তি করেই বিধান ভিন্ন
হয়?

না, কক্ষনো নয়, আল্লাহ তায়ালার এই দালাল শাসকদের
কুফর ও ইরতেদাদ বুঝার জন্য অনেক অনেক দলিল
রেখেছেন। যা মুজাহিদ আলেমগণ বারবার প্রচার করেছেন।
এরপরও যদি কারো জন্য এদের কুফর ও ইরতেদাদ বুঝা
জটিল মনে হয় তবে তা বুঝার জন্য বাহ্যিক কিছু আলামতও
রেখেছেন, যার অন্যতম দুটি আলামত হলো নামায না পড়া
এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন না করা। কিন্তু বহু
আলেম এসব দলিলাদী উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া
দলিলবিহীন ফতোয়া দিয়ে ইসলামকে কলংকিত করছে,
ইসলাম ধ্বংসে সহায়তা করছে। আর এভাবেই তাদের মাঝে
রাসূলের ভবিষ্যৎদ্বানী বাস্তবায়িত হচ্ছে,

إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً، ولكن يقبض العلماء
فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رءوساً جهالاً، يفتونهم بغير
علم، فيضلون ويضلون صحيح البخاري : (100) صحيح مسلم

: (2673)

وقال ابن مسعود: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشد مما كان قبله، وما ذاك بكثرة الأمطار وقتها، ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يفتنون في الأمور برأيهم، فيئتمون الإسلام (ويهدمونه). (فتح الباري: 41/484 ت: شعيب الأرنؤوط)

“আল্লাহ তায়ালা মানুষের (অন্তর) হতে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন না, তবে আলেমদের মৃত্যু দান করবেন এবং তাদের সাথে সাথে তাদের ইলমকেও তুলে নিবেন। **তখন মানুষের মাঝে কিছু মূর্খ নেতা বাকী থাকবে, তারা ইলম ব্যতীত ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।**” -সহিহ বুখারী, ১০০ সহিহ মুসলিম, ২৬৭৩

ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, “তোমাদের অবস্থা দিনদিন মন্দ থেকে মন্দতর হতে থাকবে। তবে এটা বৃষ্টি কম-বেশী হওয়া (অর্থাৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা বা দৈন্যের) কারণে হবে না। বরং এর কারণ হবে, আলেমদের চলে যাওয়া। **অতপর এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা (দ্বীনি) বিষয়াদীতে নিজস্ব মত ও স্বভাব-রুচি অনুযায়ী ফতোয়া দিবে, ফলে**

তারা ইসলামকে ধ্বংস করে ফেলবে।” (ফাতহুল বারী,
৪১/৪৮৪ শুয়াইব আরনাউতের তাহকীককৃত নুসখা)

চলবে ইনশাআল্লাহ

প্রথম পর্বের লিংক

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232535%3B>)

দ্বিতীয় পর্বের লিংক

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232536%3B>)

তৃতীয় পর্বের লিংক

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232472%3B>)

১৭.যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ
ওয়াজিব (পর্ব-৫ শাসকের পাপাচার ও অত্যাচার সীমা
ছাড়িয়ে যাওয়া)

(বিগত পর্বসমূহে যে সকল কারণে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ
করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তার দুটি কারণ- নামায ত্যাগ করা
ও মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন করা- নিয়ে আমরা
বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এ পর্বে শাসকের বিপক্ষে
বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার তৃতীয় কারণ নিয়ে আলোচনা
করবো, ইনশাআল্লাহ।)

যে সকল কারণে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব
হয় তার একটি হলো, শাসকের পাপাচার ও অন্যায়-অবিচার
সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, যার কারণে মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া
উভয়টি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং যদিও জালেম
শাসকের বিপক্ষে মূল বিধান হলো, তার জুলুম অত্যাচার
সহ্য করে নেয়া- কিন্তু এ হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তা
সীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু যখন তার পাপাচার ও জুলুম-
অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তাকে বহাল রাখলে
লাভের চেয়ে ক্ষতি বহুগুণ বেশি হয়, তবে তাকে অপসারণ
করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আল্লামা শামী রহ. বলেন,

وفي المواقف وشرحه: إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب
يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين
وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها
وإعلائها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين. (رد
المحتار: 4/264)

“শাসককে অপসারণ করার মত কোন বৈধ কারণ পাওয়া
গেলে উম্মত শাসককে পদচ্যুত করতে পারবে। যেমন
শাসকের কাজের কারণে যদি উম্মতের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে
যায় কিংবা দ্বীনি বিষয়াদি উলট-পালট হয়ে যায়, তাহলে
তাকে অপসারণ করা যাবে। কেননা শাসককে নিয়োগই করা
হয়েছিল দ্বীনি বিষয়াদির দেখাশোনা করার জন্য। (সুতরাং
যদি তার দ্বারা দ্বীনের কোন কল্যাণ হওয়ার পরিবর্তে শুধু
ক্ষতিই হতে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমতায় রেখে কি লাভ?)
তবে যদি তাকে অপসারণ করতে গেলে যুদ্ধবিগ্রহ ও
ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে যেটা
মন্দের ভালো সেটা অবলম্বন করতে হবে। (অর্থাৎ তার দ্বারা
যে ক্ষতি হচ্ছে তা যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনা-ফাসাদের
ক্ষতির চেয়েও বেশি হয় তবে যুদ্ধ করেই তাকে অপসারণ
করবে। আর যদি তার কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে তাকে

অপসারণ করতে গেলে তার থেকেও বেশি ক্ষতির আশংকা
থাকে তবে তাকে অপসারণ করবে না।) –রদ্দুল মুহতার,
8/২৬৪

শাফেয়ী মাযহাবের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ইমামুল হারামাইন আবুল
মাআলী জুয়াইনী রহ (ম্: ৪৭৬ হি.) বলেন,

فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد،
وزال السداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة،
ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفا
ممن ظلمه، وتداعى الخلل والخطل إلى عظام الأمور، وتعطيل
الشعور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر
القول فيه على الفاهم – إن شاء الله عز وجل – وذلك أن
الإمامة إنما تعنى لنقيض هذه الحالة، فإذا أفضى الأمر إلى
خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة، فيجب استدراكه لا محالة
وترك الناس سدى، ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل
أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع من هو عون الظالمين،
وملاذ الغاشمين، وموئل الهاجمين، ومعتصم المارقين الناجمين،
وإذا دفع الخلق إلى ذلك، فقد اعتاصت المسالك، وأعضلت
المدارك، فليتند الناظر هنالك، وليعلم أن الأمر إذا استمر على
الخبال، والخبط والاختلال، كان ذلك لصفة في المتصدي
للإمرة، وتيك هي التي جرت منه هذه الفترة، ولا يرتضي هذه
الحالة من نفسه ذو حصافة في العقل، ودوام التهافت في القول
والفعل مشعر ببركاكة الدين في الأصل، أو باضطراب الجبلية،
وهو خبل، فإن أمكن استدراك ذلك، فالبدار البدار قبل أن تزول
الأمور عن مراتبها وتميل من مناصبها، وتميد خطة الإسلام

بمناكبها. (غياث الأمم في التياث الظلم ص: 107 ط. مكتبة إمام
(الحرمين: 1401)

“যদি শাসক সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে; তার জুলুম-
অত্যাচার ব্যাপক হয়ে যায়; যমিনে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে;
মানুষের হক বিনষ্ট হয়; হৃদয়-কিসাস পরিত্যক্ত হয়;
যালেমদের দুঃসাহস বেড়ে যায়; মাযলুম যালেম থেকে হক
উদ্ধার করার মত কাউকে না পায়; গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতেও
ক্রটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়; সীমান্ত অনিরাপদ হয়ে পড়ে; তখন
এই ভয়াবহ বিষয়ের প্রতিবিধান করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।
কেননা শাসককে নিয়োজিত করা হয় এর বিপরীত
উদ্দেশ্যে। সুতরাং যখন শাসক থেকে উদ্দেশ্যের বিপরীত
কার্যাবলী ঘটতে থাকে তখন তার প্রতিকার করা জরুরী।

জনগণকে শাসকবিহীন ভাবে ছেড়ে রাখা এমন শাসকের
অধীনে রাখার চেয়ে উত্তম যে যালেমদের সহায়ক,
অপরাধীদের আশ্রয়দাতা, দুর্বৃত্তদের রক্ষাকারী। যদি মানুষকে
এমন শাসকের অধীনে থাকতে বাধ্য করা হয়ে তবে তো
বিষয়টি খুবই জটিল আকার ধারণ করবে। সুতরাং যে এ
মাসয়লা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে সে যেন গভীরভাবে ভেবে
দেখে এবং জেনে রাখে যে, মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়ার
বিরামহীন অধঃপতন শাসকের খারাবীর কারণেই হয়ে

থাকে। তাই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। সুতরাং যদি এর প্রতিকার করা সম্ভব হয় তবে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয়া দরকার।” -গিয়াসুল উমাম, পৃ: ১০৭

উযীর ইয়ামানী রহ. (মৃত্যু: ৮৪০ হি.) বলেন,

الفصل الثاني: في بيان أنّ منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه، وعظمت المفسدة بولايته، مثل: يزيد بن معاوية، والحجاج بن يوسف، وأتته لم يقل أحدّ منهم ممّن يعتدّ به بإمامة من هذه حاله، وإن ظنّ ذلك من لم يبحث، لإيهاهم ظواهر عباراتهم في بعض الموضوع، فقد نصّوا على بيان (...مرادهم وخصّوا عموم ألقاظهم، فمّمّن ذكره الإمام الجويني ثم ذكر رحمه الله قول الجويني رحمه الله المارّ أنفا. (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، 2/381 ط. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع).

“যালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না’ এ বিধান এমন শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যার জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং তার শাসনের ক্ষতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। যেমন ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। উল্লেখযোগ্য কোন আলেম এমন শাসকের শাসনকে বৈধ বলেননি। যদিও তাদের বক্তব্যের

বাহ্যিক বিবরণ হতে কখনো কখনো এমন সংশয় সৃষ্টি হয়। কেননা তারা (অন্যত্র) নিজেদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যারা এ বিষয়টা উল্লেখ করেছেন তাদের একজন হলেন ইমাম জুয়াইনী ...।” এরপর তিনি ইমাম জুয়াইনী রহ. -র উপরোক্ত বক্তব্য নকল করেন। -আলরওযুল বাসেম, ২/৩৮১

আলী রাযি. বলেন,

عن ليث قال: قال علي بن أبي طالب: «لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر»، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: «إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم أماناً حتى يأتيه أجله». رواه الإمام البيهقي وروى ابن أبي شيبة (7102) رحمه الله في شعب الإيمان نحوه في «المصنف» (39086) بإسناد آخر، وقال الشيخ عوامة حفظه الله في تعليقه على المصنف: (إسناده حسن، إن كان (حبيب العبسي هو ابن سليم المترجم في التهذيبين).

“মানুষ শাসক ব্যতীত সুষ্ঠুরূপে জীবনযাপন করতে পারে না, চাই শাসক নেককার বা ফাসেক। লোকেরা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! নেককার শাসকের প্রয়োজনীয়তা তো

আমরা বুঝি, কিন্তু ফাসেক শাসক থাকার কি প্রয়োজন? আলী রাযি. বললেন, ফাসেক শাসকের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালা পথ-ঘাট নিরাপদ রাখেন, তার মাধ্যমে কাফেরদের সাথে জিহাদ জারী থাকে; কর-ট্যাক্স আদায় হয়; হুদুদ-কিসাস কায়েম হয়; (তার ব্যবস্থাপনায়) হজ হয় এবং মুমিন তার শাসনাধীনে মৃত্যু পর্যন্ত নিরাপদে ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকে।” -শুয়াবুল ইমান, ইমাম বাইহাকী রহ. হাদিস নং:- ৭১০২ ইবনে আবী শাইবা রহ. ভিন্ন সনদে কাছাকাছি অর্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ৩৯০৮৬।

হাসান বসরী রহ. বলেন,

وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون.
(جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله
2/117 ط. مؤسسة الرسالة)

“শাসকরা আমাদের পাঁচটি জিনিষের যিস্মাদারী পালন করে:- জুমা, জামাত, ইদ, সীমান্তরক্ষা ও হুদুদ-কিসাস কায়েম করা। আল্লাহর শপথ তাদের দ্বারাই দ্বীন ঠিক থাকে। যদিও তারা জুলুম-অত্যাচার করে, কিন্তু তাদের দ্বারা যে লাভ হয় তা তাদের ক্ষতির চেয়ে বেশি।”

এখানে লক্ষণীয়, আলী রাযি. ও হাসান বসরি রহ. জালেম শাসকের আনুগত্য করতে উৎসাহিত করছেন এবং তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করছেন এ কথা বলে যে, “তাদের দ্বারা শত্রুদের সাথে জিহাদ ও সীমান্ত রক্ষা হয়। চোর-ডাকাত নির্মূল হওয়ার কারণে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবনযাপন নিরাপদ হয়। মুমিন নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে। জালেম শাসকদের দ্বারাও হুদুদ কায়েমের মতো গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়াদি সম্পাদিত হয় এবং তাদের দ্বারা যা কল্যাণ সাধিত হয় তা তাদের ক্ষতির চেয়ে বেশী।” কিন্তু বর্তমান শাসকদের দ্বারা যেহেতু জিহাদ, সীমান্তরক্ষা-হুদুদ কায়েম ইত্যাদি কিছুই হচ্ছে না। বরং উল্টো তারা আইন করে হুদুদ কায়েম করা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের ছত্রছায়ায় থেকেই আজ চোর-ডাকাত-চাঁদাবাজ ও দলীয় ক্যাডাররা মানুষদের যিম্মী করে রেখেছে। শত্রুর সাথে জিহাদ ও সীমান্ত রক্ষা তো তাদের দ্বারা হচ্ছেই না, বরং উল্টো তারাই শত্রুর সাথে গলাগলি করে দেশকে ধীরে ধীরে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে। দুর্নীতি-লুটপাট ও অর্থপাচার করে দেশ ও জাতিকে ফতুর বানিয়ে দিচ্ছে। ওদের মাধ্যমে মুমিন নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করতে পারা তো দূরে থাক- বরং ওদের কারণেই আজ মুমিনের দুনিয়া-আখেরাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। যদি মেনে নিই ওদের

দ্বারা দুনিয়াবী কিছু কল্যাণ হচ্ছে, তবুও ওদের দ্বারা যে অকল্যাণ হচ্ছে (বিশেষ করে মানুষের দ্বীনি বরবাদি যা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কল্যাণ-অকল্যাণ হতে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ) তা ওদের দ্বারা হওয়া কল্যাণের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। তাই –বর্তমান শাসকদের ফাসেক বলা হোক বা মুরতাদ- সর্বাবস্থায় ওদের বিপক্ষে যুদ্ধ করাওয়াজিব হবে।

দেখুন, উলামায়ে কেলাম মোল্লা উমরের নেতৃত্বে তালেবানদের জিহাদকে সমর্থন করেছেন। অথচ তালেবানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। বরং তালেবান প্রতিষ্ঠাই হয়েছে রাশিয়া আফগান ছেড়ে চলে যাওয়ার পর। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী আফগান কমান্ডাররা যখন আফগানিস্তানে যুলুমের রাজ্য কায়েম করে, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন মোল্লা উমর এই কমান্ডারদের বিপক্ষে জিহাদ শুরু করেন। অথচ তখন আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দীন রব্বানী ছিল। যদিও তার ক্ষমতা দুর্বল ছিল। (মোল্লা উমরের আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও তালিবান, মাওলানা উবাইদুল্লাহ নদভী, পৃ: ১৯-৩৭)

করে। ফলে দেশে কোন নিরাপত্তা ছিলো না, পুরো দেশে কোন কেন্দ্রীয় সরকারও গঠিত হয়নি, ইসলামী আইনও বাস্তবায়িত হয়নি।

তালেবানরা আফগান জিহাদ নিষ্ফল হতে দেখে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য (জিহাদি) আন্দোলন শুরু করে। যেসব এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে তাতে ইসলামী শাসন চালু করে। সকল নেতার কর্তব্য ছিলো, এই আন্দোলনের সাহায্য করা। কিন্তু তারা সাহায্যের পরিবর্তে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। বর্তমানে আফগানিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হচ্ছে। তালেবানদের আন্দোলন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর তাদের বিরোধীরা হচ্ছে বিদ্রোহী। সুতরাং তালেবানদের মধ্য হতে যারা নিহত হবেন তারা আল্লাহর দ্বীনকে সুউচ্চ করার জন্যই নিহত হবেন। তাই নিঃসন্দেহে তারা শহিদ বলে গণ্য হবেন।” -
আপকে মাসায়েল, ৭/৩৭৫-৩৭৬

চলবে ইনশাআল্লাহ

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব

(পর্ব-১ প্রথম ক্ষেত্র- নামায পরিত্যাগ করা)

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232535%3B>)

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব
(পর্ব-২)

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232536%3B>)

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব
(পর্ব-৩ দ্বিতীয় ক্ষেত্র- মানবরচিত বিধান দ্বারা দেশ শাসন
করা)

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232472%3B>)

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব
(পর্ব-৪ আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. এর মত পর্যালোচনা)

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232494%3B>)

১৮.সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (প্রথম পর্ব-
যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত)

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এর উদ্দেশ্যও আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলে দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

(হে নবী!) আমি তোমাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি তোমার অন্তরে শক্তি যোগাই। আর এসব ঘটনার ভিতর দিয়ে তোমার কাছে যে বাণী এসেছে তা স্বয়ং সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মারক। -সূরা হুদ, ১২০

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:-

১. আহলে হক হকের উপর অটল-অবিচল থাকা। বাতিলের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও বিরোধিতার কারণে হক থেকে বিচ্যুত না হওয়া। কারণ যখন আহলে হক কুরআনের দর্পণে

দেখতে পাবে, তাদের অবস্থা ও তাদের বিরোধীদের অবস্থা পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের বিরোধীদের অবস্থার সাথে মিলে যাচ্ছে, তখন তারা নিজেদের হক্কানিয়্যাতে বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হবে। তেমনিভাবে যখন তারা জানতে পারবে বাতিলের সকল প্রকার আশ্ফালন ও চোখরাঙ্গানি সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিচারে বিজয় ও শুভ পরিণতি মুমিনদের নসীবেই থেকেছে তখন তারা বর্তমানের সাময়িক দুঃখ-কষ্ট বা অত্যাচার-নিপীড়নের কারণে হক ছিটকে পড়বে না।

২. এসব ঘটনাবলী মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় হয়। মুমিনগণ পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের উত্তম গুণাবলী জানতে পেরে তার অনুসরণের প্রয়াস পায় এবং কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের খারাপ গুণাবলী ও বদ অভ্যাসগুলো জানতে পেরে তা বর্জন করার চেষ্টা করে।

কিন্তু আমরা সাধারণত এ ঘটনাবলী অনেকটা ইতিহাসের ন্যায় পড়ে যাই। অথচ কুরআন কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়। এজন্যই কুরআন নবীদের ঘটনাবলী ইতিহাস গ্রন্থের ন্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করে না। এমনকি অনেক সময় বিস্তারিত না বলার কারণে পাঠক তৃষিত থেকে যায়। আলেমগণ এর কারণ হিসেবে বলেছেন, নবীদের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করা হলে পাঠক ইতিহাসের অলিগলিতেই হারিয়ে যাবে।

ইতিহাসের সুখপাঠ্যে তন্ময় হয়ে যাওয়ায় কুরআনের মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণে ব্যত্যয় ঘটবে। -মাআরিফুল কুরআন, ৫/১৬

সুতরাং কুরআনের ঘটনাবলী তাদাব্বুরের সাথে পড়া জরুরী। এখন যারা তাফসীরের কিতাবাদি পড়েন তাদের বেশিরভাগও শুধু কিতাব পড়েই ক্ষান্ত করেন। অথচ তাফসীরের কিতাবাদিতেও শিক্ষাটা বর্ণনা করা হয় না। তাই তাফসীরের কিতাবাদিও হলো মাধ্যম। মূল শিক্ষা অর্জন হবে তাদাব্বুরের দ্বারা। আর তাদাব্বুরের শিক্ষা অর্জন করা খুবই সহজ, আল্লাহ তায়ালা বারবার বলেছেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং আছে কি কোন উপদেশগ্রহণকারী। -সূরা কুমার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০,

কিন্তু কেন জানি এই সহজ কাজটিই আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না। হাজার হাজার পৃষ্ঠার কিতাবাদি পড়ে ফেললেও প্রতিদিন কুরআন নিয়ে অন্তত ৫-১০ মিনিট তাদাব্বুর করার ফুরসত আমাদের হয় না। তাই এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কুরআন থেকে শিক্ষা অর্জনের ভার পাঠকের হাতে

ছেড়ে না দিয়ে এ ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা করা।
 যদিও কুরআন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র, এর ইলম ও শিক্ষা
 অর্জন ও বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না, তবুও একেবারে না
 হওয়ার চেয়ে যতটুকু হয় ততটুকুই কল্যাণ। এরই
 ধারাবাহিকতায় এবার আমরা সুলাইমান আলাইহিস সালামের
 ঘটনাবলী থেকে কিছু শিক্ষা অর্জন করার চেষ্টা করবো
 ইনশাআল্লাহ। এরপর ধারাবাহিকভাবে কুরআনে বর্ণিত
 অন্যান্য নবীদের ঘটনাবলী, মুমিনদের গুণাবলী এবং
 মুনাফিক-কাফের-মুশরিকদের বদ স্বভাব ও খারাপ বিষয়াদি
 থেকে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

সাবার রাণী ও তার অধিনস্তদের যুদ্ধের হুমকি দিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ
 وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأَتُونِي
 مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً
 أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأَوْلُو بِأْسِ شَدِيدٍ
 وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا
 دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ
 (34) (35) وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ

بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَيْنِكُمْ تَقْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ
(37) لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَدْلَلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ

“(সুতরাং হৃদহৃদ চিঠি পৌঁছে দিল। তারপর) রাণী (তার দরবারের লোকদেরকে) বললো, হে জাতির নেতৃবর্গ! আমার সামনে একটি মর্যাদাসম্পন্ন চিঠি ফেলা হয়েছে। তা এসেছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে। তার শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নামে, যিনি রহমান ও রহীম। (তাতে সে লিখেছে) আমাদের উপর অহমিকা দেখিও না। বশ্যতো স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো। রাণী বললো, ওহে জাতির নেতৃবৃন্দ! যে সমস্যাটি আমার সামনে দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে তোমরা আমাকে সিদ্ধান্তমূলক পরামর্শ দাও। আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বললো, আমরা শক্তিশালী লোক এবং প্রচণ্ড লড়াই। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আপনার। সুতরাং ভেবে দেখুন কি হুকুম দেবেন। রাণী বললো, প্রকৃত ব্যাপার হলো, রাজা-বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে, এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্চিত করে ছাড়ে। এরাও তো তাই করবে। বরং আমি তাদের কাছে উপটৌকন পাঠাবো। তারপর দেখবো দূত কি উত্তর নিয়ে ফেরে। তারপর দূত যখন সুলাইমানের কাছে উপস্থিত হলো, সে বললো, তোমরা কি

অর্থ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট, অথচ তোমরা তোমাদের উপহার-সামগ্রী নিয়ে উৎফুল্ল ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাদল নিয়ে আসবো, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেবো আর তারা হয়ে যাবে বশীভূত।” -সূরা নামল, ২৯-৩৭

আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

والظاهر أن سليمان، عليه السلام، لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية، ولا اعتنى به، بل أعرض عنه، وقال منكرًا عليهم: أتمدونني بمال؟ أي: أتصنعونني بمال لأترككم على شرككم؟ وملككم؟! {فما آتاني الله خير مما آتاكم} أي: الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، {بل أنتم بهديتكم تفرحون} أي: أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. (تفسير ابن كثير ت سلامة 6/191 دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ)

“বাস্তবতা এই যে, বিলকীস যা কিছু পাঠিয়েছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম আদৌ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন,

তোমরা কি মাল দ্বারা আমাকে তুষ্ট করতে চাও যেন আমি তোমাদেরকে তোমাদের শিরকের অবস্থায়ই ছেড়ে দেই। আল্লাহ আমাকে যে সম্পদ ও সৈন্যবাহিনী দিয়েছেন তা তোমাদের চেয়ে উত্তম। তোমরা তো হাদিয়া পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। কিন্তু আমি ইসলাম অথবা তরবারী ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করবো না।” -তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৬/১৯১

বর্তমানে যারা কাফেরদের সুরে সুর মিলিয়ে ধর্মপালনে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেন, তারা এ ঘটনার কি জবাব দেবেন? এখানে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবার রাণী ও তার সাম্রাজ্যের লোকদের স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে দিয়েছিলেন না চাপপ্রয়োগ করে তাদের মুসলিম হতে বাধ্য করেছেন? এখানে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, এটা পূর্ববর্তী নবীদের ধর্ম, তা আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়, কেননা আল্লাহ তায়ালা সুলাইমান আলাইহিস সালাম সহ অন্যান্য নবীদের আলোচনা করার আমাদের তাদের অনুসরণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ

“(উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হলো) তারা ছিল এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হিদায়াত দান করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথেই চলো।” -সূরা আনআম, ৯০

যদি পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাবলী আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ও আদর্শ না হয় তবে এ ঘটনাবলী কুরআনে থাকার দ্বারা কি ফায়দা? অথচ কুরআনের অধিকাংশ জুড়েই তো রয়েছে পূর্ববর্তী নবী ও তাদের উম্মতের কাহিনী!

আর আমাদের নবীর ধর্মও তো সুলাইমান আলাইহিস সালামের ধর্মের মতই। শুধু তাতে জিযিয়ার বিধানটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছেন, হয় ইসলাম গ্রহণ করো নতুবা তরবারী। আর আমাদের নবী বলতেন, হয় ইসলাম গ্রহণ করো, নতুবা জিযিয়া প্রদান করো, অন্যথায় তরবারী। -সহিহ মুসলিম, ১৭৩১ জামে' তিরমিযি, ১৫৪৮

এমনকি পারস্যের সেনাপতি রুস্তম যখন সাহাবী রিবয়ী বিন আমের রাযিআল্লাহু আনহুকে বলে, তোমরা কেন এসেছো? তখন রিবয়ী বলেন, “আমরা আল্লাহর আদেশে বের হয়েছি- মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে বের করে আনার জন্য এবং সকল ধর্মের যুলুম-অত্যাচারমূলক বিধান থেকে মুক্ত করে ইসলামের আদল ও ইনসাফভিত্তিক বিধি-

বিধানের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য” তখন রুস্তম চিন্তাভাবনার জন্য সময় চায়। রিবয়ী বলেন, ঠিক আছে, কতদিন সময় চান, একদিন না দুদিন?!! রুস্তম বলে, না, আমাদের নেতৃবর্গের নিকট চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে আলাপ করা পর্যন্ত সময় চাই। রিবয়ী বলেন,

ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل

“মোকাবেলার সময় শত্রুকে তিনদিনের বেশি সময় দেয়ার প্রচলন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহয় নেই। সুতরাং তুমি ভেবে দেখো এবং তিনদিনের মধ্যে (ইসলাম, জিযিয়া বা তরবারী এই) তিনটির কোন একটি গ্রহণ করো।”-আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৪০

এখন যারা স্বাধীনভাবে যে কোন ধর্মপালনের স্লেগান দেন, ইসলামগ্রহণের জন্য কোন ধরনের চাপপ্রয়োগের তীব্র বিরোধীতা করেন, তারা কি এ বিষয়গুলো জানেন না? কোথায় তাদের কোন ধরনের চাপপ্রয়োগ ব্যতীত বছরের পর বছর ধরে শুধু মৌখিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াতের পলিসি আর কোথায় নবী-রাসূল ও ইসলামের দাওয়াতের পদ্ধতি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের জীবনীতে তো শুধু দাওয়াতের জন্য কোন দল প্রেরণ করার

নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাদের দাওয়াত ছিল শুধু যুদ্ধের পূর্বে তিন কথার দাওয়াত- হয় ইসলাম গ্রহণ করো, নতুবা জিযিয়া দাও, অন্যথায় তরবারীই তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফায়সালা করবে।

১৯.সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (দ্বিতীয় পর্ব- মুজাহিদ বানানোর নিয়তে সন্তান কামনা)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين كلهن، يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله، فرسانا (2819) أجمعون». صحيح البخاري

وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ: «بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ» قَالَ

الحافظ في فتح الباري (6/34 دار الفكر) أي ينوي عند المجاعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك (أجر وإن لم يقع ذلك

ووقال أيضا (10/580) : (ويقال إن طلحة قال للزبير: أسماء بني أسماء الأنبياء وأسماء بنيك أسماء الشهداء، فقال: أنا أرجو

أن يكون بني شهداء، وأنت لا ترجو أن يكون بنوك أنبياء،
فأشار إلى أن الذي فعله أولى من الذي فعله طلحة

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সুলাইমান বিন দাউদ
(আলাইহিমাস সালাম) বলেছিলেন, **আজ রাতে আমি একশো**
- অথবা বলেছেন, - নিরানব্বই জন স্ত্রীর সাথে সহবাস
করবো। তাদের প্রত্যেকেই একজন অশ্বারোহী প্রসব করবে,
যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তার সাথী (ফেরেশতা)
বললেন, বলুন, ইনশাআল্লাহ! কিন্তু তিনি (ভুলে) ইনশাআল্লাহ
বললেন না। ফলে একজন স্ত্রী ছাড়া কেউই গর্ভবতী হলেন
না। তিনিও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই
সন্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি তিনি
ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হতো এবং তারা
সকলেই ঘোড় সওয়ার হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতো।
-সহিহ বুখারী, ২৮১৯ (ইফা, ৪/১৩১)

ইমাম বুখারী রহিমাল্লাহু এই হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন
এভাবে, “জিহাদের জন্য সন্তান কামনা করা।”

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহিমাল্লাহু বলেন,
“অর্থাৎ এই নিয়তে সহবাস করবে যেন সন্তান হয় এবং সে

সন্তান আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাহলে বাস্তবে তা না
ঘটলেও সে সওয়াব পেয়ে যাবে। -ফাতহুল বারী, ৬/৩৪

সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুমও সন্তান কামনা
করতেন যেন তারা আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করে এবং
শহিদ হয়। হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“বলা হয়, তলহা রাযিআল্লাহু আনহু যোবায়ের রাযিআল্লাহু
আনহুকে বলেন, আমার ছেলেদের নাম তো নবীদের নাম,
আর আপনার ছেলেদের নাম হলো শহিদদের নাম।
যোবায়ের বললেন, আমি আশা রাখি, আমার ছেলেরা শহিদ
হবে, কিন্তু তুমি তো তোমার ছেলেদের নবী হওয়ার আশা
করতে পারো না। এ কথা বলে যোবায়ের ইশারা করেন,
তার ছেলেদের নাম চয়ন তলহা রাযিআল্লাহু আনহুর
ছেলেদের নাম চয়নের চেয়ে উত্তম হয়েছে।” -ফাতহুল বারী,
১০/৫৮০

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নিষেধ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো,
মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে জিহাদের জন্য
সেনা সরবরাহ। সাদ বিন ওয়াক্কাস রাযিআল্লাহু আনহু
বলেন,

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون «
(1402): التبتل». صحيح البخاري: (5073) صحيح مسلم

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন মাযউন
রাযিআল্লাহু আনহুকে বৈরাগ্যের অনুমতি দেননি।” -সহিহ
বুখারী, ৫০৭৩ সহিহ মুসলিম, ১৪০২

হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী, কিরমানী, মোল্লা আলী
কারী ও অন্যান্য আলেমগণ বলেন,

التبتل أي: الانقطاع عن النساء، وكان ذلك من شريعة
النصارى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمته، ليكثر
النسل ويديم الجهاد). عمدة القاري (20 / 72) الكواكب الدراري
(13/ (61 / 19) مرقاة المفاتيح (2042/5) اللامع الصبيح
176)

“বৈরাগ্যবাদ খৃষ্টধর্মে বৈধ ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে বৈরাগ্য থেকে নিষেধ
করেন, যেন তাদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং জিহাদ সর্বদা চলমান
থাকে।” -উমদাতুল কারী, ২০/৭২ আলকাওয়াকিবুদ দুরারী,
১৯/৬১ মেরকাত, ৫/২০৪২ আললামিউস সাবিহ, ১৩/১৭৬

হাফেয ইবনে হাজার রহিমাল্লাহু বলেন,

والحكمة في منعهم من الاختصاص إرادة تكثير النسل ليستمر
 جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع
 النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف
 (9/ 118) المقصود من البعثة المحمدية. فتح الباري لابن حجر

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নপুংসক
 (খাসী) হতে নিষেধ করেছেন যেন কাফেরদের সাথে জিহাদ
 চলমান থাকে। কেননা যদি তিনি তাদের নপুংসক হওয়ার
 অনুমতি দিতেন তাহলে তারা একযোগে নপুংসক হওয়া শুরু
 করতেন, এতে মুসলমানদের বংশবৃদ্ধি কমে যেতো এবং
 কাফেরদের সংখ্যা বেড়ে যেতো। আর এটা তো রাসূল
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণের
 উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।” -ফাতহুল বারী, ৯/১১৮

রাসূলকে নবীরূপে প্রেরণের উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ তায়ালা
 বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ
 كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও
 সত্য দ্বীন সহ, যেন তাকে বিজয়ী করেন সকল ধর্মের উপর,
 যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।” -সূরা তাওবা, ৩৩

আর সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়ী হওয়ার জন্য
প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন। সে সৈন্য সংগ্রহের জন্য ইসলাম
বেশি করে বিবাহ করার ও অধিকহারে সন্তান নেয়ার প্রতি
উদ্বুদ্ধ করেছে। ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু সাইদ বিন
যোবায়ের রহিমাল্লাহুকে বলেন,

«تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء»

“তুমি বিবাহ করে নাও, কেননা এই উম্মতের মধ্যে যিনি
সর্বোত্তম ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংখ্যাও ছিল সবচেয়ে বেশি।” -
সহিহ বুখারী, ৫০৬৯ মুসনাদে আহমদ বিন মানী’র বর্ণনায়
এসেছে, ইবনে আব্বাস যখন সাইদ বিন যোবায়েরকে এ
কথা বলেছিলেন, তখন তার দাড়িও ওঠেনি। -ফাতহুল বারী,
৯/১১৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تزوجوا الولود فإنني مكاثر بكم الأمم

তোমরা প্রেমময়ী অধিক সন্তান জন্মদানকারী মেয়েদের বিয়ে
করো, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য
উম্মতের সাথে গর্ব করবো। -সুনানে আবু দাউদ, ২০৫০
সুনানে নাসায়ী, ৩২২৭

উমর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

قال عمر بن الخطاب : عليكم بالأبكار من النساء فإنهن أعذب
أفواها وأنتج أرحاما وأرضى باليسير

তোমরা কুমারী নারীদের বিয়ে করো, কেননা তাদের মুখ
সুমিষ্ট এবং তারা অধিকহারে সন্তান জন্ম দেয়। -মুসান্নাফ
ইবনে আবী শাইবা, ১৭৯৯০

হিটলার যখন পুরো বিশ্ব দখল করার ইচ্ছা করে তখন সে
বুঝতে পারে এর জন্য প্রচুর জার্মান সৈন্য লাগবে। তাই সে
আইন করে দেয়, মেয়েরা মেট্রিকের পরে আর পড়ালেখা
করবে না। বরং তারা সন্তান জন্মদানের জন্য বিয়ে বন্ধনে
আবদ্ধ হয়ে যাবে। আর বিয়েতে সহায়তার জন্য সরকার
ঋণপ্রদান করবে, যদি একবছরের মধ্যে সন্তান জন্ম দিতে
পারে তবে ঋণের এক-চতুর্থাংশ মাফ করে দেয়া হবে,
দ্বিতীয় বছরও সন্তান জন্ম দান করলে অর্ধেক মাফ করে
দেয়া হবে। (কাশকুলে মারেফাত, মুফতি শফী রহিমাছল্লাহ)

হিটলারের উদ্দেশ্যে ছিলো করে পুরো পৃথিবী দখল করে
নাৎসীবাদ বা জার্মান জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ

জার্মানরা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই তারা পুরো পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে আর অন্যরা তাদের গোলামী করবে। নিসন্দেহে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত উদ্দেশ্য ছিল। তবে আমার মনে হয় তার উদ্দেশ্য খারাপ হলেও পদ্ধতিটা ঠিকই ছিল।

আমরাও পুরো পৃথিবী দখল করতে চাই তবে তা আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য। কাফেরদের জিহাদ, জিযিয়া ও গোলাম-বাদী বানানোর মাধ্যমে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে আমাদেরও প্রচুর সৈন্য লাগবে। এজন্য ইসলাম অধিকহারে সন্তান নেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে যদিও আদমশুমারীতে মুসলিমের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তাদের অনেকেই কার্যত জিহাদ বিরোধী। তাই মুসলমানদের মাঝে জিহাদের দাওয়াত ও প্রচারণার পাশাপাশি আমরা নিজেরাও অধিকহারে সন্তান নেয়ার ফিকির করবো ইনশাআল্লাহ। কেননা মুজাহিদের হাতে গড়ে ওঠা সন্তান মুজাহিদই হবে ইনশাআল্লাহ, যেমনিভাবে ইহুদীর সন্তান ইহুদী এবং খৃষ্টানের সন্তান খৃষ্টান হয়।

২০.সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (তৃতীয় পর্ব-
জিহাদের আসবাব-হাতিয়ারের প্রতি ভালোবাসা)

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (তৃতীয় পর্ব-
জিহাদের আসবাবের প্রতি ভালোবাসা, তার পরিচর্যা এবং
একে আল্লাহ তায়ালার যিকিরের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা)

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ (30) وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ (31) بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ
ذَكَرَ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا
بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

“আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান (-এর মত পুত্র)।
সে ছিল উত্তম বান্দা। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ
অভিমুখী। (সেই সময়টি স্মরণীয়) যখন সন্ধ্যাবেলা তার
সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ভালো-ভালো ঘোড়া পেশ করা হল।
তখন সে বললো, আমি আমার প্রতিপালকের স্মরণার্থেই এই
সম্পদকে ভালোবেসেছি। অবশেষে তা পর্দার আড়াল হয়ে
গেল। (অনন্তর সে বললো,) ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে
আনো। অতপর সে (তাদের) পায়ের গোছা ও ঘাড়ে হাত
বুলাতে লাগলো।” -সূরা সোয়াদ, ৩০-৩৩ তাফসীরে
তাওযীছুল কুরআন, ৩/১৯৩-১৯৪

مضائقہ نہیں۔ اگر ایک طرف ذکر اللہ (یاد خدا) سے بظاہر علیحدگی رہی تو دوسری جانب جہاد کے گھوڑوں کی محبت اور دیکھ بھال بھی اسی کی یاد سے وابستہ ہے۔ جب جہاد کا مقصد اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے تو اس کے مُعدّات و مبادیٰ کا تفقّد کیسے ذکر اللہ کے تحت میں داخل نہ ہو گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہاد اور آلات جہاد کے مہیا کرنے کی ترغیب نہ دیتا تو اس مال نیک سے ہم اس قدر محبت کیوں کرتے۔ اسی جذبہ جہاد کے جوش و افراط میں حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پھر واپس لاؤ۔ چنانچہ واپس لائے گئے اور حضرت سلیمانؑ غایت محبت و اکرام سے ان کی گردنیں اور پنڈلیاں پونچھنے اور صاف کرنے لگے۔ آیت کی یہ تقریر بعض مفسرین نے کی ہے۔ اور لفظ { حُبِّ الْخَيْرِ } سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ گویا خیر کا لفظ اس مضمون کی طرف اشارہ الخیل «کر رہا ہے جو نبی کریم ﷺ نے حدیث میں فرمایا معقود فی نواصبہا الخیر الی یوم القیامۃ»۔

“অর্থাৎ জিহাদের ঘোড়ার ভালোবাসা ও পরিচর্যাও তো আল্লাহ তায়ালার স্মরণের সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু জিহাদের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর দীনকে সুউচ্চ করা তাই জিহাদের হাতিয়ার ও আসবাবও নিশ্চিতভাবে আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। যদি আল্লাহ তায়ালার জিহাদ এবং জিহাদের হাতিয়ার প্রস্তুত করার আদেশ না দিতেন তবে এই ঘোড়াকে আমরা এত ভালোবাসতাম না। এই জিহাদের জযবার আতিশয্যে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন, ঘোড়াগুলো পুনরায় নিয়ে আসো। ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে আনা

হলে সুলাইমান আলাইহিস সালাম অত্যন্ত ভালোবাসা ও আদরের সাথে সেগুলোর গর্দান ও পায়ের গোছায় হাত বুলিয়ে তা পরিষ্কার করতে লাগলেন। আয়াতের এ ব্যাখ্যা কোন কোন মুফাসসির করেছেন, আয়াতে উল্লিখিত خیر (কল্যাণ) শব্দ থেকে এর সমর্থন মেলে, যেন এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত এই হাদিসের বিষয়বস্তুর দিকে ইশারা করছে, “ঘোড়ার কেশরে কিয়ামত পর্যন্ত خیر(কল্যাণ) যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।” (তাফসীরে উসমানী)

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (প্রথম পর্ব-
যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত)

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232468%3B>)

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (দ্বিতীয় পর্ব-
মুজাহিদ বানানোর নিয়তে সন্তান কামনা)

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232494%3B>)

২১.দরসুল কুরআন (পর্ব-১) বিশ্বমঞ্চে মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা লাভের চাবিকাঠি

বিশ্বমঞ্চে মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা লাভের চাবিকাঠি

ইসলাম পূর্বযুগে আরবরা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে মূর্খ ও অসভ্য জাতি। মানবসভ্যতা ও পৃথিবীকে উপহার দেয়ার মত কিছুই তাদের ছিল না। তারা তো তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে শতশত বছর যুদ্ধ করে যেতো। কিন্তু হঠাৎ তাদের মাঝে আবির্ভাব হলো একজন রাসূলের। যিনি কুরআনের জিয়নকাঠিতে বদলে দিলেন বর্বর আরবদের। তার পরশে চরম অজ্ঞরাই হয়ে গেলো মানবসভ্যতার শিক্ষক। তারাই পৃথিবীকে শিক্ষা দিলেন ন্যায়, আদর্শ ও কল্যাণের। মানুষকে মুক্ত করলেন মানুষের গোলামী হতে, অধর্মের জুলুম-অত্যাচার হতে। মাত্র চল্লিশ বছরের মাথায় তৎকালীন সুপার পাওয়ার রোম-পারস্য তাদের নিকট পরাজিত হয়ে নতি স্বীকার করলো।

যেমনিভাবে আরবরা কুরআনের মাধ্যমে সম্মান ও প্রতিপত্তি

লাভ করেছিল, আজও মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র মাধ্যম হলো কুরআন। কুরআন অনুযায়ী আমল করেই তারা বিশ্বমঞ্চে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। নতুবা বৈষয়িক উপায়-উপকরণে তো কাফেররা মুসলিমদের চেয়ে শতবছর এগিয়ে গেছে। এমনকি তারা মুসলিম দেশগুলোতেও তাদের মানসপুত্রদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে তারা মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের সম্পদ নির্বিঘ্নে ও স্থায়ীভাবে ভোগ করার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তবে যথাসাধ্য উপকরণ অবলম্বন তো কুরআনেরই নির্দেশ। তাই সেটাও অবশ্য করণীয়। কিন্তু যারা মনে করেন ইসলামের পরিবর্তে কাফেরদের অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমেই মুসলিমরা এগিয়ে যেতে পারবে তারা আসলেই বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

আমি তোমাদের নিকট একটি প্রেরণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য রয়েছে ‘যিকির’ (উপদেশ ও সুখ্যাতি)। -সূরা আশ্বিয়া: ১০

আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, ‘এতে তোমাদের জন্য সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে।’ আর যাহহাক রহ. ও বলেন, ‘এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে।’

বাস্তবে উভয় তাফসীরের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ কুরআন মুসলিমদের জন্য উপদেশনামা। কিন্তু এই উপদেশনামার অনুসরণ যে মুসলিমদের জন্য শুধু আখেরাতের কল্যাণই বয়ে আনবে তা নয়, বরং দুনিয়াতেও তা মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদার নিশ্চয়তা দিয়ে, শর্ত শুধু একটিই- কুরআন অধ্যয়ন এবং কুরআনের পূর্ণ অনুসরণ।

এধরণের আরেকটি আয়াত হলো,

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

সোয়াদ, কসম 'যিকর' সম্বলিত কুরআনের। -সূরা সোয়াদ: ১

এ আয়াতটি তখন নাযিল হয় যখন কাফেররা আবু তালেবের নিকট নবীজির নামে অভিযোগ দায়ের করে বলে, সে আমাদের উপাস্যদের গালিগালাজ করে (অর্থাৎ সেসব মূর্তির অসারতা প্রমাণ করে) আমাদের (মূর্তিপূজারী) বাপ-দাদাদের গোমরাহ বলে দাবী করে। তখন আবু তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ভাতিজা! তুমি তোমার জাতির নিকট কি চাও? নবীজি বলেন, আমি শুধু তাদের নিকট একটি কালিমা চাই যার মাধ্যমে পুরো আরব তাদের নিকট নতি স্বীকার করবে আর অনারবরা তাদেরকে জিজিয়া প্রদান করবে। এ কথা শুনে আবু জাহেল

বলে ওঠে, শুধু একটি কালেমার মাধ্যমে (এত কিছু হবে)? নবীজি বললেন, হাঁ, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে (এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে)। তখন কাফেররা বলে, ‘সে কি সমস্ত মাবুদকে এক মাবুদ দ্বারা বদলে দিয়েছে? এটা তো বড় আজব কথা!’ (সোয়াদ: ৫) এই প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। -জামে তিরমিযি: ৩২৩২

কুরআনের অনুসরণই যে মুসলিমদের মর্যাদার একমাত্র চাবিকাঠি এ বিষয়টি হাদিসেও সুস্পষ্টরূপে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين

‘আল্লাহ তায়ালা এ কিতাব (অনুযায়ী আমল করার দ্বারা) অনেক জাতিকে সম্মানিত করবেন আর (তা না মানার) কারণে অনেক জাতিকে লাঞ্ছিত করবেন।’ -সহিহ মুসলিম: ৮১৭

পরিশেষে রাসূলের যবানে ‘মুলহাম’ (ইলহামের অধিকারী) বলে স্বীকৃত উমর রাযি. এর মহান বাণীটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,

إِنَّا كُنَّا أَذْلَ قَوْمٍ، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا
أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذْلْنَا اللَّهُ

আমরা ছিলাম (পৃথিবীতে) সবচেয়ে লাঞ্ছিত-অপমানিত।
আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাধ্যমেই আমাদের সম্মানিত
করেছেন। সুতরাং যদি আমরা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন
মাধ্যমে মর্যাদা অন্বেষণ করতে যাই তাহলে আল্লাহ আবারো
আমাদের লাঞ্ছিত করবেন। -মুস্তাদরাকে হাকেম: ২০৭

(যিলালুল কুরআন ও তাফসীরে ইবনে কাসীর অবলম্বনে)

২২. দরসুল কুরআন; রমযান; তাকওয়া অর্জনের প্রশিক্ষণশালা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ইমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে,
যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা
হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো, গুনাহ
হতে বেঁচে থাকতে পারো। সুরা বাকারা, আয়াত, ১৮৩

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, রোযা রাখার দ্বারা কিভাবে

তাকওয়া হাসিল হবে? এর উত্তরে আলেমগণ বলেন, রমযানে রোযাদার হালাল চাহিদা পূরণ করা হতে বিরত থাকার মাধ্যমে হারাম থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করে। দেখুন, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস তো বৈধ চাহিদা, কিন্তু রোযা রাখলে এগুলো থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। সুতরাং যে রোযা রেখে বৈধ চাহিদা হতে বিরত থাকতে পারবে, সে কেন অবৈধ চাহিদা ও গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকতে পারবে না? হাঁ, তবে যে ব্যক্তি রোযা রেখেও বিভিন্ন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, রোযা তার জন্য তাকওয়ার প্রশিক্ষণ কিভাবে হবে? এজন্যই হাদিসে রোযা রেখে ঝগড়া-বিবাদ না করা, গীবত না করা এবং সকল প্রকার গুনাহের কাজ হতে বেঁচে থাকার তাগীদ এসেছে এবং বলা হয়েছে, যারা রোযা রেখে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় তাদের রোযা দ্বারা উপবাস ব্যতীত কোন ফায়দা নেই।

« الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم».
 صحيح البخاري: (1151) صحيح مسلم (1904)

রোযা ঢালস্বরূপ, সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে তখন যেন সে অশ্লীল কথা না বলে, ঝগড়াঝাটি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হয় তাহলে সে তাকে বলবে, আমি রোযাদার, (আমি

তোমার সাথে ঝগড়া করতে চাই না) -সহিহ বুখারী, ১৯০৪
সহিহ মুসলিম, ১১৫১

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার রহিমাল্লাহ (মূ: ৮৫২
হি.) বলেন,

جنة وحصن « :ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة
حصين من النار». وله من حديث أبي عبيدة ابن الجراح:
«الصيام جنة ما لم يخرقها» زاد الدارمي «يعني بالغيبة» وبذلك
وقال القرطبي: جنة أي سترة، ...ترجم له هو وأبو داود،
يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده
وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم
فلا يرفث» الخ، ويصح أن يراد أنه ستره بحسب فائدته وهو
إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: «يدع شهوته
سترة من الآثام أو من :الخ»... وقال عياض في الإكمال: معناه
النار أو من جميع ذلك، وبالأخير جزم النووي. (فتح الباري:
4/104 ط. دار الفكر)

... মুসনাদে আহমদে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহর সূত্রে
বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রোযা ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত
তাকে (গীবতের মাধ্যমে) ছিদ্র করা না হয়। ... রোযাকে ঢাল
বলা হয়েছে, রোযার ফায়দার দিকে লক্ষ্য করে, কেননা
রোযার দ্বারা (গুনাহের প্রতি) অন্তরের শাহওয়াত কমে যায়,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ‘রোযাদার

আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের শাহওয়াত
ছেড়ে দেয়' এ কথায় এ দিকেই ইশারা করা হয়েছে। -
ফাতহুল বারী, ৪/১০৪

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة
(1903): في أن يدع طعامه وشرابه». صحيح البخاري
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رب
«صائم ليس له من صيامه إلا الجوع

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রোযা
রেখেও মিথ্যা কথা বললো, গুনাহে লিপ্ত হলো, তার পানাহার
পরিত্যাগ করাতে আল্লাহর কোন গরজ নেই। সহিহ বুখারী,
১৯০৩

অন্য বর্ণণায় এসেছে, কোন কোন রোযাদার উপবাস ব্যতীত
তার রোযা দ্বারা কিছুই অর্জন করতে পারে না। সুনানে
ইবনে মাজাহ, ১৬৯০

عن إبراهيم، قال: كانوا يقولون: «الكذب يفطر الصائم». (مصنف ابن أبي شيبة: 8981)
عن كعب وأبي العالية، قالوا: «الصائم في عبادة ما لم يغترب». (مصنف ابن أبي شيبة: 8982 ومصنف عبد الرزاق: 7896)

ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, সালাফ বলতেন, মিথ্যা কথার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায়। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৮৯৮১

তাবেয়ী কাবে আহবার ও আবুল আলিয়া বলেন, রোযাদার যতক্ষণ পর্যন্ত গীবত না করে ততক্ষণ সে ইবাদতে থাকে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৮৯৮২ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৭৮৯৬

বস্তুত, রমযানে একদিকে শয়তান বন্দী, অপরদিকে রোযার কারণে নফসও দুর্বল হয়ে যায়, তাই এ মাসে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মাসের সহজ, তাই এ মাস তাকওয়ার প্রশিক্ষণের এক সুবর্ণ সুযোগ। যদি এ মাসে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা সচেষ্টি হই তাহলে ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা আমাদের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং ধীরে ধীরে আমরা সকল গুনাহ বর্জন করতে পারবো। তাই প্রত্যেকেরই মুহাসাবা করা উচিত, রোযা অবস্থায় আমার দ্বারা কোন গুনাহ হচ্ছে কি না? এমন যেন না হয় যে, আমরা হালাল খাবার হতে তো বিরত থাকলাম, কিন্তু হারাম সম্পদ উপার্জন করলাম, স্ত্রীসহবাস হতে বিরত থাকলাম কিন্তু চোখের খেয়ানত বা অন্য কোন হারাম পন্থায় যৌন চাহিদা মিটালাম। যদিও অধিকাংশ

আলেমদের মতানুযায়ী গুনাহের দ্বারা রোযা ভাঙ্গে না, কিন্তু এর দ্বারা রোযা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রোযার সওয়াব কমে যায়, বরং রোযার উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনই ব্যাহত হয়। আল্লাহ আমাদের হেফায়ত করুন। আমিন।

২৩. দরসুল কুরআন; রমযানে বেশি বেশি ইবাদতের মাধ্যমে জিহাদের ইমানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

আসুন, রমযানে বেশি বেশি ইবাদতের মাধ্যমে জিহাদের ইমানী প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْبِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ النَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রথমে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, ‘আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের থেকে তাদের জানমাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে, মারবে ও মরবে, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (তাদের সাথে এই) অঙ্গীকার করা হয়েছে’। ... এরপর আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদের কিছু গুণাবলী উল্লেখ করেছেন

যে, ‘তারা তাওবাকারী, ইবাদতগুজার, (আল্লাহ তায়ালার) প্রশংসাকারী, (জিহাদ, ইলম অর্জন ইত্যাদি দ্বীনি কাজে) সফরকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ হতে নিষেধকারী, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ পালনকারী। আপনি (এমন) মুমিনদের (দুনিয়াতে বিজয় ও আখেরাতে সওয়াবের) সুসংবাদ দেন’। (সুরা তাওবা, আয়াত, ১১১-১১২)

আয়াত থেকে আমরা বিজয়ের সুসংবাদপ্রাপ্ত মুজাহিদদের কিছু গুনাবলী জানতে পারলাম, যার মধ্যে কয়েকটি গুণ হলো,

১. **الرَّاعِبُونَ** ইবাদতগুজার, অর্থাৎ মুজাহিদগণ বেশি বেশি ইবাদত করবেন।

২. **الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ** রুকু ও সিজদাকারী, অর্থাৎ মুজাহিদগণ সর্বোত্তম ইবাদত নামাযের প্রতি যত্নবান হবেন, ওয়াক্ত মত জামাতের সাথে নামায পড়বেন, বেশি বেশি নফল নামায পড়বেন এবং কিয়ামুল লাইলে অভ্যস্ত হবেন।

৩. **الْمُؤْمِنُونَ** আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাকারী, অর্থাৎ তারা তাসবীহ-তাহমিদের মাধ্যমে বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার যিকির করবেন, আর সর্বোত্তম যিকির তো কুরআন

তেলাওয়াত।

সুতরাং রমযান মাসে এ গুণাবলী অর্জন করার জন্য আমাদের সচেষ্টিত হওয়া উচিত, শাইখ আব্দুল কাদের العمدة العدة في إعداد العدة কিতাবে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ‘মুমিনরা যে কখনো কখনো যুদ্ধে পরাজিত হয় এর কারণ হলো তারা যুদ্ধের শর্ত ইমানী বা আসকারী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা সামরিক প্রস্তুতিতে ত্রুটি করেছে, যদি এর কোন একটিতে ত্রুটি না হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা অনুযায়ী মুমিনরা কখনোই পরাজিত হবে না’। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন হও (এবং ইমানের তাকাযা অনুযায়ী সামরিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি পূর্ণরূপে গ্রহণ করো)। -সূরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৩৯

উহুদ যুদ্ধে গুনাহের কারণেই মুমিনদের পরাজয় হয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَفَى الْجُمُعَانَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ
بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

দুই বাহিনী সম্মুখীন হবার দিন যারা পলায়ন করেছে, শয়তান তাদেরকে তাদের কিছু গুনাহের কারণেই পদস্থলিত

করেছে। -সুরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৫৫।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ
عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

যখন তোমাদের উপর এমন আঘাত আসলো যার দ্বিগুন
আঘাত তোমরা করেছিলে, তখন তোমরা বলে উঠলে, এটা
কেন হলো? (অর্থাৎ আল্লাহ তো আমাদের বিজয়ের ওয়াদা
করেছেন, তাহলে আমরা কেন পরাজিত হলাম?) হে রাসূল
আপনি বলুন, এটা তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে।
(অর্থাৎ তোমরা রাসূলের আদেশ অমান্য করে যে অন্যায়
করেছো, এর কারণেই তোমরা পরাজিত হয়েছো, নতুবা
প্রথম অবস্থায় তো আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে কৃত
ওয়াদা পূরণ করেছিলেন এবং তোমাদের বিজয় দান
করেছিলেন, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন,
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُم بِأُذُنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّاعْتُمْ
مِنَ الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ
আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে কৃত
অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, যখন তোমরা কাফেরদের হত্যা
করছিলে, অতপর যখন তোমরা মতভেদ করে দুর্বল হয়ে
পড়লে এবং (রাসূলের আদেশ অমান্য করে) গুনাহে লিপ্ত
হলে (তখন যুদ্ধের ঘুটি পাল্টে গেল)

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য শায়েখ আব্দুল কাদের রচিত আলউমদাহ গ্রন্থের **الأصول الخمسة لتحقق سنة النصر أو** خلفها এই অধ্যায়টি (পৃ: ২১৫-২৩৬ পৃষ্ঠা) দেখতে পারেন। এখানে শায়েখ ইমানী প্রস্তুতির গুরুত্বের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খুবই সুন্দর আলোচনা করেছেন।

অধিকন্তু জিহাদের মতো একটি কষ্টকর ইবাদত পালন করার জন্য যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন। আর এই আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন হয় বেশি বেশি ইবাদত, বিশেষকরে দীর্ঘ কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে। শায়েখ আবু মুহাম্মদ আলমাকদিসী বলেন,

ولن يستطيع العبد مواجهة الشرك وأهله ولن يقوى على التبرؤ منهم وإظهار العداوة لباطلهم إلا بعبادة الله حق عبادته، ولقد أمر الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وقيام الليل في مكة وأعلمه بأن ذلك هو الزاد الذي يعينه على تحمل أعباء الدعوة الثقيلة وذلك قبل قوله: {إنا سنلقي عليك قولاً يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلاً، { ثقيلًا } [المزمّل: 5]، فقال نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً} [المزمّل: 1 - 4]، فقام صلوات الله وسلامه عليه وقام معه أصحابه حتى تقطرت أقدامهم .. إلى أن أنزل سبحانه التخفيف في آخر الآيات

وإن هذا القيام بتلاوة آيات الله عز وجل وتدبير كلامه .. لخير
زاد ومعين للداعي، يثبتہ ويعينه على مشاق الدعوة وعقباتها

..

বান্দা কখনোই শিরক ও মুশরিকদের মোকাবেলা করতে পারবে না, এবং তাদের থেকে বারাত করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত যথাযথভাবে করবে, আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় তাহাজ্জুদে কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দিয়েছিলেন, এবং তাকে জানিয়েছিলেন যে, এই ইবাদত দাওয়াতের গুরুদ্বায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার জন্য সহায়ক হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওহে চাদর আবৃত (রাসূল) আপনি রাতের কিছু অংশ ব্যতীত (পুরো সময়) ইবাদত করুন। অর্ধ রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশি (সময় ইবাদত করুন) (এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আদেশের কারণস্বরূপ বলেন) নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর এক ভারী কথা (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করবো। সূরা মুযায্মিল, আয়াত, ১-৫

তাহাজ্জুদে কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করা হলো দায়ীদের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় যা তাদেরকে দাওয়াতের পথে অবিচল রাখবে এবং দাওয়াতের কষ্টক্লেশ ও প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিতে তাদের সহায়ক হবে।

-মিল্লাতু ইবরাহীম, পৃ: ১৫

মুহাম্মদ কুতুব রহিমাল্লাহ (ম্: হি.) ও مفاهيم ينبغي أن
صحیحকিতাবে দ্বীন কায়েমের পথে পাথেয় হিসেবে
ইবাদতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের আলোচনা
করেছেন। (পৃ: ২১৪-২১৫) তাই আমাদের জন্য ইবাদতের
মৌসুম এই রমযানে বেশি বেশি ইবাদত করে জিহাদের
জন্য ইমানী প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যিক। আল্লাহ তায়ালা
আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

২৪.দরসুল হাদিস; শাহাদাতের সন্ধানে ছুটে চলা; মুমিনের
জীবনযাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
«مَنْ خَيْرَ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمَسِّكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَنبِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَرَعَةً طَارَ عَلَيْهِ،
يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ
مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنٍ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأُودِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ،
وَيُؤْتِي الرِّكَاعَةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا
فِي خَيْرٍ».

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل
الجهاد والرباط (1889)

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনের জীবনের সর্বোত্তম অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে (অর্থাৎ পূর্ণ প্রস্তুত থাকে), (শত্রু আগমণের) সংবাদ কিংবা (সাহায্যের আবেদনমূলক) চিৎকার শুনতে পাওয়া মাত্রই সে ঘোড়ার পিঠে উড়ে চলে, সম্ভাব্য (সকল) স্থানে শাহাদাত ও মৃত্যুকে খুঁজে ফেরে, কিংবা ঐ ব্যক্তি যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় বা কোন উপত্যকায় কয়েকটি ছাগল নিয়ে বসবাস করে, নামায কয়েম করে, যাকাত প্রদান করে, এবং মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করে, সে মানুষের শুধু কল্যাণই সাধণ করে (ক্ষতি করে না) - সহিহ মুসলিম, ১৮৮৯

হাদিসের ব্যাখায় ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭৬ হি.) বলেন,

المعاش هو العيش، وهو الحياة، وتقديره والله أعلم: «من خير أحوال عيشتهم: رجل ممسك». قوله صلى الله عليه وسلم يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، « بيتغي القتل والموت مظانه» معناه: يسارع على ظهره، وهو متنه، كلما سمع هيعة، وهي الصوت عند حضور العدو، وهي بفتح الهاء وإسكان الياء، والفزعة بإسكان الزاي، وهي النهوض إلى العدو.

ومعنى «يبتغي القتل مظانه»: يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة، وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة. شرح النووي على مسلم: (13/35 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392)

... ‘সম্ভাব্য স্থানে শাহাদাত ও মৃত্যুকে খুঁজে বেড়ায়’ এর অর্থ হলো, শাহাদাতের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে ঐ সব স্থানে শাহাদাতকে খুঁজে বেড়ায় যেখানে শাহাদাতের সম্ভাবনা থাকে। এই হাদিস জিহাদ, রিবাত ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষার ফযিলত প্রমাণ করে। -শরহে মুসলিম, ১৩/৩৫

হাদিসের দ্বিতীয় অংশে যে পাহাড়ের চূড়ায় বা উপত্যকায় একাকী বসবাস করে ইবাদত বন্দেগী করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, আলেমগণ বলেছেন, এটা ফিতনার সময়ের বিধান, এর দলিল হলো সহিহ বুখারীর এই হাদিস,

قال رسول الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن» (19): صحيح البخاري

আবু সাইদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অচিরেই মানুষের

উত্তম সম্পদ হবে ছাগলপাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ও
 বৃষ্টিবর্ষণের স্থানসমূহে বসবাস করবে, দ্বীন রক্ষার্থে সে
 ফিতনা থেকে পলায়ন করবে। -সহিহ বুখারী, ১৯ (বিস্তারিত
 দেখুন, ইমাম নববীর শরহে মুসলিম ১৩/৩৪ দারু
 ইহইয়াউত তুরাস, ফাতহুল বারী, ৬/৬-৭ দারুল ফিকর,
 তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/৩৪৭ দারু ইহইয়াউত
 তুরাস)

আর স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের সাথে মিলে থাকা,
 বিশেষকরে জিহাদের উদ্দেশ্যে লোকালয়ে থাকা একাকী
 পাহাড়-উপত্যকায় থেকে ইবাদত করার চেয়ে অনেক উত্তম,
 একসাহাবী একটি পাহাড়ের শৃঙ্গের পাশ দিয়ে অতিক্রম
 করেন, যাতে একটি ছোট সুন্দর ঝর্ণা ছিল, জায়গাটি
 সাহাবীর বেশ পছন্দ হয়, তিনি ভাবেন, যদি আমি মানুষের
 থেকে পৃথক হয়ে এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করি তাহলে
 কতই না উত্তম হয়, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস না করে আমি কখনোই তা করবো
 না। পরে তিনি রাসূলের নিকট এ বিষয়টি উপস্থাপন করলে
 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي
 بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ،
 اغْرُؤْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقٍ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ
 (2382): الْجَنَّةُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: (10785) وَالتِّرْمِذِيُّ

هذا ((هذا) (1650) وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقال الحاكم
حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وقال الشيخ
شعيب في تحقيقه لمسند أحمد: (إسناده حسن)

তুমি এটা করো না, কেননা আল্লাহর রাস্তায় একমুহুত
অবস্থান করা ঘরে বসে সত্তর বছর ইবাদত করার চেয়েও
উত্তম, তোমরা কি চাওনা না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে
দিবেন, তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? আল্লাহর পথে
যুদ্ধ করো, যে আল্লাহর পথে একমুহুত যুদ্ধ করবে তার জন্য
জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।-সুনানে তিরমিযি, ১৬৫০,
মুসনাদে আহমদ, ৯৬৭২ ইমাম তিরমিযি ও শায়েখ শুয়াইব
আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

এখানে প্রসঙ্গত ফিতনা কাকে বলে তাও স্পষ্ট করা দরকার,
অনেকে জিহাদকেই ফিতনা মনে করে, বিশেষকরে নুসাইরী,
শিয়া, ও মুরতাদ-ইসলামবিদ্বেষী সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধকেই
ফিতনা মনে করে নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকে, কিন্তু ফিতনা
কাকে বলে এই বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে,
ফিতনা সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী সাহাবী হলেন হুযাইফা
রাযিআল্লাহু আনহু, তিনি নিজেই বলেন, ‘মানুষ রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণকর বিষয়াদী
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো, আর আমি তাকে অকল্যাণ

(ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, যেন আমি এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারি’, (সহিহ বুখারী, ৩৬০৬ সহিহ মুসলিম, ১৮৪৭) সাহাবায়ে কেলামও তাকে ফিতনা বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দিতেন, (সহিহ বুখারী, ৫২৫ সহিহ মুসলিম, ১৪৪) তো এই মহান সাহাবী হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু সুস্পষ্ট রূপে বলেছেন, ‘ফিতনা হলো যখন হক-বাতিল অস্পষ্ট হয়ে যায়’, অর্থাৎ যদি কখনো এমন হয় যে, কোন পক্ষ হক আর কোন পক্ষ বাতিল তা নির্ধারণ করা না যায় তখন শরিয়ত আমাদের কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে নিষেধ করেছে, কিন্তু যেখানে এক পক্ষ কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছে, আর অপর পক্ষ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা কিংবা বহাল রাখার জন্য যুদ্ধ করছে সেক্ষেত্রে শরিয়ত আমাদের কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা লড়াই করছে তাদের পক্ষে যোগদানের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, এ বিষয়ে হুযাইফা ও সালমান রাযিআল্লাহু আনহুমা, এবং কাবে আহবার রহিমাল্লাহু থেকে নিম্নে বর্ণিত আছারগুলো লক্ষ্য করুন,

« لَمَّا قَدِمَ حُدَيْفَةُ عَلَى جُوْحَا أَتَى أَبَا مَسْعُودٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا شَأْنُ سَيْفِكَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَمَّرَنِي عُثْمَانُ عَلَى جُوْحَا، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِتْنَةً، أَمَا تَعْرِفُ: حِينَ طَرَدَ النَّاسُ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ

دَيْنِكَ يَا أَبَا مَسْعُودٍ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ مَا عَرَفْتَ دَيْنَكَ، إِنَّمَا الْفِتْنَةُ إِذَا اسْتَبَّهَ عَلَيْكَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَلَمْ تَدْرِ أَيُّهُمَا تَتَّبِعُ، فَتِلْكَ الْفِتْنَةُ». أخرجه ابن أبي شيبة: 38447

হুযাইফা রাযি. যখন জুখার গভর্ণর হয়ে আসেন তখন আবু মাসউদ রাযি. তাকে সালাম জানানোর জন্য আসেন, আবু মাসউদ বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ আপনার সাথে তরবারী কেন? হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, উসমান রাযি. আমাকে জুখার গভর্ণর বানিয়েছেন। আবু মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, এই যে লোকেরা (সাবেক গভর্ণর) সাইদ বিন আসকে তাড়িয়ে দিল এ কারণে কি আপনি কোন ফিতনা হওয়ার আশংকা করছেন? হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আবু মাসউদ, আপনি কি আপনার দ্বীন সম্পর্কে অবগত নন? আবু মাসউদ বললেন, হাঁ, অবশ্যই। হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, যতদিন আপনি আপনার দ্বীনের ব্যাপারে অবগত থাকবেন, ততদিন ফিতনা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *ফিতনা তো হলো যখন হক-বাতিল অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আপনি কি করবেন, কোন পক্ষে যাবেন তা নির্ধারণ করতে পারবেন না।* -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩৮৪৪৭ এ আছারটি হাফেয ইবনে হাযারও ফাতহুল বারীতে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন, দেখুন ফাতহুল বারী, ১৩/৪৯ দারুল ফিকর।

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، قَالَ: «قَالَ سَلْمَانُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ؟ قَالَ: إِذَا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ، قَالَ (30926): نَعَمْ الزُّوْبِيُّ: إِذَا أَنْتَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

তারেক বিন শিহাব বলেন, *সালমান রাযিআল্লাহু আনহু* যায়েদ বিন সুহানকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন কুরআনের অনুসারী ও শাসকের মধ্যে যুদ্ধ হবে তখন তুমি কি করবে, যায়েদ বললেন, আমি কুরআনের অনুসারীদের পক্ষ অবলম্বন করবো, *সালমান রাযিআল্লাহু আনহু (খুশি হয়ে) বললেন, তাহলে তুমি কতই না উত্তম যায়েদ হবে*। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩০৯২৬

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «يُقْتَتَلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ قَالَ: فَيَطُّ السُّلْطَانُ عَلَى أَخْرَجَهُ. «صِمَاحُ الْقُرْآنِ فَلَأَيًّا بِلَأِيٍّ، وَلَا أَيًّا بِلَأِيٍّ، مَا تَنْفَلْتَنَ مِنْهُ (132): ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: (30927) وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার টিকায় শায়েখ আওয়ামা বলেন,

والمعنى - والله أعلم سيكون اقتتال بين أهل القرآن والسلطان، وتكون الغلبة لأهل القرآن، وتكون شدة بشدة، قل ما تنفلتن وتنجون منها. (تعليق الشيخ عوامه على المصنف : 15/562 ط. دار القبلة)

উল্লিখিত আছরটির অর্থ হলো, অচিরেই কুরআনের অনুসারী ও বাদশার অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হবে, এবং কুরআনের অনুসারীদেরই বিজয় হবে। তবে হবে যুদ্ধ ঘোরতর, তোমাদের কম লোকই তার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে। - মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ১৫/৫৬২

বস্তুত, নামায কায়েম না করা এবং কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা, শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, চাই এসব কাজের কারণে শাসককে মুরতাদ বলা হোক বা না হোক, বরং অনেক আলেমগণ এসব ক্ষেত্রে শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করে তাকে অপসারিত করা উম্মতের ইজমায়ী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওয়াজিব বলে দাবী করেছেন, এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ এবং আলেমদের বক্তব্য সহ বিস্তারিত ফতোয়া তৈরীর কাজ করছি, ভাইদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত রইল, আল্লাহ তায়ালা যেন দ্রুততম সময়ে কাজটি সুসম্পন্ন করার তাওফিক দান করেন।

২৫.দরসুল হাদিস; জিহাদ; ইমানের পরে সর্বোত্তম আমল

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور».

(83): صحيح مسلم (26): صحيح البخاري

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ইমান আনা। প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হজ্জ মাবরুর (মকবুল হজ্জ) -সহিহ বুখারী, ২৬ সহিহ মুসলিম, ৮৩

عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيله». صحيح البخاري: (2518)

(84): صحيح مسلم

আবু যর রাযিআল্লাহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর প্রতি

ইমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা। -সহিহ বুখারী,
২৫১৮ সহিহ মুসলিম, ৮৪

আবু সাইদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله
صحيح. «عليه وسلم: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله
(1888): البخاري: (2786) صحيح مسلم

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়, হে
আল্লাহর রাসুল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসুল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ মুমিন যে নিজের জানমাল
দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। -সহিহ বুখারী, ২৭৮৬
সহিহ মুসলিম, ১৮৮৮

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন,

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دلني على
عمل يعدل الجهاد؟ قال: «لا أجده» قال: «هل تستطيع إذا خرج
المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تقتر، وتصوم ولا تفطر؟»،
قال: ومن يستطيع ذلك؟، قال أبو هريرة: «إن فرس المجاهد
ليستن في طوله، فيكتب له حسنات». صحيح البخاري: (2785)
(1878): صحيح مسلم

একব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের সমতুল্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো এমন কোন আমল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি পারবে, মুজাহিদ জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলে তুমি মসজিদে প্রবেশ করে অনবরত নামায পড়তে থাকবে, ক্লাস্ত হবে না। প্রতিদিন রোযা রাখবে, রোযা ভাঙ্গবে না। প্রশ্নকারী বললেন, এটা কেই বা পারবে? আবু হুরাইরা বলেন, মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাধা অবস্থায় বিচরণ করলেও মুজাহিদের জন্য সওয়াব লিখা হয়। -সহিহ বুখারী, ২৭৮৫, সহিহ মুসলিম, ১৮৭৮

হাফেয ইবনে হাযার বলেন,
 وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل
 (الجهاد شيء من الأعمال. فتح الباري: 6/5 ط. دار الفكر)

এটি মুজাহিদের জন্য সুস্পষ্ট ফযিলত, যা প্রমাণ করে কোন আমলই জিহাদের সমতুল্য নয়। -ফাতহুল বারী, ৬/৫

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট যে, ইমানের পরে সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর পথে জিহাদ, উলামায়ে কেলাম বলেন, হাদিস মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা, এবং

হাদিসের সব বিষয়ই ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও কুরআনে আছে
(দেখুন, আসসুন্নাহ ও মাকানা তুহা, মুস্তফা সিবায়ী, ১/৩৮৬
আলমাকতাবুল ইসলামী) এ দৃষ্টিকোন থেকে আমরা বলতে
পারি এ হাদিসসমূহ আল্লাহর তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী
থেকেই সংগ্রহীত,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
(التوبة: 19)

তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদে
হারাম আবাদ করাকে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান
আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতুল্য মনে করো?
তারা তো আল্লাহর তায়ালার নিকট সমান নয়। আল্লাহ
তায়লা জালেমদের হেদায়াত দান করেন না। যারা ইমান
এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে
জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর তায়ালার নিকট উচ্চ মর্যাদার
অধিকারী, এবং তারাই তো সফলকাম। -সূরা তাওবা, ১৯-
২০

এ আয়াতের শানে নুযুলে ইমাম মুসলিম নোমান বিন বাশির
রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: « ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمار المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله: فزجرهم عمر، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة أجعلتم { دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم (1879). الآية إلى آخرها {الأخر

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্বারের নিকট বসা ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইসলাম আনার পর হাজিদের পানি পান করানো ব্যতীত অন্য কোন আমল না করলেও আমার কোন পরোয়া নেই, আরেকজন বললো, ইসলাম আনার পর মসজিদুল হারাম আবাদ করা ব্যতীত অন্য কোন আমল না করলেও আমার কোন পরোয়া নেই। তৃতীয় একব্যক্তি বললো, তোমরা যে আমলগুলোর কথা বলছো তার চেয়ে জিহাদ উত্তম, উমর রাযিআল্লাহু আনহু তাদের ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্বারের নিকট উচ্চস্বরে কথা বলো না, বরং জুমুআর নামাযের পর আমি রাসুলের নিকট তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো সেই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবো। তখন আল্লাহ তায়াল্লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

‘তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারাম আবাদ করাকে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতুল্য মনে করো? (সুরা তাওবা, আয়াত, ১৯) -সহিহ মুসলিম, ১৮৭৯

মসজিদুল হারাম আবাদ করা দ্বারা তাতে ইবাদত বন্দেগী করা এবং তার নির্মানকাজ করা উভয়টিই উদ্দেশ্য, (দেখুন, আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস, ১/৭৫ দারু ইহয়াউত তুরাস, তাফসীরে সা’দী, পৃ: ৩৩১ মুয়াসসাসাতুল রিসালা) সুতরাং আয়াত থেকে স্পষ্ট যে নফল হজে গিয়ে মসজিদুল হারামে ইবাদত বন্দেগী করার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাই উত্তম, এজন্যই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমানের পর জিহাদকে সর্বোত্তম আমল বলেছেন এবং হজকে তৃতীয় স্তরে রেখেছেন।

বরং শাইখুত তাফসীর শাইখ আহমদ আলী লাহোরী বলেন, এ আয়াতে তাদের অযুহাত খন্ডন করা হয়েছে, যারা মসজিদ (ও খানকায়) বসে বসে ইবাদত ও যিকির করার বাহানায় জিহাদ থেকে বিরত থাকে। -ফাতহুল জাওয়াদ, ২/৪৩১

জিহাদের ফযিলত সম্বলিত এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসের কারণে সাহাবায়ে কেলামও জিহাদকে সর্বোত্তম

আমল মনে করতেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور».

হে আল্লাহর রাসূল আমরা জানি জিহাদ সর্বোত্তম আমল, আমরা কি জিহাদ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজে মাবরুর, (মকবুল হজ) -সহিহ বুখারী, ১৫২০

সুনানে নাসায়ীর বর্ণণায় আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার প্রশ্নটি এভাবে এসেছে,

:إني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. (سنن النسائي 2628)

আমি তো কুরআনে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল দেখছি না ...। -সুনানে নাসায়ী, ২৬২৮

উল্লেখিত হাদিসটির ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ (ম্: ৮৫২ হি.) বলেন,

أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة، وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: «فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد». اختلف في ضبط (لكن) فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة، قال القاسبي وهو الذي تميل إليه نفسي، وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج، وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. (ط. دار الفكر 3/382): (فتح الباري)

অর্থাৎ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, (জিহাদ সর্বোত্তম আমল) কেননা কুরআন-সুন্নাহয় এর অসংখ্য ফযিলত এসেছে। ... অধিকাংশ বর্ণণায় لكن শব্দের কাফ অক্ষরে পেশ এসেছে (অর্থাৎ لِكُنَّ তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ)

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قالوا: ولا الجهاد؟ «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟» قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم (969): يرجع بشيء». صحيح البخاري

জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনে আমল করা অন্য কোন দিনে আমল করার সমতুল্য নয়। সাহাবায়ে কেলাম প্রশ্ন করলেন,

(অন্য দিনগুলিতে) জিহাদ করাও কি এই দশদিনে আমল করার সমতুল্য নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, জিহাদও নয়, তবে যে ব্যক্তি নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং জানমাল কোন কিছুই না নিয়েই ফিরে আসে (সেই ব্যক্তির আমল জিলহজের আমলের চেয়েও উত্তম)। -সহিহ বুখারী, ৯৬৯

হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم. (فتح الباري:
(2/460

*সাহাবীদের এই প্রশ্ন প্রমাণ করে তাদের নিকট জিহাদ সর্বোত্তম হওয়ার বিষয়টি সুবিদিত ছিল। -ফাতহুল বারী,
২/৪৬০*

ইমাম ইবনে কুদামা আলামাকদিসী রহিমাল্লাহু (মৃ: ৬২০ হি.) তার বিখ্যাত ফিকহগ্রন্থ আলমুগনীতে বলেন,

قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئاً من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له أمر العدو؟ فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء. ومباشرة القتال بنفسه

أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو، هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأبي عمل أفضل منه، الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم

আছরম বলেন, ইমাম আহমদ বলেন, জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন নেকআমল আছে বলে আমার জানা নেই। ফযল বিন যিয়াদ বলেন, ইমাম আহমদের নিকট শত্রুর আলোচনা করা হলে তিনি কেদে ফেলেন এবং বলেন জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন নেক আমল নেই, ইমাম আহমদের আরেকজন ছাত্র তার থেকে বর্ণনা করেন, শত্রুর মোকাবেলার সমতুল্য কোন ইবাদত নেই, স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সর্বোত্তম আমল, যারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে তারাই ইসলামের প্রতিরক্ষা করে, সুতরাং জিহাদে চেয়ে উত্তম আমল আর কি হতে পারে? মানুষ নিরাপদে থাকে, অথচ মুজাহিদরা ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এরপর ইবনে কুদামা জিহাদের ফযীলতে কিছু হাদিস উল্লেখ করার পরে বলেন,

ولأن الجهاد بذل المهجة والمال، ونفعه يعم المسلمين كلهم، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، ذكرهم وأنثاهم، وغيره لا يساويه في نفعه وخطره، فلا يساويه في فضله وأجره (المغني: 9/199 ط. مكتبة القاهرة)

তাছাড়া জিহাদে জানমাল ব্যয় করতে হয় এবং জিহাদের

ফায়োদা ছোট-বড়, দুর্বল-সবল, পুরুষ-মহিলা, সকল মুসলিম ভোগ করে, অন্য কোন আমল উপকারীতা ও বুঁকির ক্ষেত্রে জিহাদের সমান নয়, সুতরাং ফযিলত ও সওয়াবের ক্ষেত্রেও তা জিহাদের সমতুল্য হবে না (কেননা হাদিসে এসেছে, সওয়াব পরিমাণ নির্ধারিত হয় ইবাদত আদায়ে কষ্ট-ক্লেশের পরিমাণ অনুপাতে, সহিহ বুখারী, ১৭৮৬ সহিহ মুসলিম, ১২১১)। -আলমুগনী, ৯/১৯৯

সহিহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহিমাল্লাহ (মৃ: ৬৫৬ হি.) বলেন,

وقد حصل من مجموع هذه الأحاديث: أن الجهاد أفضل من جميع العبادات العملية، ولا شك في هذا عند تعيينه على كل مكلف يقدر عليه، كما كان في أول الإسلام، وكما قد تعين في هذه الأزمان؛ إذ قد استولى على المسلمين أهل الكفر والطغيان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (المفهم لما أشكل من) هـ 1417: تلخيص كتاب مسلم: 3/712 ط. دار ابن كثير

এই সকল হাদিস থেকে বুঝা যায়, জিহাদ সকল আমলী ইবাদাতের চেয়ে উত্তম, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সুরতে জিহাদই সর্বোত্তম আমল, যেমন ইসলামের সূচনালগ্নে জিহাদ ফরযে আইন ছিল, এবং বর্তমান যমানায়ও জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে, যেহেতু মুসলিমদের উপর কাফেররা প্রভাব বিস্তার করেছে। -

আল্লাহ তায়ালা ইমাম কুরতুবীর উপর লাখো রহমত বর্ষণ করুন, তিনি সপ্তম হিজরীতেই কাফেরদের গলাবা ও বিজয়ের কারণে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। অথচ তখন কাফেররা অল্প কিছু মুসলিম ভূমিই দখল করতে পেরেছিল। হয়, তিনি যদি আজকের অবস্থা দেখতেন, যখন পৃথিবীর সব মুসলিম ভূমিই কাফেরদের অধীন, মুসলিম ভূমিগুলোর দালাল শাসকেরা কাফেরদের আঞ্জাবহ, তাহলে না জানি তিনি কি ফতোয়াই দিতেন।

২৬.দরসুল হাদিস; জিহাদ পরিত্যাগের শাস্তি; লাঞ্ছনা ও
যিল্লতি

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ،
فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا
بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَنْخَلَهُ اللَّهُ الذَّلَّ». صحیح البخاری: 2321

আবু উমামা বাহেলী রাযিআল্লাহু আনহু একদিন লাঙ্গল ও
চাষাবাদের কিছু যন্ত্রপাতি দেখতে পান, তখন তিনি বলেন,
আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
যে জাতির ঘরেই এই জিনিষগুলো প্রবেশ করে তাদেরকেই

আল্লাহ তায়ালা লাঞ্চিত করেন। -সহিহ বুখারী, ২৩২১।

ইমাম সারাখসী রহিমাল্লাহ (মৃ: ৪৮৩ হি.) বলেন,

المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب البقر
المبسوط: (.وقعدوا عن الجهاد كر عليهم عدوهم فجعلوهم أذلة
10/83 ط. دار المعرفة

হাদিসের অর্থ হলো যখন মুসলিমরা চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত
থাকবে, গাভীর লেজের পেছনে পড়ে থাকবে এবং জিহাদ
পরিত্যাগ করবে তখন শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করবে
এবং তাদের লাঞ্চিত-অপদস্থ করবে। -মাবসুতে সারাখসী,
১০/৮৩

ইমাম ইবনুল হুমাম রহিমাল্লাহ (মৃ: ৮৬১ হি.) ও হেদায়ার
শরাহ ফাতহুল কাদীরে হাদিসের এই ব্যাখাই করেছেন, তিনি
বলেন,

ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه (
الخراج لما قلنا)، وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي الخراج
وكانوا يؤدون خراجها، فدل على جواز الشراء، وأخذ الخراج،
وأدائه للمسلم من غير كراهة) ... لا كما يقول بعض المتقشفة -
رحمه الله - عليهم ورحمنا بهم من كراهة ذلك؛ لما روي «أنه

- عليه الصلاة والسلام - رأى شيئاً من آلات الحرّاة فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا». ظنا منهم أن الذل بالتزام الخراج، وليس كذلك، بل المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر عليهم عدوهم فجعلوهم (دار الفكر. أذلة. (فتح القدير: 6/40 ط

মুসলিমের জন্য যিম্মীর জমি ক্রয় করা জায়েয এবং মুসলিম তা ক্রয় করলে তার কাছে কর উসুল করা হবে, কেননা সাহাবায়ে কেলাম যিম্মীদের জমি ক্রয় করেছেন এবং তারা এর করও আদায় করতেন, ... কিছু যাহেদ-সূফী কর আদায় করা মাকরুহ বলেন, তাদের ধারণা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাদিসে চাষাবাদকে লাঞ্ছনার কারণ বলেছেন, এখানে লাঞ্ছনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কর আদায় করা, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়, বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো যখন মুসলিমরা চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, গাভীর লেজের পেছনে পড়ে থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করবে এবং তাদের লাঞ্ছিত-অপদস্থ করবে। ফাতহুল কাদীর, ৬/৪০

মোল্লা আলী কারী রহিমাল্লাহ (মৃ: ১০১৪ হি.) বলেন,

ظاهر هذا الحديث أن الزراعة تورث المذلة، وليس كذلك لأن الزراعة مستحبة لأن فيها نفعاً للناس، بل إنما قال ذلك لئلا يشتغل الصحابة بالعمارات وبترك الجهاد فيغلب عليهم الكفار.

وأي ذل أشد من ذلك. (مرقاة المفاتيح: 5/1989 ط. دار الفكر:

(1422

হাদিসের বাহ্যিক বিবরণ থেকে বুঝা যায়, চাষাবাদ লাঞ্ছনার কারণ, কিন্তু বিষয়টি এমন নয়, কেননা চাষাবাদের দ্বারা মানুষের উপকার হয়, তাই তা মুস্তাহাব, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন, যেন সাহাবায়ে কেবলমাত্র চাষাবাদে লিপ্ত হয়ে জিহাদ পরিত্যাগ না করেন, অন্যথায় কাফেররা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে, আর এর চেয়ে বড় যিন্ধতি আর কি হতে পারে?। -

মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/১৯৮৯

সারাখসী রহিমাহুল্লাহ মাবসূত গ্রন্থে (৩০/২৫৯) হাদিসের এই ব্যাখ্যার সমর্থনে ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটি পেশ করেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ،
وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى
دِينِكُمْ.

أخرجه أحمد (4825) وأبو داود: (3462) وقال الشيخ أحمد
شاکر في تعليقه على مسند أحمد: (4/414 ط. دار الحديث) :
إسناده صحيح. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة
(1/42 ط. مكتبة المعارف) : (حديث صحيح لمجموع طرقه)

وَحَسَنَهُ الشَّيْخُ شَعِيبُ الْأَرْنَؤُوطُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى سَنَنِ أَبِي دَاوُدَ:
(5/333 ط. دار الرسالة العالمية)

যখন তোমরা বাইয়ে ঈনা (একপ্রকার নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়) করবে, গাভীর লেজ ধরে (হালচাষে) ব্যস্ত থাকবে, চাম্বাবাদ নিয়েই তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তায়াল্লা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, এবং তোমরা দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত লাঞ্ছনা হতে মুক্তি দিবেন না। -সুনানে আবু দাউদ, ৩৪৬২ মুসনাদে আহমদ, ৪৮২৫ শায়েখ আহমদ শাকের ও শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাসান বলেছেন, (দেখুন, মুসনাদে আহমদ, তাহকীক, শায়েখ আহমদ শাকের, ৪/৪১৪; আসসিলসিলাতুস সহিহাহ, ১/৪২; সুনানে আবু দাউদ, তাহকীক, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৫/৩৩৩)

আকাবিরে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহিমাল্লাহু (মৃ: ১৩৪৬ হি.) ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুন্নর হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وأخذتم أذناب البقر) يريد به اشتغالهم بالزراع عن الجهاد (ورضيتم بالزراع، وتركتكم الجهاد، سلط الله عليكم ذللاً لا ينزعه) أي: الذل (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي: اعملوا على

ط. مركز 11/180). شريعة الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله
(الشيخ أبي الحسن الندوي: 1427 هـ)

‘গাভীর লেজ ধরে থাকবে’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ
পরিত্যাগ করে চাষাবাদে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।
‘তোমরা দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত লাঞ্ছনা হতে মুক্তি
দিবেন না’ অর্থাৎ যতদিন না তোমরা শরিয়ত অনুযায়ী
আমল করছো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করছো ততদিন
পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করবেন না।
-বজলুল মাজহুদ, ১১/১৮০

খেলাফতের দ্বায়িত্ব লাভের পর প্রদত্ত সর্বপ্রথম ভাষণে আবু
বকর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

لَا يَدْعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذَّلِّ، وَلَا تَنْشِيعُ
الْفَاجِسَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ. رواه ابن إسحاق في
السيرة، قال: وحدثني الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال:
لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على
المنبر، (ص: 718 ط. دار الكتب العلمية) وقال ابن كثير في
البداية والنهاية (5/248 ط. دار الفكر): وهذا إسناد صحيح

যে জাতিই জিহাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপরই লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন, আর যে জাতির মাঝেই অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাদের (নেককার ও বদকার সবাইকেই) ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন। - সীরাতে ইবনে ইসহাক, পৃ: ৭১৮, ইবনে কাসীর রহিমাল্লাহ (মৃ: ৭৭৪ হি.) আলবিদায়া ওয়াননিহায়াতে (৫/২৪৮) এই হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন।

জিহাদ পরিত্যাগের উপর কুরআন শরিফের একাধিক আয়াতেও শাস্তির ধমকী এসেছে, ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

যদি তোমাদের পিতা-পুত্র, ভাই-স্ত্রী ও (অন্যান্য) আত্মীয়স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, এবং ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশংকা তোমরা করো, এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান তোমাদের নিকট আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে পছন্দনীয় হয় তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না তিনি তোমাদের ব্যাপারে

ফায়সালা করেন, আল্লাহ তায়লা ফাসেকদের হেদয়াত দান করেন না। সূরা তাওবা, আয়াত, ২৪

আয়াতের ব্যখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর রহিমাল্লাহ বলেন,

(فتربصوا) أي: فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: (حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) وروى الإمام أحمد، وأبو داود -واللفظ له -من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون، عن أبي جناب، عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله، والله (تفسير القرآن العظيم: 4/124 ط. دار طيبة: 1420 ه). أعلم

অর্থাৎ ‘তোমরা শাস্তির অপেক্ষা করো’, এরপর তিনি উপরে বর্ণিত ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদিস ‘যখন তোমরা বাইয়ে ঙ্গনা করবে ...’ বর্ণনা করেন, যা প্রমাণ করে এখানে আল্লাহ তায়লার বাণী ‘তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের নিকট পরাজয় ও লাঞ্ছনা-যিল্লতি। (দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪/১২৪)

গত শতাব্দীর বরেণ্য আলেম আবু যুহরা মিসরী রহিমাহুল্লাহ
(মৃ: ১৩৯৪ হি.) বলেন,

فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) أَي تَرَقَّبُوا، حَتَّى تَنْزِلَ الْمَذْلَةُ)
إن استرخيتم تحت ظل النعيم. (زهرة التفسير: 6/3263 ط.
(دار الفكر العربي)

অর্থাৎ যদি তোমরা (জিহাদ ছেড়ে দিয়ে) আরাম আয়েশে
থাকতেই পছন্দ করো, তাহলে যিহাদ ও লাঞ্ছনার শিকার
হওয়ার অপেক্ষা করো। (যুহরাতুত তাফাসীর, ৬/৩২৬৩)

অন্য আয়াতে এসেছে,

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ
شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য
জাতি নিয়ে আসবেন। তোমরা তার কোনই ক্ষতিই করতে
পারবে না। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। -সূরা তাওবা,
আয়াত, ৯

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭১ হি.) বলেন,

قال ابن العربي: العذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدو
وبالنار في الآخرة. (تفسير القرطبي: 8/142 ط. دار الكتب
المصرية: 1384هـ)

ইবনুল আরবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে
দুনিয়াতে কাফেররা (মুসলিমদের উপর) চড়াও হওয়া এবং
আখেরাতে আগুনের দ্বারা। -তাফসীরে কুরতুবী, ৮/১৪২

আল্লামা শানকীতী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১৩৯৩ হি.) বলেন,

الظاهر أن هذا العذاب شاملٌ لعذاب الدنيا {يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}
وعذاب الآخرة، لأن التكاسل عن مقاومة الأعداء في دار الدنيا
من أسباب عذاب الدنيا؛ لأنه يُضْعِفُ المسلمين ويقوي أعداءهم
فيُهينونهم في قعر بيوتهم كما هو واقع الآن؛ لأن المسلمين، أو
من يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من جهة
الكفرة، يظهدونهم، ويظلمونهم، ويقتلونهم، ويتحكمون في
خيرات بلادهم، وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد
وإعلاء كلمة الله (جلَّ وعلا). (العذب التميُّز من مجالس
الشفِيطِي في التفسير: 5/509 دار عالم الفوائد: 1426 هـ)

আয়াতে আযাব দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়জগতের শাস্তি
উদ্দেশ্য, কেননা শত্রুর মোকাবেলা না করলে মুসলমানরা
দূর্বল হয়ে যাবে, শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে যাবে, ফলে তারা
মুসলিমভূমিতে এসে তাদের লাঞ্চিত-অপদস্থ করবে, যেমনটা

বর্তমানে ঘটছে, মুসলিমরা কিংবা (বলা ভালো) মুসলিম নামধারী লোকেরা (চাই ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক যতই দুর্বল হোক) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাফেরদের হাতে আযাব ভোগ করছে, কাফেররা তাদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাদের হত্যা ও বন্দী করছে এবং তাদের সম্পদ লুট করছে, এই সবকিছুই জিহাদ পরিত্যাগের কারণে মুসলমানদের দুনিয়াবী শাস্তি। (আলআযবুন নামির, ৫/৫০৯)

এখানে লক্ষ্যনীয় হলো, হাদিসে জিহাদ পরিত্যাগ ও লাঞ্ছনাকে অঙ্গঅঙ্গিভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ উম্মাহ যখনই জিহাদ ছেড়ে দিবে তখনই তার ভাগ্যাকাশ লাঞ্ছনার কালোমেঘে ছেয়ে যাবে, যদিও শক্তি না থাকা, ইমাম না থাকা বা এ জাতীয় শত বাহনায় সে জিহাদ পরিত্যাগ করে। সুতরাং প্রিয় পাঠক, আমাদের সামনে শুধু দুটি পথই রয়েছে, হাদিসের বর্ণণা অনুযায়ী তৃতীয় এমন কোন পদ্ধতি নেই যার মাধ্যমে আমরা জিহাদও করবো না আবার সম্মান মর্যাদার সাথেও জীবনযাপন করতে পারবো, সুতরাং আপনি চিন্তা করুন, কোনটি বেছে নিবেন,

১. শক্তি না থাকার অজুহাতে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন, না শক্তি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন?

২. মুসলমানদের জন্য শক্তি অর্জনের গুরুত্ব তো বর্ণনা করবেন কিন্তু সাথে সাথেই এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে যাবেন, নাকি নিজেরাও যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করবেন?

৩. জিহাদের পূর্বে আত্মশুদ্ধি কিংবা আকিদার পরিশুদ্ধি করতে হবে, এ কথা বলবেন না জিহাদের মাধ্যমেই এবং জিহাদের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি ও আকিদার পরিশুদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাবেন?

৪. ইমাম নেই বলে জিহাদ করা যাবে না, একথা বলবেন, না ইমাম না থাকলে দলগঠন করে একজনকে ইমাম বা আমির বানিয়ে নিবেন এবং প্রস্তুতি অর্জনের পর আমিরের অধীনে জিহাদ শুরু করবেন?

যদি প্রথমটা করা হয় তাহলে হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের লাঞ্ছনা কখনোই ঘুচবে না, দুঃখদূর্দশার এই ঘোর অমানিশা কিছুতেই কাটবে না। আর যদি দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা হয় তাহলে সম্মান ও মর্যাদার দিকে আমাদের পথচলা শুরু হবে, এবং ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমাদের হারানো গৌরব ফিরে আসবে, এটাই আল্লাহর তায়ালার ওয়াদা, আল্লাহ তায়াল্লা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
 (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
 وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
 وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ
 وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ (12) عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ

হে ইমানদারগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার
 সন্ধান দিবো যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি
 দিবে, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ইমান আনবে
 এবং আল্লাহর রাস্তায় জানমাল দিয়ে জিহাদ করবে, এটাই
 তোমাদের জন্য উত্তম, (হায়) যদি তোমরা তা জানতে,
 আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন,
 তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে যার তলদেশ দিয়ে
 নহর প্রবাহিত হবে, এবং (প্রবেশ করাবেন) চিরস্থায়ী
 জান্নাতের উৎকৃষ্ট বাসস্থানে। এটাই মহা সফলতা। এবং
 তোমাদের দান করবেন এমন একটি নেয়ামত যা তোমরা
 (খুবই) পছন্দ করো, (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য
 এবং অত্যাঙ্গন বিজয়। -সূরা সফ, ১০-১২

২৭.সহিহ হাদিসের আলোকে ইমাম মাহদীর পরিচয়

ইমাম মাহদীর নাম

عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه (3573): اسمي». رواه الترمذي (2230) وأحمد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على مسند أحمد (494/3): إسناده صحيح وقال الإمام أبو بكر بن العربي في عارضة الأحمدي 9/ 77 بعد أن ذكر عدة أحاديث في المهدي وصفته وأنه من ولد فاطمة: والذي يصح من هذا كله أنه يملكها رجل من أهل بيته يواطئ اسمه اسمه

وأورد الإمام القرطبي في التذكرة ص 701 حديث أنس بن مالك الذي أخرجه ابن ماجه (4039) وفيه: «ولا المهدي إلا والأحاديث عن النبي صلى : عيسى ابن مريم» ثم ضعفه، وقال الله عليه وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم لها دونه

ونقل القرطبي في التذكرة ص 701 عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم السجستاني الأبري قوله: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روايتها عن المصطفى يعني المهدي، وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً، يخرج مع عيسى عليه السلام، فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه. وأبو الحسن الأبري هذا وصفه الحافظ الذهبي في

السير 299/16 بقوله: الإمام الحافظ محدث سجستان بعد ابن
حبان.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 254/8:
الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة،
رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود
وغيره.

وكذلك قال تلميذه الإمام ابن القيم في المنار المنيف...ص
148: (كذا في تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط على سنن أبي
داود: 339/6)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না
আমার পরিবার হতে একজন বাদশাহ হবে, **যার নাম আমার
নামের সাথে মিলবে।** -সুনানে তিরমিযি, ২২৩০ মুসনাদে
আহমদ, ৩৫৭৩

হাদিসের মান:-

ইমাম তিরমিযি, ইবনুল আরবী, কুরতুবী, ইবনে তাইমিয়াহ,
ইবনুল কাইয়িম এবং শায়েখ আহমদ শাকের হাদিসটিকে
সহিহ বলেছেন। বরং হাফেয আবুল হাসান সিজিস্তানী
বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে
মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, মাহদীর আগমণ ঘটবে,
সে আহলে বাইত থেকে হবে, সাত বছর রাজত্ব করবে,

যমিনকে আদল-ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দিবে।” (সুনানে তিরমিযি, ২২৩০ আরেযাতুল আহওয়ায়ী, ৯/৭৭
 আততায়কিরাহ, পৃ: ৭০১ মিনহাজুস সুনাহ, ৮/২৫৪
 আলমানারুল মুনিফ, পৃ: ১৪৩ ও ১৪৬ সুনানে আবী দাউদের
 টীকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৬/৩৩৯)

পিতার নাম

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 لَوْ لَمْ يَتَّقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمَ وَاحِدٍ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ «: وسلم، قال
 اليومَ حتى يبعثَ اللهُ فيه رجلاً مِنِّي - أو من أهل بيتي -
 يواطئ اسمُه اسمي، واسمُ أبيه اسمُ أبي، يملأ الأرضَ قِسْطاً
 رواه أبو داود: (4282). «وعدلاً، كما مُلئت ظُلماً وجوراً
 (337): وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود(6)
 صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن
 أبي النجود- فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
 فطر: هو ابن خليفة، وزائدة: هو ابن قدامة، وسفيان: هو
 الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان ... وقال ابن الجوزي في
 العلل المتناهية 861/2: إسناده حسن. وفي المهدي أحاديث
 صالحة الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يخرج مني
 يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه -رجل، -ويقال: من أهل بيتي
 (.... اسم أبي

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যদি দুনিয়ার মাত্র একদিনও বাকী থাকে, তবুও আল্লাহ তায়ালা সেদিনকে দীর্ঘ করতে থাকবেন, যতক্ষণ না তিনি আমার পরিবার হতে একজন বাদশাহ বানাবেন, যার নাম হবে আমার নামের মত আর তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামের মত। সে যমিনকে আদল ও ইনসাফে পূর্ণ করে দিবে, যে রূপ তা অন্যায়- অবিচারে পূর্ণ ছিল।” -সুনানে আবী দাউদ, ৪২৮২; ৫/২১৫ ইসলামী ফাউন্ডেশন।

হাদিসের মান:- ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনুল কাইয়িম, যাহাবী আলবানী রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। ইমাম ইবনুল জাওযী, শুয়াইব আরনাউত আব্দুল আলীম বুস্তাভী হাসান বলেছেন। (আলইলালুল মুতানাহিয়াহ, ২/৮৬১ মিনহাজুস সুন্নাহ, ৮/২৫৫ আলমানারুল মুনিফ, পৃ: ১৪৩ ও ১৪৬ সুনানে আবী দাউদের টীকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৬/৩৩৭ আলমাহদিউল মুত্তাযার, পৃ: ২৭৮)

ইমাম মাহদীর বংশপরিচয়

أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وأخرجه أبو. «وسلم يقول: «المهديُّ من عترتي من ولدِ فاطمةَ داود (4284) وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود: إسناده ضعيف لضعف زياد بن بيان. قال البخاري في تاريخه

الكبير " 3 / 346: في إسناده نظر، ونقله العقيلي في "الضعفاء"
2 / 76 عن البخاري وأقره عليه. وقال الذهبي في "المغني في
الضعفاء": لم يصح خبره. وقال المنذري في "اختصار السنن"
6 / 160 بعد أن نقل كلام العقيلي: وقال غيره: وهو كلام
معروف من كلام سعيد بن المسيب، والظاهر أن زياد بن بيان
وهم في رفعه

وقال الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري : سكت عليه
الحاكم والذهبي في التلخيص، وهو حديث صحيح أو حسن، كما
حكم به الحُقَاط، إذ رجاله كلهم عدول أثبات، أما سعيد بن
المسيب فلا تسأل عن جلالته وإتقانه، فإنه رأس علماء التابعيين
وفردهم وفاضلهم وفقههم

وأما علي بن نفيل فقد أتى عليه أبو المليح، وقال أبو حاتم لا
بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يتكلم فيه أحد بجرح
وأما زياد بن بيان فقال البخاري: قال عبد الغفار: حَدَّثَنَا أَبُو
المليح سمع زياد بْن بيان - وذكر من فضله، وقال النسائي:
ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان شيخا
صالحا.

وأما أبو المليح الرقي فقال أحمد بن حنبل: ثقة، ضابط لحديثه،
صدوق، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال الدارقطني: ثقة. وكذا
قال عثمان الدارمي عن ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات
وأما من دونه فلا نطيل بذكر توثيقهم لكثرتهم وشهرة الحديث
عن أبي المليح، فقد رواه عنه عبد الله بن جعفر الرقي، وأحمد
بن عبد الملك وعبد الله بن صالح، وعمرو بن خالد الحراني،
فحال سند الحديث على ما ترى من الجودة والصحة، فالحديث
صحيح خصوصا مع انضمام الشواهد. (إبراز الوهم المكنون من

(كلام ابن خلدون، ص: 500 ط. الترقي، 1347 هـ).
وقال الشيخ عبد العليم البستوي بعد تفصيل طرق الحديث وبيان
إذا نظرنا في رجال الإسناد لا نرى فيهم : أحوال رجاله
مغمزا، فكلهم من الذين يُحتج بأمثالهم لدى العلماء، أما كلام
العقيلي في علي بن نفيل بأنه لا يُتابع عليه، فلا حاجة إلى
المتابعة. وأما قول البخاري في ترجمة زياد بن بيان: في إسناده
نظر فليس جرحا في الراوي، ولكنه يرى النظر في إسناده
الرواية، ولم أجد من فسّر وجه النظر هذا سوى ما أشار إليه
ابن الجوزي من أنه كلام معروف لسعيد بن المسيب، وأن زياد
بن بيان وهم في رفعه، وذكره المنذري أيضا دون أن يسمي
قائله، وسيأتي كلام ابن المسيب هذا في الآثار (برقم 17)
وإسناده بمجموع طرقه حسن. إذن فليس هو أحسن حالا من هذا
الإسناد حتى يكون علة لتضعيف هذا الحديث. ولا منافاة بين
الروایتين، فهذا القول من الأمور الغيبية التي لا يقول بها ابن
المسيب رحمه الله إلا إذا كان عنده خبر صحيح من الصادق
الأمين صلى الله عليه وسلم، لا سيما، وأن ابن المسيب لم
يعرف برواية الإسرائيليات، ولا الأخذ من أهل الكتاب، فقول
ابن المسيب جاء جوابا على استفسار عن المهدي، وهل هو حق
أم لا، فأوضح بأنه حق، وأنه من ولد فاطمة. وجاءت رواية
علي بن نفيل هذه، فبينت الخبر الذي اعتمد عليه ابن المسيب
رحمه الله في فتاواه، فكلا الخبرين عنه صحيح، والله أعلم
وقد سكت عليه أبو داود، وقال في رسالته إلى أهل مكة: وما لم
أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصلح من بعض
وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة
وقال العريزي في السراج المنير بشرح الجامع الصغير إسناده
حسن.

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: هذا ... سند جيد رجاله كلهم ثقات، وله شواهد كثيرة

উম্মে সালামাহ রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “**মাহ্দি আমার ঔরসজাত ফাতেমার বংশ থেকে হবে।**” -সুনানে আবু দাউদ, ৫/২১৫।

হাদিসের মান:- ইমাম বুখারী, হাফেয উকাইলী, মুনযিরি ও যাহাবী রহ. হাদিসটিকে যযীফ বলেছেন। শুয়াইব আরনাউত এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। আল্লামা সিরাজুদ্দীন আযীযী (মৃ: ১০৭০) শায়েখ আহমদ গুমারী, (মৃ: ১৩৮০) শায়েখ আলবানী ও ডক্টর আব্দুল আলীম বুস্তাভী (মৃ: ১৪৩৭ হি.) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। -ইবরাযুল ওয়াহমিল মাকনুন, পৃ: ৫০০ আলমাহদিউল মুস্তাযার, পৃ: ২২৬

মূলত হাদিসটির সনদ হাসান পর্যায়ে। তবে হাদিসের রাবীদের মাঝে মতভেদ হয়েছে। কেউ হাদিসটিকে রাসুলের হাদিস রূপে বর্ণনা করেছেন। কেউ তাবেয়ী সাঈদ বিন মুসাইয়িবের নিজস্ব বাণীরূপে। তবে হাদিসটি রাসুলের বাণী হোক বা সাঈদ বিন মুসাইয়িবের সর্বাঙ্গায় তা দলিল হওয়ার যোগ্য। কেননা ইমাম মাহ্দি ফাতেমা রাযি. এর সন্তান হওয়া ভবিষ্যতের বিষয়, যা সাঈদ বিন মুসাইয়িব আন্দায়ে ধারণা করে বলতে পারেন না। বরং এ বিষয়টি

তিনি কোন সাহাবীর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে জেনেছেন এটাই স্বাভাবিক। তবে তিনি সূত্র উল্লেখ না করে এবং রাসূলের বাণী হিসেবে না বলে এমনিই বলে দিয়েছেন। তো এটা বেশি থেকে বেশি সাঈদ বিন মুসাইয়িবের মুরসাল হাদিস হবে। আর সাঈদ বিন মুসাইয়িবের মুরসাল হাদিসও মুহাদ্দিসদের নিকট গ্রহণযোগ্য। (দেখুন, আততামহিদ, হাফেয ইবনে আব্দুল বার, ১/৩০ আলমুকিয়াহ, হাফেয যাহাবী, পৃ: ৩৮ কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস, যফর আহমদ উসমানী, পৃ: ১৫১)

ডক্টর আব্দুল আলীম বুস্তাভী রহ. বলেন, সাইদ বিন মুসাইয়িব কখনো এটাকে রাসূলের হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন আর কখনো তার নিকট মাহদির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি সূত্র উল্লেখ না করে ফতোয়াপ্রদানের মত বলে দিয়েছেন যে, মাহদী ফাতেমার সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। তাই যারা হাদিসটিকে রাসূলের হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাদেরটাও সহিহ আর যারা সাইদ বিন মুসাইয়িবের নিজস্ব বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাদেরটাও সহিহ। -আলমাহদিউল মুস্তাযার, পৃ: ২২৬

তাছাড়া মাহদির ফাতেমী বা সাইয়েদ হওয়ার বিষয়ে

একাধিক হাদিস রয়েছে যার দ্বারা আলোচ্য হাদিসটি আরো শক্তিশালী হয়, সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي إسحاق، قال: قال علي، ونظر إلى ابنه الحسن، فقال: إن ابني هذا سيد، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق، ولا يشبهه في الخلق، ثم ذكر قصة: يملأ: وقال الشيخ شيعب (4290) الأرض عدلا. رواه أبو داود، إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي داود فيه، وأبو : (6/347) إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- رأى عليا رضي الله عنه، ولم تثبت له رواية عنه.

وأخرجه نعيم بن حماد في "الفتن" (1113) عن غير واحد، عن إسماعيل بن عياش، عن حدثه، عن محمد بن جعفر، عن علي بن أبي طالب. وفي إسناده مبهمون كما ترى.

আবু ইসহাক সাবিয়ী রহ. বলেন, আলী রাযি. হাসান রাযি.

এর দিকে তাকিয়ে বলেন, “আমার এ ছেলেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়েদ-নেতা বলেছেন।

অচিরেই তার বংশে এমন একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে যার

নাম হবে তোমাদের নবীর অনুরূপ। স্বভাব-চরিত্রে সে

নবীজির মতই হবে তবে তার দৈহিক গড়ন নবীজি থেকে

ভিন্ন হবে। সে আদল-ইনসায়ফ দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করে

দিবে।” -সুনানে আবু দাউদ, ৪২৯০; ৫/২১৭

হাদিসের মান:- হাদিসের রাবী আবু ইসহাক সাবিয়ী রহ. আলী রাযি. এর যমানা পাননি। তাই হাদিসটি মুরসাল। আর আবু ইসহাক সাবিয়ীর মুরসাল হাদিস মুহাদ্দিসদের নিকট যয়ীফ। তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ হাদিসের সনদে তার শায়খের নাম উল্লেখ করেননি। বরং এভাবে বলেছেন, حدثت عن هارون بن المغيرة অর্থাৎ আমার নিকট হারুন বিন মুগীরার সূত্রে হাদিস বয়ান করা হয়েছে। (দেখুন, সুনানে আবু দাউদ, তাহকীক শায়েখ শুয়াইব ৬/৪৪৭ তাদরীবুল রাবী, হাফেয সুয়ুতী, ১/২৩২)

তবে হাদিসটি পূর্বে বর্ণিত হাদিসটির শাহেদ-সমর্থক হওয়ার যোগ্য। সুতরাং এ হাদিস ও পূর্বের হাদিস মিলিয়ে প্রমাণ হয়, ইমাম মাহদী সাইয়েদ বা আলী রাযি. এর বংশধর হবেন। কিন্তু যেহেতু হাদিসটি এককভাবে যয়ীফ তাই এই হাদিসের আলোকে ইমাম মাহদী হাসান রাযি. এর বংশধর হওয়া প্রমাণিত হয় না। বরং তিনি হুসাইন রাযি. এর বংশধরও হতে পারেন। যদিও ইমাম ইবনুল কাইয়িম ও ইবনে কাসীর রহ. উল্লিখিত হাদিসের কারণে বলেছেন, “মাহদী হাসান রাযি. এর বংশধর হবেন।” আর এর অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে ইবনুল কাইয়িম উল্লেখ করেছেন, “যেহেতু হাসান রাযি. আখেরাতের সওয়াবের আশায় মুসলমানদের ঐক্যের লক্ষ্যে খেলাফতের দাবী ত্যাগ

করেছিলেন, তাই আল্লাহ তায়াল্লা এর প্রতিদান স্বরূপ তার বংশধরদের মধ্য হতে মাহদীকে রাজত্ব দান করবেন। এটাই আল্লাহ তায়াল্লার রীতি, যে আল্লাহর জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাকে বা তার বংশধরকে তার চেয়ে উত্তম জিনিষ প্রদান করেন।” -দেখুন, আলমানারুল মুনিফ, পৃ: ১৫১ আননিহায়া ফিল ফিতান, 1/55

ইমাম মাহদীর দৈহিক গড়ন

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلي الجبهة، أفتى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين. أخرجه أبو داود. (4285) وقال الشيخ شعيب في تعليقه على مسند جيد بهذا اللفظ، سهل بن تمام بن بزيع (-) : (342 : 6) أحمد وعمران القطان - وهو ابن داور- - وإن كان ضعيفا- متابع حسن الحديث، وقد روي حديثه هذا من وجه آخر حسن في المتابعات، سيأتي ذكره. وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في "العلل المتناهية" (1443) ثم قال 2 / 861: لا بأس به. وجود إسناد ابن قيم الجوزية في "المنار المنيف" ص 144. وصححه عمران ضعيف. قلنا: :الحاكم 4 / 557، لكن تعقبه الذهبي بقوله أبو .القول قول من قوى هذا الحديث، لأن عمران لم ينفرد به نضرة: هو المنذر ابن مالك بن قطعة وأخرجه الطبراني في "غريب الحديث" 2 / 191 من طريق من طريق عمرو بن عاصم 557 / عفان بن مسلم، والحاكم 4

الكلابي، كلاهما عن عمران القطان، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد (11130)، وأبو يعلى (1128)، وابن حبان (6826) من طريق مطر بن طهمان الوراق، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري. وهذا إسناد حسن في المتابعات قال الراقم عفا الله عنه: أما عمران القطان فقد قال الشيخ عوامة في تعليقه على مصنف ابن أبي شيبة (21 : 81) : (وثقه غير واحد، ومشاها آخرون، وممن وثقه تلميذه عفان ...) وقال الحافظ في التقريب (ص 429) : (صدوق يهم، و رمي برأى الخوارج). وقد حسن الترمذي حديثه في الجامع : (3934) وكذا حسن الحافظ حديثه في فتح الباري كما في تحفة اللبيب: (1) : (610) وقال الحافظ في التلخيص (4/335 ط. القرطبة) فيه مقال إلا أنه ليس بمتروك، وقد استشهد به البخاري، وصح له ابن (حبان والحاكم).

وقال أيضا في تهذيب التهذيب : (8 : 131 ط. دائرة المعارف هـ) قال عمرو بن علي: (كان ابن مهدي 1326 النظامية، الهند، يحدث عنه وكان يحيى لا يحدث عنه، وقد ذكره يحيى يوما أرجوه أن : فأحسن الثناء عليه. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه يكون صالح الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بشيء لم يرو عنه يحيى بن سعيد. وقال الأجري، عن أبي داود: هو من أصحاب الحسن وما سمعت إلا خيرا، وقال مرة: ضعيف أفتي في أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن بفتوى شديدة فيها سفك الدماء، قال: وقدّم أبو داود أبا هلال الراسبي عليه تقدما شديدا. وقال النسائي: ضعيف. وقال

ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وذكره بن حبان في الثقات.
 كان حروريا، كان يرى :وقال أبو المنهال، عن يزيد بن زريع
 ... السيف على أهل القبلة. قلت: في قوله: حروريا نظر
 وقال الساجي: صدوق وثقه عفان وقال الترمذي: قال
 وقال ابن شاهين في الثقات: كان من البخاري صدوق بهم
 أخص الناس بقتادة. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم.
 (وقال العجلي: بصري ثقة. وقال الحاكم: صدوق
 وأما مطر بن طهمان فقد قال عنه الذهبي في السير (10 : 54
 الإمام، الزاهد، الصادق، ... حدث عنه: شعبة، (: ط. الرسالة)
 ... وغيره أتقن للرواية منه، ولا ينحط حديثه عن رتبة الحسن.
 صالح. وقال أحمد بن :وقد احتج به: مسلم. قال يحيى بن معين
 حنبل: هو في عطاء ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وكان
 يحيى القطان يشبهه مطرا بابن أبي ليلي في سوء الحفظ.
 وقال محمد بن سعد: فيه ضعف في الحديث. (سير أعلام
 النبلاء: 59/1)

قلت: فحديث كل منهما يصلح للاحتجاج به عند الانفراد، فكيف
 إذا اجتماعا، وقوى أحدهما الآخر؟

আবু সাইদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মাহদী আমার বংশোদ্ভূত হবে,
 তার কপাল প্রশস্ত ও নাক উঁচু হবে। সে জুলুম-অত্যাচারে
 ভরা পৃথিবীকে আদল-ইনসার দ্বারা পূর্ণ করে দিবে। সে
 সাত বছর রাজত্ব করবে।” সুনানে আবু দাউদ, ৪২৮৫;
 ৫/২১৬ মুসনাদে আহমদ, ১১১৩০

হাদিসের মান:- ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, “হাদিসটিতে কোন সমস্যা নেই”। ইবনুল কাইয়িম হাদিসটির সনদকে ‘জাইয়িদ’ বলেছেন, যা সহিহ ও হাসানের মধ্যবর্তী স্তর। শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

হাকেম রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেন, হাফেয যাহাবী তার উপর আপত্তি করে বলেন, “হাদিসের একজন রাবী ইমরান যয়ীফ,” কিন্তু শায়েখ শুয়াইব আরনাউত যাহাবী রহ. এর মত খন্ডন করে বলেন, “হাদিসটি ইমরানের একক বর্ণণা নয় বরং মুসনাদে আহমদে ‘মাতর বিন তহমানে’র সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে” খোদ ইমাম যাহাবীই বলেছেন, “তার হাদিস হাসান পর্যায়ের, এর চেয়ে নিচের নয়”। ইমাম মুসলিম তার হাদিস সহিহ মুসলিমে এনেছেন। তাছাড়া ইমরানও একেবারে যয়ীফ নন, অনেক ইমাম তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাই তার হাদিস হাসান পর্যায়ের হবে, বিশেষকরে যদি তা তার একক বর্ণণা না হয়। (দেখুন, সিয়রু আলামীন নুবালা, ১০/৫৯ তাহযীবুত তাহযীব, হাফেয ইবনে হযার, ৮/১৩১ সুনানে আবু দাউদের টীকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার টিকা, শায়েখ আওয়ামা, ২১/৮১)

একটি প্রশ্ন:- এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ইমাম
মাহদীর পরিচয় সংক্রান্ত সহিহ হাদিস তো একেবারেই অল্প।
তাহলে এত সামান্য আলামতের ভিত্তিতে আমরা তাকে
কিভাবে চিনবো?

উত্তর:- আল্লাহ তায়ালা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে
তাকে চিনার দ্বায়িত্ব আমাদের দেননি। বরং আল্লাহ ও তার
রাসুল আমাদের যা আদেশ দিয়েছেন আমরা তা পালন
করলেই ইমাম মাহদীকে পেয়ে যাবো এবং তার দলে শরিক
হতে পারবো ইনশাআল্লাহ। নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى
يوم القيامة»، قال: « فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه
وسلم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على
بعض أمراء تكرمه الله هذه الأمة». صحيح مسلم: (156)
مسند (1031) صحيح ابن حبان (6819) المنتقى لابن الجارود
(14720) : أحمد

“আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা হকের
উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে।
পরিশেষে ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। তখন
ঐ দলের আমীর বলবেন, আসুন, নামাযে আপনি ইমামতি

করুন। ইসা আলাইহিস সালাম উত্তর দিবেন, না, আপনারাই একে অপরের ইমাম, এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এই উম্মাহর জন্য (বিশেষ) সম্মাননা।” -সহিহ মুসলিম, ৬৮১৯
সহিহ ইবনে জারুদ, ১০৩১ সহিহ ইবনে হিব্বান, ৬৮১৯
মুসনাতে আহমদ, ১৪৭২০

হাদিস থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে, যারা সর্বদা জিহাদ চালিয়ে যাবে তারাই ইমাম মাহদীর বাহিনী হবে, ইমাম মাহদী তাদের আমির হবেন। আর এখন যারা জিহাদী দলগুলোকে বাতিল মনে করে জিহাদ থেকে বিরত থাকছে, আল্লাহ-রাসুলের আদেশ অমান্য করে ঘরে বসে ইমাম মাহদীর আগমনের প্রতীক্ষা করছে, বস্তুত তারা ইমাম মাহদী আসলেও তার ব্যাপারে সংশয় পোষণ করবে। তাদের সবচেয়ে বড় সংশয় তো এটাই হবে যে, ইমাম মাহদী কিভাবে আলকায়েদা-তালেবানের মত ভ্রান্ত দলের আমীর হতে পারেন?!

এখন যেমন কাফের ও তাদের দোসর মুরতাদ সরকাররা জিহাদে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে, শরিয়তের সমস্ত দলিল উপেক্ষা করে দরবারী আলেমরা জিহাদ বিরোধী ফতোয়া দিচ্ছে, তখনও যে পরিস্থিতি এরচেয়ে ভিন্ন হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই।

তাছাড়া তারা যে ভাবে, মাহদীর আগমণ ঘটলেই তারা মুহুর্তে দুনিয়ার সমস্ত ঝই-ঝামেলা পেছনে ফেলে মাহদীর সাহায্যার্থে ছুটে যাবে, এটা অলীক কল্পনা বৈ কিছুই নয়। জিহাদ কোন চাট্টিখানি বিষয় নয়। জিহাদের জন্য মানসিক-শারিরীক-বস্তুগত সব ধরনের পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। যারা জিহাদের আকাংক্ষা পোষণ করার দাবী করে কিন্তু এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করে না কুরআনের সাক্ষ্য অনুযায়ী তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً (سورة التوبة : 46)

‘যদি যুদ্ধে যাবার ইচ্ছাই তাদের থাকতো তবে এর জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতো’। -সূরা তাওবাহ,

৪৬

আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহিমাল্লাহু বলেন,

قوله تعالى : {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم (دار عالم الكتب. التخلف. (تفسير القرطبي 156/8 ط

‘অর্থাৎ যদি তারা যুদ্ধ করতে চাইতো তাহলে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। সুতরাং তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ না করা, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকার দলিল’।

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قال الله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} فذمهم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو. اهـ

‘আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি তারা যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে এর জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ করতো।” যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন’। -আহকামুল কুরআন: ৩/৮৯

আল্লামা সা’দী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১৩৭৬ হি.) বলেন,

يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأن أعدارهم التي اعتذروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه، وسعى في أسباب الخروج، ثم منعه مانع شرعي، فهذا الذي يعذر

{ وأما هؤلاء المنافقون ف {لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} { أي: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا له عدة، علم أنهم ما أرادوا الخروج. (تفسير السعدي: 339 ط. مؤسسة الرسالة)

আল্লাহ তায়ালা (এ আয়াতে) বলছেন, (তাবুক) যুদ্ধে যে মুনাফিকরা অংশগ্রহণ করেনি, তাদের থেকে এমন কিছু

আলামত প্রকাশ পেয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায় তাদের জিহাদে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না এবং যেসব বাহানা তারা পেশ করেছে সেগুলো একেবারেই অবাস্তব। কেননা প্রকৃত উযর হলো ঐ প্রতিবন্ধকতা যা বান্দা তার সাধ্যের সবটুকু করার পর এবং যুদ্ধে যাওয়ার আসবাব-মাধ্যম অর্জনের চেষ্টা করার পর দেখা দেয়, সুতরাং এমন উযর যার রয়েছে তাকে ক্ষমা করা যায়। পক্ষান্তরে এই মুনাফিকরা যদি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা রাখতো তাহলে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতো এবং যেসব আসবাব গ্রহণ করা তাদের জন্য সম্ভব ছিলো সেগুলো গ্রহণ করতো। কিন্তু যেহেতু তারা যুদ্ধের জন্য কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ করেনি তো বোঝা গেলো তাদের যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা একদমই ছিলো না। -তফসীরে সা'দী: পৃ: ৩৩৯

আল্লামা শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أي: لو كانوا صادقين فيما يدعونهم- ويخبرونك به- من أنهم يريدون الجهاد معك، ولكن لم يكن معهم من العدة للجهاد ما يحتاج إليه، لما تركوا إعداد العدة، وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون، فمعنى هذا الكلام: أنهم لم يريدوا الخروج أصلاً، وإلا استعدوا للغزو. (فتح القدير: 2/522 ط. دار الوفاء)

“যদি তারা যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করতো তবে যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। অর্থাৎ তারা যে দাবী করে যে,
 আপনার সাথে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা তাদের ছিল, কিন্তু তাদের
 নিকট যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজনীয় আসবাব ছিল না,- যদি
 তারা তাদের এই দাবীতে সত্যবাদী হতো তাহলে যুদ্ধের
 সময় আসার পূর্বেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতো,
 যেমনিভাবে মুমিনরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সুতরাং
 এ বাক্যের অর্থ হলো, তাদের যুদ্ধে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই
 ছিলো না। নতুবা তারা প্রস্তুতিগ্রহণ করতো। -ফাতহুল
 কাদীর, ২/৫২২

সুনানে নাসায়ীর হাদিসে এসেছে, মানুষ যখন জিহাদে
 যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন শয়তান তাকে নানা কুমন্ত্রণা দিতে
 থাকে। শয়তান বলে, তুমি জিহাদে যাবে? এতে তোমার কত
 কষ্ট হবে, তোমার ধনসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তুমি যুদ্ধে
 নিহত হবে তখন তোমার (প্রাণপ্রিয়) স্ত্রীকে অন্য কেউ বিয়ে
 করবে, তোমার (কষ্টার্জিত) ধনসম্পদ অন্যরা ভাগাভাগি করে
 নিয়ে যাবে। -সুনানে নাসায়ী, ৩১৩৪

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জিহাদের পথে অবিচল রাখুন,
 রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসের উপর
 আমল করার তাওফিক দান করুন,

فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف

“কাফেরদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হলে অবিচল থেকে (যুদ্ধ করো)। আর জেনে রাখো, জান্নাত তো তরবারীর ছায়াতলেই।” -সহিহ বুখারী, ২৯৬৬ সহিহ মুসলিম, ১৭৪২

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّثْ أَفْئَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّثْ أَفْئَامَنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

আজ এখানেই শেষ করছি, আগামীতে ইনশাআল্লাহ সহিহ হাদিসের আলোকে ইমাম মাহদীর রাজত্বকাল এবং তার রাজত্বকালে মুসলমানদের বিজয়, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য এবং অন্যান্য বিবরণ তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

২৮. ইমাম মাহদীর ব্যাপারে প্রচলিত যযীফ ও মওযু হাদিস

ইমাম মাহদীর পরিচয় সম্পর্কে ইতিপূর্বে সহিহ হাদিসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইমাম মাহদীর পরিচয়ের ব্যাপারে সহিহ হাদিসের পাশাপাশি অনেক যযীফ ও মওযু হাদিস রয়েছে, সেগুলো আমাদের জানার তেমন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কাযী ইবরাহীম সাহেব ইউটিউবে সেগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা করছেন। তিনি মুহাদ্দিস-

আলেম হওয়ার কারণে মানুষ তার উপর আস্থা রেখে সেগুলো বিশ্বাসও করছে। অথচ সে হাদিসগুলো শুধু যয়ীফই নয়। বরং তার কিছু কিছু মওযু ও জাল। কাযী ইবরাহীম সাহেবকে আমরা অন্যান্য আহলে হাদিসের তুলনায় ভালো মনে করি। তিনি রফয়ে ইদাইনের মত মুস্তাহাব বিষয়াদী নিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেন না। তাছাড়া কেউই যখন ফিতানের ব্যাপারে তেমন চর্চা করছে না তখন তার চর্চাও প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি যদি হাদিসগুলো একটু যাচাই করে বলতেন তাহলে আর আমাদের এ কষ্ট করার প্রয়োজন হতো না। যাই হোক এখন যেহেতু তিনি এ ধরনের যয়ীফ ও মওযু হাদিসগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাই এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। নতুবা যখন ইমাম মাহদী আসবে এবং তার সাথে যয়ীফ ও মওযু হাদিসে বর্ণিত আলামতগুলো মিলবে না তখন হয়তো আমরা অনেকেই বিভ্রান্তির শিকার হবো। তাই ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের হাদিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবস্থল

حدثنا محمد بن تمام بن صالح الحمصي، بحمص، حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيير، عن كثير بن مرة،

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخرج المهدي من قرية باليمن يقال لها: كرعة، وعلى رأسه عمامة فيها مناد ينادي: ألا إن هذا المهدي فاتبعوه". (معجم ابن المقرئ، رقم: 90)

وعبد الوهاب بن الضحاك متهم، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: (2/679) دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - : (لبنان الطبعة: الأولى، 1382 هـ

كذبه أبو حاتم. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال الدارقطني: (وقال البخاري: عنده عجائب). وذكر له الذهبي. منكر الحديث هذا الحديث من أوأبده

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মাহদী ইয়ামানের 'কারআ' নামক গ্রাম হতে বের হবেন। তার মাথায় একটি পাগড়ী থাকবে, যে পাগড়ীতে একজন ফেরেশতা থাকবেন, তিনি ঘোষণা করতে থাকবেন, শোন! এই হলো মাহদী, তোমরা তার অনুসরণ করো। (মু'জামু ইবনুল মুকরী, ৯০ কাযী ইবরাহীম সাহেবের বয়ানের লিংক:-

<https://www.youtube.com/watch?v=IHMrGZZlcf>

A এর ২ : ৩৪ মিনিট)

হাদিসের মান:- হাদিসটা নিতান্তই দুর্বল, বরং মওযু, হাদিসের একজন রাবী আব্দুল ওয়াহাব বিন যাহহাক

সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ বলেন, সে জাল হাদিস বানায়। ইমাম আবু হাতেম রাযী তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। নাসায়ী মাতরুক বা পরিত্যাজ্য বলেছেন, দারাকুতনী ‘মুনকারুল হাদিস’ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, সে বহু আশ্চর্যজনক হাদিস বর্ণনা করেছে। হাফেয যাহাবী বলেন, এই হাদিসটা তার বিরল হাদিসসমূহের একটা। (দেখুন, মিয়ানুল ইতিদাল, ২/৬৭৯ যখিরাতুল হুফফায়, ৫/২৭৮১ দারুস সালাফ, রিয়ায, প্রথম প্রকাশনা, ১৪১৬ আলমওসুয়্যাহ ফি আহাদিসিল মাহদী আযযয়ীফাহ ওয়াল মওয়ুয়্যাহ, ডক্টর আব্দুল আলীম বস্তাভী, পৃ: ৩৭৬ দারু ইবনি হাযম, বৈরুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশনা, ১৪২০ হি.)

ইমাম মাহদী ২০২১ সালে আসবেন

حدثنا الوليد بن مسلم، عن صدقة بن خالد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن مجاهد، عن تبيع، قال: «سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعوذ عائذ آخر، فإن أدركته (935) فلا تغزونه، فإنه جيش الخسف». رواه نعيم بن الحما

তুবায়্ট রহ. বলেন, অচিরেই মক্কায় একব্যক্তি আশ্রয়গ্রহণ করে নিহত হবে। অতপর মানুষ কিছুকাল অবস্থান করবে। এরপর আরেকব্যক্তি আশ্রয়গ্রহণ করবে। যদি তুমি তাকে

পাও তবে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করো না। কেননা তার
বিপক্ষের বাহিনীকেই যমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। -

আলফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৩৫

(<https://www.youtube.com/watch?v=dn3-gMOuSMg> এর 9 : 25 মিনিট)

হাদিসের মান:- এটা কোন হাদিস নয়। বরং তুবাঈ বিন
আমের রহ. এর বক্তব্য যিনি একজন তাবেয়ী। তিনি ইহুদী
আলেম কাবে' আহবারের সৎপুত্র, তাঁর কাছে ইলম শিখেন,
তাওরাত-ইঞ্জীল ইত্যাদি আসমানী কিতাব পড়েন। তাই তার
বাণীকে হাদিসরূপে বিশ্বাস করার সুযোগ নেই। কেননা হতে
পারে তিনি এ বিষয়গুলো কাবে আহবারের কাছে শিখিছেন
কিংবা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবাদীতে পেয়েছেন। সুতরাং
এগুলো ইসরাঈলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত, যার ব্যাপারে হাদিসের
নির্দেশনা হলো,

« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا: [أمننا بالله وما
(صحيح البخاري: 7362). أنزل إلينا وما أنزل إليكم]

“তোমরা আহলে কিতাবদের বর্ণিত বিষয়াদী সত্যায়ন না
করা এবং মিথ্যা প্রতিপন্নও করো না। বরং তোমরা বলো,
‘আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি এবং সেই বাণীর

প্রতিও যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও যা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে।” -সহিহ বুখারী, ৭৩৬২ আততাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, ৭/৩১৪ সিয়রু আলামীন নুবালা, ৭/৪৬৬

উল্লেখ্য, হাদিস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী, কোন সাহাবী বা তাবেয়ী ভবিষ্যতের বিষয়াদী বর্ণনা করলে, সেটা তারা কোন না কোন ভাবে রাসূলের তরফ থেকেই জেনেছেন বলে ধরা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত হলো, যেই সাহাবী বা তাবেয়ী তা বর্ণনা করছেন, তিনি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী না হতে হবে। আর তুবাঈ রহ. যেহেতু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনায় প্রসিদ্ধ তাই তিনি ভবিষ্যতের কোন বিষয়াদী বর্ণনা করলেও সেটা রাসূলের মাধ্যমে না জেনে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে জেনেছেন বলেই বিবেচিত হবে। -দেখুন, নুযহাতুন নযর, হাফেয ইবনে হযার, পৃ: ১১০৬/ মাতবাতুল মিসবাহ, দিমাশক, তৃতীয় প্রকাশনা, ১৪২১ হি.; ফাতহুল মুগিস, হাফেয সাখাভী, ১/১৬৪ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, প্রথম প্রকাশনা, ১৪২৪ হি.

চলবে ইনশাআল্লাহ

২৯.সহিহ হাদিসের আলোকে ইমাম মাহদীর আমলে মুসলমানদের বিজয়, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি

ইমাম মাহদীর রাজত্বকাল

سليمان بن عبيد، ثنا أبو الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال
يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج
الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم
رواه الحاكم .«الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حجبا
(8673) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند
ط. الرسالة) : (قال الحاكم: هذا حديث صحيح (17/255)أحمد
الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. قلنا: رجاله جميعهم
ثقات، وسليمان بن عبيد: وهو السلمي البصري، وثقه ابن معين،
وقال .(وقال أبو حاتم صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: 711) : (هذا سند
صحيح رجاله ثقات). وقال الدكتور عبد العليم البستوي في
(المهدي المنتظر (ص165 ط. دار ابن حزم) : (إسناده صحيح

আবু সাইদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার উম্মতের শেষভাগে
মাহদীর আগমন ঘটবে। তার যমানায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে।

যমিনে সর্বোচ্চ মাত্রায় ফলন হবে। তিনি (মানুষকে)
সমানভাবে সম্পদ প্রদান করবেন। (তার শাসনামলে) গবাদি
পশুর সংখ্যা বেড়ে যাবে হবে। উম্মাহর বংশবৃদ্ধি ঘটবে।
তিনি সাত বা আট বছর রাজত্ব করবেন।” -মুত্তাদরাকে
হাকেম, ৮৬৭৩

হাদিসের মান:- হাফেয আবু আব্দুল্লাহ হাকেম, হাফেয
যাহাবী, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, শায়েখ আলবানী ও ডক্টর
আব্দুল আলীম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। -মুসনাদে
আহমদের টীকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ১৭/২৫৫
সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ, ৭১১ আলমাহদিউল
মুত্তাযার, পৃ: ১৬৫

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحاً» بالسوية بين الناس» قال: «: فقال له رجل: ما صحاحاً؟ قال «ويملاً الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر منادياً فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول أنا، فيقول: انت السدان - يعني الخازن - فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له: احث حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجنس فيرده فلا يقبل: أمة محمد نفساً، أو عجز عني ما وسعهم؟ قال

منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه، فيكون كذلك سبع سنين - أو ثمان سنين، أو تسع سنين». رواه أحمد: (11326) وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (رقم: 12393) : (رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات). وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: 4001) : (رجاله ثقات رجال مسلم، غير العلاء بن بشير، وهو مجهول، كما في («التقريب»). لكن قد توبع على بعضه عند الحاكم قال الرافق عفا الله عنه: العلاء بن بشير قد وثَّقه ابن حبان، وقد حَقَّق الشيخ عوامة : أن توثيق ابن حبان معتبر مثل توثيق غيره من الأئمة، وأن ما اشتهر عنه أنه يوثق المجاهيلَ غير صحيح، بل منهجه في ذلك منهج غيره من المحدثين المتقدمين مثل يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وأبي داود وابن عدي وغيرهم، وهو أنهم يسبِّرون أحاديث الراوي، ثم يُوثِّقونه إذا لم يجدوا في أحاديثه ما يُستنكر. (راجع: تعليق الشيخ عوامة على (ط. دار القبلة 101 - 1/77: «المصنف» لابن أبي شيبة فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله لا سيما عند وجود المتابع والشاهد

আবু সাইদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি তোমাদের মাহদীর
সুসংবাদ দিচ্ছি। মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও অস্থিরতার
সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রেরণ করবেন। সে জুলুম-
অত্যাচারে ভরা দুনিয়াকে আদল-ইনসায়ফ দ্বারা পূর্ণ করে

দিবে। আসমান ও যমিনের অধিবাসী সকলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। সে সমভাবে সম্পদ বিলি করবে। (তার সময়কালে) আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর প্রাচুর্যতায় পূর্ণ করে দিবেন। তার আদল-ইনসারফ সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হবে। এমনকি ঘোষক ঘোষণা করবে, কারো সম্পদের প্রয়োজন আছে কি? তখন একব্যক্তি ব্যতীত কেউ উঠে দাঁড়াবে না। সে বলবে, আমার প্রয়োজন রয়েছে। ঘোষক বলবে, তুমি কোষাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে বলো, আমাকে সম্পদ প্রদান করার জন্য মাহদী তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে। কোষাধ্যক্ষ বলবে, তুমি হাত ভরে নাও। যখন সে কোষ ভরে সম্পদ নিয়ে তা কোলে রাখবে তখন সে অনুতপ্ত হয়ে বলবে, আমি তো উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সবচেয়ে লোভী। তারা যা করলো আমি কেন তা করতে পারলাম না। তখন সে সেই সম্পদ ফিরিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু তা গ্রহণ করা হবে না। বলা হবে, আমরা সম্পদ প্রদান করার পর তা ফেরত নেই না। **এমনিভাবে সাত, আট বা নয় বছর অতিবাহিত হবে।**” -মুসনাদে আহমদ, ১১৩২৬

হাদিসের মান:- হাফেয নুরুদ্দীন হাইসামী রহ. বলেছেন, হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। -মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১২৩৯৩

ইমাম মাহদীর শাসনামলে মুসলমানদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا، لا يعده عددا». صحيح مسلم (2914)

তোমাদের খলীফাদের মধ্যে একজন খলীফা এমন হবে, যে হাত ভরে ভরে দান করবে এবং মালের কোন গণনাই করবে না। -সহিহ মুসলিম, ২৯১৪ (৬/৩৯৫ ইফা.)

قال رسول الله صلى : عن أبي سعيد، وجابر بن عبد الله، قالوا الله عليه وسلم: «يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده». صحيح مسلم (2914)

শেষ যমানায় একজন খলীফা হবে। সে হাত ভরে ভরে সম্পদ বিলি করবে। গণনা করবে না। -সহিহ মুসলিম, ২৯১৪ (৬/৩৯৫ ইফা.)

عن زيد العمي، عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في أمتي المهدي، إن قصر فسبع وإلا فتسع، فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، تؤتى أكلها، ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ كدوس، فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ

رواه ابن ماجه (4083) وأحمد (11163) والترمذي مختصرا

(2232) وقال : (هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجامع عفا الله عنه؛ وفي إسناده زيد العمي، وهو ضعيف، ولكن يشهد له ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5406) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في أمتي المهدي، إن قصر فسبع وإلا فثمان وإلا فتسع، تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلها، يرسل السماء عليهم مدرارا، ولا تدخر الأرض شيئا من النبات، والمال كدوس، يقوم الرجل يقول: يا مهدي، أعطني، فيقول: خذ». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (رقم: 12411) : (رجاله ثقات).

وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود: (6 : 343 ط. دار الرسالة العالمية) : (زيد العمي ضعيف لكنه متابع) ثم ذكر حديث أبي سعيد المار آنفا عند الحاكم، ثم قال : (6 : 344) (ويشهد للفظ زيد العمي تماما حديث أبي هريرة عند البزار (3326 - كشف الأستار)، والطبراني في الأوسط (5406)، (وابن الجوزي في العلل المتناهية (1444) وإسناده حسن).

আবু সাইদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার উম্মাহর মাঝেই
মাহদীর আগমন ঘটবে। তিনি কমপক্ষে সাতবছর, অন্যথায়
নয় বছর রাজত্ব করবেন। তার আমলে আমার উম্মত এমন
সুখ-স্বচ্ছন্দে বসবাস করবে যে সুখ তারা ইতিপূর্বে কখনো
ভোগ করেনি। (ভূ-পৃষ্ঠের হাল এই হবে যে) তা সব ধরনের

ফলমূল উৎপন্ন করবে। কিছুই আটকে রাখবে না। ধন-সম্পদ স্তম্ভকৃত করা থাকবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে মাহদী! আমাকে দিন। মাহদী বলবেন, (যত ইচ্ছা) নিয়ে যাও।” -সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৮৩ (৩/৫৪১ ইফা.)
মুসনাদে আহমদ, ১১১৬৩ জামে’ তিরমিযি, ২২৩২

হাদিসের মান:- এই হাদিসটির একজন রাবী ‘যায়েদ আলআ’মা’ যয়ীফ, তবে মু’জামে তবরানী ও অন্যান্য গ্রন্থে আবু হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত একই অর্থবহ আরেকটি হাদিস রয়েছে। হাফেয নুরুদ্দীন হাইসামী ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত সেই হাদিসটির সনদকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাই সেই হাদিসের সাথে মিলে আমাদের আলোচ্য হাদিসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। -দেখুন, জামে তিরমিযি, ২২৩২ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাফেয হাইসামী, ১২৪১১ সুনানে আবু দাউদের টীকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৬/৩৪৩

ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়

عن حسان بن عطية، قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان، وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير عن

الهدنة قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر - أو قال: ذي رجل من أصحاب النبي - صلى - مخمر، الشك من أبي داود الله عليه وسلم -، فأثينا، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "استصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي ثلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة (رواه أبو داود، 4292) وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود : (6 : 351) : (إسناده صحيح) وزاد في فيأتونكم في ثمانين غاية، مع كل) : (16826) : رواية أحمد غاية عشرة) وقال الشيخ شعيب في تعليقه على مسند أحمد: (حديث صحيح).

وفي حديث طويل عن عوف بن مالك الأشجعي عند البخاري (3176) : (ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون بكم، فيسيرون إليكم في ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا).

হাসসান বিন আতিয়াহ রহ. বলেন, মাকহুল ও ইবনে আবু যাকারিয়া খালিদ বিন মা'দানের নিকট যান। আমিও তাদের সাথী হই। খালেদ আমাদেরকে জুবায়ের বিন নুফায়েরের সূত্রে সন্ধির ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করেন। (খালেদ বলেন) জুবায়ের (আমাকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, তুমি আমাদেরকে

নবীজির সাহাবী যু-মিখমারের কাছে নিয়ে চলো। তখন আমরা তার নিকট উপস্থিত হই এবং জুবায়ের তার নিকট সন্ধির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি, অচিরেই তোমরা রোমকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সন্ধি করবে এবং তোমরা ও তারা সম্মিলিত হয়ে অপর এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা সে যুদ্ধে বিজয়ী হবে, গণীমত লাভ করবে এবং নিরাপদে ফিরে এসে একটি টিলাবিশিষ্ট সবুজ-শ্যামল প্রসস্ত ভূমিতে অবতরণ করবে। তখন এক খৃষ্টান ক্রুশ উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে! এতে এক মুসলিম ক্ষীণ হয়ে ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে। তখন খৃষ্টানরা গান্ধারী করবে এবং বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবে। -সুনানে আবু দাউদ, ৪২৯২

সহিহ বুখারীতে আওফ বিন মালেক রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, “অতপর তোমাদের মাঝে এবং রোমান (খৃষ্টানদের) মাঝে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্পাদিত হবে। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উত্তোলন করে তোমাদের মোকাবিলায় আসবে, প্রত্যেক পতাকাতলে বার হাজার সৈন্য থাকবে।” -সহিহ বুখারী, ৩১৭৬

নোট:- এ হাদিসদ্বয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও তাতে কাফেরদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, (১২০০০ ৮০ = ৯৬০০০০ নয় লাখ ষাট হাজার অর্থাৎ প্রায় এক মিলিয়ন) তবে এ যুদ্ধে কারা বিজয়ী হবে সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। তবে আমরা সবাই জানি, সে যুদ্ধে বিজয় মুসলমানদেরই পদচুম্বন করবে। পরবর্তী হাদিসে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

عن أسير بن جابر، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، ف جاء رجل ليس له هجيري إلا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، قال: ففعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم، حتى لا يقسم ميراث، ولا يفرح بغنيمة، ثم قال: بيده هكذا - ونحاها نحو الشام - فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام، ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبية، فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، لا ترجع إلا غالبية، فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، لا ترجع إلا غالبية، فيقتلون حتى يمساوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، فإذا كان يوم الرابع، نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة - إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم ير مثلها - حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، فما يخلفهم حتى يخز ميتا، فيتعاد بنو الأب، كانوا مائة، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم، فبينما هم كذلك إذ

سمعوا ببأس، هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ، إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم، ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ - أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ -». صحيح مسلم (2899)

উসায়র বিন জাবের রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কুফা নগরীতে লাল উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হলো। এ সময় এক ব্যক্তি কুফায় আসলো। তার মুদ্রাদোষ ছিল কোন কিছু ঘটলেই সে এসে বলতো, ‘হে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ! কিয়ামত এসে গেছে!’ (তো এই উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা বায়ুর কারণেও সে অভ্যাস অনুযায়ী একই কথা বললো) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তার কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে এবং যতক্ষণ না লোক গণীমতে আনন্দিত হবে না। অতপর তিনি তার হস্ত দ্বারা শাম (সিরিয়া, জর্দান ও ফিলিস্তীন) এর প্রতি ইংগিত করে বললেন, আল্লাহর শত্রুরা জড়ো হবে মুসলামনদের সাথে লড়াই করার জন্য এবং মুসলমানগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হবে। (এ কথা শুনে আমি বললাম, (আল্লাহর শত্রু বলে) আপনার উদ্দেশ্য রোমান (খ্রীষ্টান) সম্প্রদায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তখন ভয়াবহ

যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলিম বাহিনী একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সামনে অগ্রসর হবে (এ সিদ্ধান্ত নিয়ে যে) জয়লাভ করা ব্যতিরেকে তারা পেছনে ফিরবে না। এরপর তাদের মাঝে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত হয়ে যাবে। অতপর উভয় পক্ষের সৈন্য জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই ফিরে আসবে। যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যে দলটি অগ্রে গিয়েছিলো তারা সকলেই শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী দিন মুসলিম বাহিনী মৃত্যুর জন্য একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা (সিদ্ধান্ত নিবে) বিজয় ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করবে না। এদিনও তাদের মাঝে মারাত্মক যুদ্ধ হবে। অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উভয় বাহিনী জয়লাভ করা ব্যতীতই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে আসবে। যে দলটি অগ্রে গিয়েছিলো তারা সকলেই শেষ হয়ে যাবে। তৃতীয় দিন পুনরায় মুসলমানগণ মৃত্যুর জন্য একটি বাহিনী পাঠাবে, যারা (সিদ্ধান্ত নিবে) বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না। সে দিন পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা। এ যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকবে। অবশেষে জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই উভয় দল ফিরে আসবে। তবে মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী সেনাদলটি শেষ হয়ে যাবে। এরপর চতুর্থ দিবসে অবশিষ্ট মুসলমানগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সম্মুখ পানে এগিয়ে যাবে। সেদিন কাফিরদের উপর আল্লাহ তায়ালা পরাজয়-চক্র চাপিয়ে দিবেন। অতঃপর এমন যুদ্ধ হবে যা পৃথিবীতে কেউ

কোন দিন দেখবেনা অথবা জীবনে কেউ কখনো দেখেনি। এমনকি (যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের) লাশের পাশ দিয়ে পাখী উড়ে যাবে। কিন্তু পাখী তাদেরকে অতিক্রম করার পূর্বেই মাটিতে পড়ে মরে যাবে। একশ মানুষ বিশিষ্ট একটি গোত্র থেকে মাত্র এক ব্যক্তি বেঁচে থাকবে। এমতাবস্থায় কেমন করে গনীমতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা আনন্দ উৎসব করবে এবং কেমন করে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করা হবে? মুসলমানগণ এ সময় আরেকটি ভয়াবহ বিপদের সংবাদ শুনতে পাবে। তাদের নিকট এ মর্মে একটি আওয়াজ আসবে যে, দাজ্জাল তাদের পেছনে তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জালের সংবাদ সংগ্রাহক দলের প্রতিটি ব্যক্তির নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের অশ্বের রং সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। এ পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সেদিন তারাই হবে। -সহিহ মুসলিম, ২৮৯৯ (৬/৩৮৩ ইফা.)

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের পর মুসলমানদের তুরস্ক পর্যন্ত
বিজয়াভিযান[

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة، من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول: قالت الروم المسلمون: لا، والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث، لا يفتنون أبدا فيفتنون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمهم، فإذا رآه عدو الله، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانداب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم (2897): دمه في حربته». صحيح مسلم

“কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না রোমান সেনাবাহিনী (সিরিয়ার) ‘আ’মাক’ বা ‘দাবিক’ নগরীতে অবতরণ করবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনা হতে এর পৃথিবীর সে যুগের সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। উভয় দল যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হবার পর রোমানরা বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোককে পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের বন্দী করেছে। আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো। তখন মুসলমানরা বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না। অবশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ

সৈন্য পালিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের তওবা কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে। তারা আল্লাহ তায়ালা নিকট সর্বোত্তম শহিদ বলে বিবেচিত হবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। তারা আর কখনো ফিতনার শিকার হবে না। তারাই ইস্তাম্বুল জয় করবে। তারা নিজেদের তরবারি যায়তুন গাছে বুলিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলমানরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা খবর (গুজব)। তারা শামে পৌঁছলে (বাস্তবেই) দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। যখন মুসলিম বাহিনী (দাজ্জালের সাথে) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধ হতে শুরু করবে তখন নামাযের জন্য ইকামাত দেওয়া হবে। অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং (সালাতে) তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাকে দেখামাত্রই বিগলিত হতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সে বিগলিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালামের হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা আলাইহিস সালামের বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন।” -সহিহ মুসলিম, ২৮৯৭

(৬/৩৮০ ইফা.)

হাদিসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা:-

এক. উল্লিখিত হাদিসসমূহে যদিও মাহদীর আলোচনা সুস্পষ্টরূপে নেই, তবে যেহেতু ইমাম মাহদী দাজ্জাল ও ইসা আলাইহিস সালামের পূর্বেই আসবেন, আর হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ইস্তাম্বুল বিজয়ের পরেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাকে হত্যার জন্য ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন, তাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে শামের ময়দানে খৃষ্টানদের পরাজিত করার পর তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিজয় পর্যন্ত যে ইমাম মাহদীই নেতৃত্ব দিবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ কারণেই হাদিসের ভাষ্যকারগণ শেষোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “হাদিসে বর্ণিত বাহিনী দ্বারা ইমাম মাহদীর বাহিনী উদ্দেশ্য।” (দেখুন, মিরকাত, মোল্লা আলী কারী, ৮/৩৪১২ দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম প্রকাশনা, ১৪২২ হি. বাজলুল মাজহুদ, ১২/৩৪২ মারকাযুয শায়েখ আবুল হাসান, ১৪২৭ হি. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৬/১৫২ দারুল কলম, প্রথম প্রকাশনা, ১৪২৭ হি. আলকাউকাবুল ওয়াহহাজ, দারুল মিনহাজ, প্রথম প্রকাশনা ১৪৩০ হি.)

দুই. শেষোক্ত হাদিসে যেহেতু বলা হয়েছে উক্ত বাহিনী মদীনা হতে বের হবে তাে এ থেকে বুঝে আসে, তখন মক্কা-

মদীনা সহ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই ইমাম মাহদীর শাসনাধীন থাকবে। হাদিস থেকে আমাদের এমনই বুঝে আসছে, তবে ভবিষ্যতের বিষয়াদী সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই তায়ালাই সঠিক জানেন।

তিন. “রোমানরা বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোককে পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের বন্দী করেছে।” হাদিসের এ অংশের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন, এর দ্বারা খৃষ্টানদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের ধোকা দিয়ে বিভক্ত করে ফেলা। তারা মুসলমানদের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করে বলবে, তোমাদের সাথে তো আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমাদের শত্রুতা তো তাদের সাথে যারা আমাদের দেশে হামলা করেছে এবং আমাদের লোকদের বন্দী করেছে। তোমরা তাদেরকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের কিছুই বলবো না। (দেখুন, মিরকাত, ৮/৩৪১২ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৬/১৫৪)

হাদিসের এ অংশটি আমাদের জন্য বড়ই শিক্ষণীয়। কেননা কাফেররা সবসময়ই মুসলমানদের বিভক্ত করার জন্য এ ধরনের চক্রান্ত করে আসছে, যেমন বর্তমানে কাফেররা নাদান মুসলমানদের সাথে ধোকাবাজী করে তাদের বুঝাচ্ছে,

‘তোমাদের সাথে তো আমাদের কোন শত্রুতা নেই।
আমাদের শত্রুতা তো শুধু জঙ্গীদের সাথে, যারা আমাদের
নিরাপত্তার জন্য হুমকি। আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ
করবো। তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না।’ বোকা
মুসলিমরা তাদের এসব কথা মেনে নিয়েছে। বরং আরো
একধাপ আগে বেড়ে তারাও এখন কাফেরদের সাথে
ভালোবাসা-সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীতে
শান্তি (?) প্রতিষ্ঠা করার দিবা-স্বপ্ন দেখছে। অথচ আল্লাহর
তায়াল্লা তাদের বারবার সতর্ক করে বলেছেন, ‘কাফেররা
কখনোই মুসলিমদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।’ ‘তারা সর্বদা
মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না
মুসলিমরা তাদের ধর্ম থেকে ফিরে যায়।’ ‘তারা চায়
তোমরাও কুফরী করো, যেমনিভাবে তারা কুফরী করেছে।’
‘তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোন ক্রটি করবে না।
তোমাদের কষ্টই তাদের পছন্দনীয়। তোমরা তাদের মহব্বত
করলেও তারা তোমাদের মহব্বত করে না।’ ‘সুযোগ পেলে
তারা তোমাদের কচুকাটা করবে। এমনকি তোমাদের
ব্যাপারে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন শান্তিচুক্তির
পরোয়াও করবে না। ওরা মিষ্টি মিষ্টি বুলি দিয়ে তোমাদের
মন ভুলায়, কিন্তু তাদের অন্তর তোমাদের মহব্বত করতে
অস্বীকার করে।’ (দেখুন, সূরা বাকারা, ১২০ ও ২১৭ সূরা
আলে ইমরান, ১১৭-১১৮ সূরা নিসা, ৮৯ সূরা তাওবাহ, ৮

সূরা মুমতাহিনাহ, ২)

হায়, আফসোস, মুসলমানরা এত সুস্পষ্ট আয়াতগুলো কিভাবে ভুলে গেলো? আল্লাহর শপথ! যদি কোন দিন এই জঙ্গীরা শেষ হয়ে যায়, তাহলে কাফেররা মুসলমানদের পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। হয়তো তারা কৌশল হিসেবে ধীরে ধীরে এগোবে। কারণ তাদের ভয় থাকবে, তাড়াছড়ো করলে মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে আবারো জঙ্গী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আজ হোক বা কাল, তারা মুসলমানদের হত্যা বা ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করবেই।

চার. এখানে হাদিসের ভাষ্যকারগণ একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, ইস্তাম্বুল তো বর্তমান তুরস্কের রাজধানী, ৮৫৭ হিজরীতে উসমানী খলীফা মুহাম্মদ আলফাতেহ তা বিজয় করেছেন, তখন থেকে এ পর্যন্ত তা মুসলিমদের হাতে রয়েছে, তাহলে পুনরায় তা বিজিত হওয়ার কি অর্থ?

এর উত্তরে আল্লামা তাকী উসমানী রহ. বলেছেন, কেয়ামতের পূর্বে পুনরায় ইস্তাম্বুল কাফেরদের হাতে চলে যাবে, তাই ইমাম মাহ্দী এসে তা বিজয় করবেন। (দেখুন, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৬/১৫৪)

আমাদের মতে হাদিসের এ ব্যাখ্যার পাশাপাশি সম্ভাব্য

আরেকটি ব্যাখ্যাও হতে পারে, তা হলো- যেহেতু তুরস্ক বর্তমানে সেক্যুলার আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এমনকি ইসলামী পার্টির নেতা এরদোগানও ঘোষণা দিয়েছে, তুরস্ক সেক্যুলার রাষ্ট্র। তাই সেক্যুলার ধর্ম অনুযায়ী সে মদ ও যিনার লাইসেন্স বহাল রেখেছে। সমকামিতার জন্য কওমে লুতকে ধ্বংসকারী মহান আল্লাহর সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে প্রকাশ্য সভায় সে ঘোষণা করেছে, “আমাদের সমকামীদের অধিকারের পক্ষে কথা বলতে হবে।” তাই হয়তো ইমাম মাহদী এসে এ ধরণের সেক্যুলার শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে ইস্তাম্বুল জয় করবেন। ইতিপূর্বেও ইউসুফ তাশফীন, ইমাদুদ্দীন যিঙ্কি, নুরুদ্দীন যিঙ্কি, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ও অন্যান্য ন্যায়পরায়ন মুসলিম শাসকগণ ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণার্থে জালেম ও ফাসেক শাসকদের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন। ইউসুফ বিন তাশফীন রহ. পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত স্পেনের শাসকদের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। নুরুদ্দীন যিঙ্কী রহ. কাফেরদের সাথে আতাতকারী শাসক মুজিরুদ্দীন আতরক থেকে দিমাশক ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। একই কারণে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. হালাব দখল করেছিলেন।(দেখুন, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ১১/১২৯ ; ১১/২০৫ ; ১২/২১৭ ; ১২/২৮৯ দারুল হাদিস)

তেমনিভাবে তালেবান মুজাহিদগণ সোভিয়েতদের সাথে

জিহাদকারী আফগান কমান্ডারদের থেকে জোরপূর্বক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন, যারা সর্বত্র জুলুম-চাদাবাজী ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। আফগানিস্তানের উলামায়ে কেরাম বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ তাদের এ কাজকে সমর্থন করেছিলেন। সুতরাং কাফেরদের আঞ্জাবহ দালাল ও মুরতাদ সেক্যুলার শাসকদের থেকে ইমাম মাহদী ক্ষমতা কেড়ে নিলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

পাঁচ. শেষোক্ত হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, **তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এতই ভয়াবহ হবে যে, ইমাম মাহদীর বাহিনী হতে একতৃতীয়াংশ পলায়ন করবে, যাদের তওবা কখনোই কবুল হবে না। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের হাদিসের এই অংশটি গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। যারা এখন জিহাদ করছেন বা জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদেরও সতর্ক থাকা উচিত, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। কারণ গুনাহ অনেক সময় জিহাদের ময়দান হতে পলায়নের কারণ হয়। উহদের যুদ্ধে যারা পলায়ন করেছিলেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,**

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ
(بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا) (سورة آل عمران : 155)

উভয় বাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের মধ্য

হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলো, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে কিছু কৃতকর্মের কারণে পদস্বলনে লিপ্ত করেছিলো। -সূরা আলে ইমরান, ১৫৫

তাই আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাঙ্গক চেষ্টা করবো। পাশাপাশি জিহাদের ময়দানে অটল থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের যে দোয়াগুলো শিখিয়েছেন সেগুলোও গুরুত্বের সাথে নিয়মিত করবো। নিচের দোয়াগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হবো ইনশাআল্লাহ,

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (سورة آل عمران: 147)

হে প্রভু! আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের দ্বারা আমাদের কার্যাবলীতে যে সীমালংঘন ঘটে গেছে তা ক্ষমা করে দিন। আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করুন। -সূরা আলে ইমরান, ১৪৭

رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ (سورة البقرة 250)

হে প্রভু! আমাদের সবরের গুণ ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখো আর কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করো। -সূরা বাকারা,

তেমনিভাবে সে মুসলিম ভাইদেরও ভেবে দেখা উচিত যারা ইমাম মাহদীর আসার অপেক্ষায় জিহাদ ও জিহাদের প্রস্তুতি হতে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন এবং জোরগলায় বলছেন, ইমাম মাহদীর আসলে আমরাও জিহাদ করবো। যদি মেনে নেই যে, ইমাম মাহদী আসলে আপনারা মুহুর্তে দুনিয়ার সব ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে, মাহদীর সাহায্যার্থে ছুটে যেতে পারবেন, কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন, কোন ধরণের পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতীত এভাবে জিহাদে গেলে যুদ্ধের ভয়াবহতায় আপনারা কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবেন। যে মাহদীর বাহিনী হতে এক তৃতীয়াংশ যোদ্ধা পলায়ন করবে আপনারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবার আশংকা নেই তো? আপনারা হয়তো মনে করছেন, মাহদী আসলেই ক্যারিশমাটিক ভাবে মুসলমানরা কোন বাধাবিপত্তি ব্যতীতই জয়ী হতে থাকবে। কিন্তু ইমাম মাহদীর ব্যাপারে এধরণের কোন অস্বাভাবিক কারামাত বা ক্যারিশমা আমরা সহিহ হাদিসে পাই না। বরং আমরা যে সহিহ হাদিসগুলো উল্লেখ করেছি, তা থেকে স্পষ্টরূপে বুঝে আসে যে, ইমাম মাহদী স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ করেই পৃথিবী জয় করবেন। এমনকি চারদিন পর্যন্ত তার অগ্রবর্তী বাহিনীর সবাই শহিদ হয়ে যাবে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় পুরো বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ

ময়দান ছেড়ে পালাবে। হাঁ, মুজেযা বা কারামাত শুরু হবে ইসা আলাইহিস সালামের অবতরণের পর, তিনি কাফেরদের দিকে তাকালেই তারা মরে সাফ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে জিহাদের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার গাইবী মদদ সবসময়ই থাকে, ইমাম মাহদীর সময়ও থাকবে, এখনোও রয়েছে, যদিও আপনারা বর্তমান মুজাহিদদের সাথে সংশ্লিষ্ট সে কারামাতগুলো বিশ্বাস করতে চান না।

৩০. গায়ওয়াতুল হিন্দ ও আমাদের দায়িত্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

গায়ওয়াতুল হিন্দ: আমাদের দায়িত্ব

কথিত আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের ক্ষমতায় হিন্দুত্ববাদী বিজেপির টানা দ্বিতীয়বারের মত ক্ষমতা পাওয়ায় হিন্দুদের আক্ষালন বহুগুণ বেড়ে গেছে। গত মেয়াদে যখন তারা ক্ষমতায় এসেছিল তখনই তাদেরকে মুসলিমদের কচুকাটা করে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নিয়ে অখণ্ড রাম রাজত্ব তৈরীর শ্লোগান দিতে দেখা গেছে। এটা শুধু তাদের

শ্লোগানই নয়, এটা তাদের রক্তে মিশ্রিত বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। তখনই, বরং তার বহু আগেই আমাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা সতর্ক হইনি। নিজেদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে ব্যস্ত থেকেছি। এখন যখন হিন্দুত্ববাদীদের কৃপাণ আমাদের শাহরগ স্পর্শ করছে তখনও আমরা বেঘোরে ঘুমাচ্ছি।

আমাদের উদাসিনতার এই সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে গেছে বহুদূর। দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসিয়ে দিয়েছে রাম রাজত্বের স্বপ্ন বাস্তবায়নকারী এদেশীয় দালালদের। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ইস্কন ভারতীয় দালাল-তাগুত সরকারের ছত্রছায়ায় নির্বিঘ্নে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। দালালির বিরোধীতা করে স্ট্যাটাস দেওয়ায় ভাই আবরার ফাহাদ রহ. কে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ইস্কন সদস্য মালাউন অমিত সাহার নেতৃত্বে, তারই রুমে। কিন্তু ভারতের পদলেহী হলুদ মিডিয়া এ হত্যাকাণ্ডে অমিত সাহার সম্পৃক্তির কথা বেমালুম চেপে যাচ্ছে, বরং তা অস্বীকার করছে। নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে ত্রিশ হাজার শিশুকে প্রকাশ্যে “হরে রাম, হরে কৃষ্ণ” পড়ানোর মত দৃষ্টতা দেখিয়েছে ইস্কনের হিন্দুত্ববাদীরা। সব মিলিয়ে তারা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে। ভারতে যেখানে সেখানে যখন তখন মুসলিম ভাইদের রক্ত

ঝরানো হচ্ছে, বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে।
বাংলাদেশের সীমান্তে বিনা অজুহাতে মুসলিম ভাইদের
পাখির মত নিশানা বানানো হচ্ছে। দেদারছে লুট করা হচ্ছে
মুসলমানের সম্পদ। এদেশে অবস্থানকারী হিন্দুরা প্রকাশ্যে
এদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য করার কথা বলছে।

প্রিয় ভাইয়েরা! এসবই নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে।
তাই আজ গাফলতের চাদর ছেড়ে জেগে উঠুন।
হিন্দুত্ববাদীদের লালিত স্বপ্নের পথে শক্ত প্রতিরোধ দাঁড়
করান। মোহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
চৌদ্দশ বছর আগে যে যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, যে
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে তিনি জাহান্নাম হতে মুক্তির
সনদ ঘোষণা করেছেন সে জানবাজ লোকদের দলে অন্তর্ভুক্ত
হয়ে যান।

এ ব্যাপারে নবীজির মুখ নিঃসৃত সে বাণীগুলো মনযোগ দিয়ে
দেখুন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

" عَصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ: عَصَابَةٌ تُغْرَوُ
" الْهِنْدُ، وَعَصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ "

“আমার উম্মতের দু’টি দলকে আল্লাহ তায়াল্লা জাহান্নাম
থেকে মুক্ত রাখবেন, তন্মধ্যে একটি দল হল, যারা হিন্দুস্তানে

যুদ্ধ করবে। আর অন্য দলটি হল, যারা ইসা ইবনু মারযাম আলাইহিস সালামের সাথে থাকবে”। -সুনানে নাসায়ী ৩১৭৫, মুসনাদে আহমাদ ২২৩৯৬ {শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।}

আরো ইরশাদ হয়েছে,

صلى الله عليه وسلم - عن أبي هريرة، قال: وعدنا رسول الله
- في غزوة الهند، فإن استشهدتُ كنتُ من خير الشهداء، وإن
رجعت فأنا أبو هريرة المحررة.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে
গায়ওয়াতুল হিন্দের ওয়াদা দিয়েছেন। আমি যদি তাতে
শহীদ হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।
আর আমি যদি গায়ী হয়ে ফিরে আসি তাহলে আমি হব
জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা। -সুনানে নাসায়ী
৩১৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৭১২৮ {শায়খ আহমদ শাকের
রহ. তাঁর তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদের টিকায়
হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন। দেখুন খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ৫৩২}

প্রিয় ভাই! মু'মিন জীবনের সবচে বড় পাওয়া জাহান্নাম হতে
মুক্তির সনদ যে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে

আজই তাদের দলভুক্ত হয়ে যান। পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। ময়লুম মুসলমানদের রক্তের প্রতিটি ফোটার বদলা নেওয়ার জন্য উঠে দাড়া। সকল মুসলিম ভাইবোনদের কানে এই জিহাদের আওয়াজ পৌঁছে দিন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সহায় হোন।

৩১. গায়ওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাননির্ণয় (তাসহীহ-তায়যীফ)

আমরা জিহাদ, কিতাল, ফিতান, মালাহিম ইত্যাদি বিষয়ে অনেক হাদিস বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রবন্ধ ও ফোরামে লিখি, কিন্তু এ হাদিসগুলো সহিহ কিনা তা যাচাই করি না, অথচ কোন হাদিস লিখা বা বলার পূর্বে তা সহিহ কিনা তা যাচাই করা ওয়াজিব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, كفى هওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই বলতে থাকবে (সহিহ মুসলিম, ১/৮) তাই আমরা গায়ওয়াতুল হিন্দ, ফিতান, ইমাম মাহদী, ঈসা আলাইহিস সালাম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তো চলুন,

আজকে গায়ওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর
পর্যালোচনা দেখি।

أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن
موسى، قال: حدثنا بقیة، قال: حدثني أبو بكر الزبيدي، عن أخيه
محمد بن الوليد، عن لقمان بن عامر، عن عبد الأعلى بن عدي
البهراني، عن ثوبان مولى رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عصابتان من أمتي
أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع
(3175): عيسى ابن مريم عليهما السلام». أخرجه النسائي
(22396): وأحمد

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد
(37/81): (حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف من أجل بقية -
وهو ابن الوليد- لكنه قد توبع، وباقي رجاله موثقون غير أبي
بكر بن الوليد الزبيدي، فهو مجهول الحال، لكن تابعه عبد الله
(بن سالم، وهو الأشعري الحمصي، وهو ثقة
وصححه أيضا الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم:
1934) والشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي في
شرح سنن النسائي: المسمى بذخيرة العقبى في شرح سنن
المجتبى: 26/297 ط. دار آل بروم

)

হাদিসের অর্থ:

ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হতে মুক্তিদান করেছেন। তাদের একটি দল হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অপর দল ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যুদ্ধ করবে”। (সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৫ মুসনাদে আহমদ, ২২৩৯৬)

হাদিসের মান:

শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, আর শায়েখ আলবানী এবং সুনানে নাসায়ীর ভাষ্যকার শায়েখ মুহাম্মদ বিন আলী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ, তাহকীক শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৩৭/৮১ যখীরাতুল উকবা, ২৬/২৯৭ আসসিলসিলাতুস সহিহাহ, ৪/৪৩৩)

حدثنا يزيد، قال: حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال أنبأنا هشيم، قال: حدثنا سيار أبو الحكم، عن جبر بن عبيدة، عن أبي هريرة، قال: «وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، وإن قتلت كنت أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر». رواه النسائي: (3174)

ورواه أحمد (7128) عن هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة. قال الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على مسند

أحمد (6/532 ط. دار الحديث): إسناده صحيح، سيار هو أبو الحكم الواسطي، سبق توثيقه (3552)، ... جبر بن عبيدة: هو الشاعر، وهو تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكبير (1/ 2 / 242) فلم يذكر فيه جرحاً، وابن أبي حاتم (1/ 1 / 533) فلم ... يجرحه أيضاً، وذكره ابن حبان في الثقات

قلت: وقال الحافظ في التقریب: (مقبول)، فلا ينزل حديثه عن الحسن. وأما هشيم فهو ثقة ثبت من رجال الشيخين، ووصفه الذهبي في السير (8/288 ط. الرسالة) بقوله: (الإمام، شيخ الإسلام، محدث بغداد، وحافظها) وللحديث طريقان آخران أحدهما عن البراء بن عبد الله الغنوي، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة عند أحمد (8823)، والثاني: عن هاشم بن سعيد، عن كنانة بن نبيه مولى صفية، عن أبي هريرة عند ابن أبي عاصم في الجهاد (291). ويشهد له حديث ثوبان المارّ أنفا: «عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار: عصابة تغزو الهند...». فبهذه المتابعات والشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الصحة.

وقال السندي في تعليقه على سنن النسائي: (6/42) : (المحرر أي: المعتقد من النار على مقتضى ذلك العمل النجيب، ... والحديث الماضي يدل على أنه بشرٌ كُلٌّ من حضر بذلك، فقوله بذلك مبني على أنه حينئذ يكون مندرجا فيمن بُشروا بذلك، والله تعالى أعلم)

অর্থ:

আবু হুরাইরা বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন, যদি আমি (সেই যুদ্ধে) শহিদ হই তাহলে আমি হবো সর্বোত্তম শহিদদের একজন। আর যদি আমি (সেই যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায়) ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত। (মুসনাদে আহমদ: ৭১২৮ সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৪)

হাদিসটির মান:

শায়েখ আহমদ শাকের হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।
(মুসনাদে আহমদ, তাহকীক শায়েখ আহমদ শাকের,
৬/৫৩২)

হাদিসের ব্যাখ্যা:

আল্লামা সিন্দী রহ. বলেন, পূর্বের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ওয়াদা করেছেন, এর ভিত্তিতেই আবু হুরাইরা এ হাদিসে বলছেন, যদি আমি ফিরে আসি তাহলে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হবো। (সুনানে নাসায়ীর টিকা, ৬/৪২)

أخبرنا يحيى بن يحيى، أنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو السكسكي، عن شيخ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الهند، فقال: «ليغزون

جيش لكم الهند فيفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوك السند مغلغلين
 في السلاسل فيغفر الله لهم ذنوبهم فينصرفون حين ينصرفون
 فيجدون المسيح ابن مريم بالشام» قال: أبو هريرة رضي الله
 عنه فإن أنا أدركت تلك الغزوة بعثت كل طارد وتالد لي
 (537) وغزوتها». أخرجه الإمام اسحاق بن راهويه في مسند
 رجاله بين ثقة وصدوق سوى شيخ) وقال محقق الكتاب
 صفوان مبهم لم أعرفه، إسماعيل بن عياش بن سليم أبو عتبة
 الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، ومخبط في غيرهم
 وروايته هنا عن أهل بلده) وأخرجه أيضا نعيم بن الحماذ في
 ولكن إسناده أضعف منه، ففي بقية، وهو مدلس (الفتن، 1236)
 وقد عنعن، مع جهالة شيخ صفوان

অর্থ:

সফওয়ান বিন আমর তার এক শায়েখের সূত্রে, আবু
 হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম একদিন হিন্দুস্তানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,
 ‘তোমাদের একটি বাহিনী হিন্দুস্তানের (অধিবাসীদের) সাথে
 যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দান করবেন,
 ফলে তারা হিন্দুস্তানের বাদশাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে
 আসবে। আল্লাহ তায়ালা (সেই মুজাহিদ বাহিনীর) সব গুনাহ
 ক্ষমা করে দিবেন। যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে তারা ঈসা
 আলাইহিস সালামের সাক্ষাত লাভ করবে।

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, যদি আমি সেই যুদ্ধের সময়

জীবীত থাকি তাহলে আমার সব ধনসম্পদ বিক্রি করে
তাতে শরিক হবো। -মুসনাদে ইসহাক, ৫৩৭ আলফিতান,
নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২৩৬

হাদিসের মান:

এ হাদিসের একজন রাবী মাজহুল বা অজ্ঞাত, হাদিসটি দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, এবং দুটি সনদই সফওয়ান বিন আমর সাকসাকী পর্যন্ত পৌঁচেছে, তিনি ছিকাহ-বিশ্বস্ত রাবী, কিন্তু তিনি তার শায়েখের নাম উল্লেখ করেননি, বরং বলেছেন, 'এক শায়েখ থেকে'। মুসনাদে ইসহাকের মুহাক্কিক বলেন, এই শায়েখকে আমি চিনতে পারিনি। আমিও অনেক তালাশ করেছি, কিন্তু তাকে শনাক্ত করতে পারিনি। তাই উলুমুল হাদিসের মূলনীতি অনুযায়ী হাদিসটি যয়ীফ, সুতরাং হাদিসটি বর্ণনা করার সময় হাদিসের সনদের দুর্বলতাও বর্ণনা করতে হবে, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এ হাদিসের নিসবত করা অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিংবা হাদিসে এসেছে এভাবে বর্ণনা করা যাবে না। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, 'যয়ীফ সনদে একটি হাদিসে এসেছে'। কিন্তু এ হাদিসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই বিশ্বাস রাখা যাবে না। - (দেখুন, আলমাদখাল, মাওলানা আব্দুল মালিক, পৃ: ২০ তাদরীবুল রাবী, পৃ: ১৬০)

৩২. ফিতনাতুদ দাজ্জাল সালাফ ও আমরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ফিতনাতুদ দাজ্জাল সালাফ ও আমরা

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তাঁর খলিফারূপে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কেবলই তাঁর ইবাদত করার জন্য। অর্থাৎ, নবী রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে তিনি আমাদের জন্য যে জীবনব্যবস্থা প্রেরণ করেছেন তার যথাযথ অনুসরণের জন্য। তিনি আমাদেরকে পালনীয় বা বর্জনীয় যে দায়িত্বগুলো অর্পণ করেছেন গুরুত্বের বিচারে সেসবের সবগুলো একরকম নয়। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতায়ালার দেয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল তাঁর প্রতি ইমান আনা, তাঁর একত্বের স্বীকৃতি দেওয়া। এক্ষেত্রে পৃথিবীতে আগত তাঁর সব বান্দারাই একরকম নয়। তাদের কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি আদায় করে, আর অন্য অনেকে আদায় করে না। বরং, বলা ভাল, বান্দাদের অধিকাংশই তাঁর দেয়া এই দায়িত্বটি পালন করে না। যারা পালন করে তাদের সকলেই আবার আন্তরিকভাবে পালন

করে না। আল্লাহ তায়ালা যদিও বান্দাদের মনের খবর জানেন, কে আন্তরিকভাবে ইমান এনেছে আর কে আনেনি এটা যদিও তিনি জানেন কিন্তু বান্দার উপর বাস্তবিক প্রমাণ পূর্ণ করার জন্য তিনি বাহ্যিকভাবেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের ইমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন, তিনি দেখতে চান, কারা আন্তরিকভাবে ইমান এনেছে আর কারা শুধু মুখেই ইমানের দাবীদার। পরীক্ষার মাধ্যমগুলো সবগুলো একরকম না, আবার সকলের ক্ষেত্রেও একরকম নয়। কেয়ামতের আগে আল্লাহ তায়ালা নিকৃষ্ট এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে নিজ বান্দাদের ইমানের পরীক্ষা নিবেন। যে ব্যাপারটিকে আমরা দাজ্জালের ফিতনা নামে জানি। এই পরীক্ষাটি হবে সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ। দাজ্জালের ফিতনার ভয়াবহতার কিছু চিত্র চলুন আমরা দেখে আসি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস থেকে। এক হাদীসে নবীজি ইরশাদ ফরমান-

ما بعث نبي إلا قد أُنذر أمته الدجال الأعور الكذاب

পৃথিবীতে প্রেরিত প্রতিজন নবীই নিজ নিজ উম্মাহকে মিথ্যাবাদী ও কানা দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন।
-সুনানে আবু দাউদ ৪৩১৬

আবু উমামা আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত
অপর এক হাদীসে নবীজি বলেন-

إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم، أعظم من
فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال.

বনু আদমের সৃষ্টির পর দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে ভয়াবহ ও
বিপদজনক কোন ফিতনা এ পৃথিবীতে আসবে না। আল্লাহ
তায়াল্লা যত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁরা সকলেই নিজ
নিজ উম্মাহকে দাজ্জালের ব্যাপার সতর্ক করেছেন। -সুন্নে
ইবনে মাজাহ ৪০৭৭, [আল্লামা কাশ্মিরী রহ. এ হাদীসের
ব্যাপারে বলেছেন وإسناده قوي وার্থাৎ, হাদীসটির সনদ
শক্তিশালী। ফয়জুল বারী ৪/৪০৬]

প্রিয় ভাইয়েরা! লক্ষ করুন, দাজ্জালের ফিতনা এমন একটি
ফিতনা যার ব্যাপারে সকল নবী রাসূলই নিজ উম্মাহকে
সতর্ক করেছেন। হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে, এ পৃথিবীতে
যত ফিতনা এসেছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও
বিপদজনক ফিতনা হল দাজ্জালের ফিতনা। দাজ্জালের
পৃথিবীতে আসার সময় তো হল কেয়ামাতের পূর্বক্ষণে। শেষ
নবীর পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণের পর। অন্যান্য নবীর সময়ে
তো সে আসবে না। কিন্তু তারপরও এই ফিতনার
ভয়াবহতার কারণে তাঁরা নিজ নিজ উম্মাহকে তার ব্যাপারে

সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তায়ালাও নবী রাসূলদের এ ব্যাপারে কোনরূপ নিষেধ করেননি যা থেকে এ ফিতনার ভয়বহতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। আমরা শেষ নবীর উম্মাহ যারা দাজ্জালের ফিতনার মূল টার্গেট তাদেরকেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে নিকৃষ্ট কানা দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এক হাদীসে এসেছে-

عن النّوأس بن سمعان، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل.

নাওয়াস বিন সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের আলোচনা করলেন, তিনি এক্ষেত্রে কখনো আওয়াজ নীচু করলেন আর কখনো আওয়াজ উঁচু করলেন। (তাঁর আলোচনার ধরণে) আমরা মনে করতে লাগলাম, সে মনে হয় খেজুর গাছের সারির কাছে এসে পড়েছে। -সহিহ মুসলিম ২৯৩৭

দেখুন, নবীজি দাজ্জালের ব্যাপারটা কতটা ভয়াবহরূপে তাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যার ফলে তাদের কাছে মনে হয়েছে, দাজ্জাল সম্ভবত মদীনার অদূরে অবস্থিত খেজুর গাছের সারির কাছে চলে এসেছে। এছাড়াও এ ফিতনার

ভয়াবহতার ব্যাপারে নবীজি হতে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তো ভাইয়েরা আসুন, আমরা এ ফিতনার ব্যাপারে নবীজির বর্ণিত হাদীসগুলো পাঠ করে তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করি, এ ফিতনা হতে বাঁচার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি।

আমাদের সালাফ আমাদের মত এ ফিতনার ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন না। তাদের সতর্কতার ব্যাপারে পূর্বোক্ত হাদীসটির সাথে চলুন আরো কিছু নমুনা দেখে আসি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ তায়ালায় কাছে পানাহ চেয়ে নামাযের শেষ বৈঠকে একটি দোয়া পড়তেন। সাহাবায়ে কেরামকেও পড়তে বলতেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এই দোয়াটি ঠিক সেভাবে শিক্ষা দিতেন যেমন তিনি

তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বলো, “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় চাই, কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাই, দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চাই এবং আমি আপনার কাছে জীবন মৃত্যুর ফিতনা হতে আশ্রয় চাই”। -সহিহ মুসলিম ৫৯০

অন্য রেওয়াজে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال "

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমরা সকলেই যখন তাশাহুদ পড়বে তখন চারটি বিষয় হতে আশ্রয় চাইবে, বলবে, “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবন মৃত্যুর ফিতনা হতে ও দাজ্জালের ভয়াবহ ফিতনা হতে। -সহিহ মুসলিম ৫৮৮

প্রথমোক্ত হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু

আনছ থেকে বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত তাবেয়ী তাউস বিন কায়সান রহ.। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এই দোয়াটির প্রতি অত্যধিক গুরুত্বের কারণে তিনি নামাযে তা পড়া ওয়াজিব মনে করতেন। একবার তাঁর ছেলে নামায পড়ার তিনি তাকে এই দোয়াটি পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি নাসূচক উত্তর করলেন। তখন তাউস বললেন, যাও! পুনরায় নামায পড়। -সহিহ মুসলিম ৫৯০ নং হাদীসের পরের অংশ

ইবনু মাজাহ রহ. নিজ সুনানে ৪০৭৭ সংখ্যায় দাজ্জালের ব্যাপারে দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বর্ণনার পর তিনি আব্দুর রহমান আলমুহারেবী রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب، حتى يعلمه الصبيان في الكتاب.

এই হাদীসটি মক্তবের শিক্ষককে দেওয়া প্রয়োজন, যেন তিনি হাদীসটি মকতবের শিশুদের শিক্ষা দেন। -সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৭৭ নং হাদীসের পরের অংশ।

আল্লামা সাফফারিনী রহ. (১১৮৮ হি.) বলেন-

مما ينبغي لكل عالم أن يبيث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء
والرجال... فينبغي لكل عالم ولا سيما في زماننا هذا الذي
أشربت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن
وصارت السنة فيه كالبدع والبدعة شرعا يتبع

আলিমদের উচিত দাজ্জালের হাদীসসমূহ শিশু, মহিলা ও
পুরুষ সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। ... এ কাজটি সকল
আলিমেরই করা উচিত। বিশেষত আমাদের এই যামানায়,
যখন বিভিন্ন ফিতনা মাথা উঁচু করেছে, বিপদাপদ বেড়ে
গেছে, সুন্নাহ এতটাই মিটে গেছে যে সুন্নাহই হয়ে গেছে
বিদআত আর বিদআত হয়ে গেছে অনুসরণীয় শরিয়ত। -
লাওয়ামিউল আনওয়ারুল বাহিয়াহ ২/১০৬, ১০৭

তো প্রিয় ভাইয়েরা! আসুন, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক
ভয়াবহ ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক হই, তার থেকে বাঁচার জন্য
আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি সহ দোয়া করি। বিশেষত,
নবীজির বলে দেওয়া দোয়াটি গুরুত্বের সাথে পাঠ করি, এ
ফিতনাসহ অন্যান্য সব ফিতনার ব্যাপারে সালাফের মত
সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করি। আল্লাহ তায়লা আমাদের
সহায় হোন।

৩৩.দাজ্জালের ফিতনা হতে মুক্তির জন্য সহিহ হাদিসে বর্ণিত কয়েকটি আমল

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে ঈমানদারদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন, যেন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কে শত বিপদেও ঈমান ও ঈমানের দাবীতে অটল থাকে আর কে বিপদ-আপদের সময় ঈমান হারিয়ে ফেলে, ঈমানের দাবী থেকে সরে যায়। যদি এ পরীক্ষা না হতো তাহলে সবাই নিজেকে পাক্কা ঈমানদার বলে দাবী করতো, যারা ঈমানের দাবীতে মিথ্যাবাদী তারাও আখেরাতে প্রকৃত ঈমানদারদের সমমর্যাদা লাভ করতো, কেননা যদিও আল্লাহ তায়ালা জানেন, কে দুনিয়াতে ঈমানের পরীক্ষাতে অটল থাকতে পারবে আর কে পদস্থলিত হবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে মানুষের বাহ্যিক আমল অনুযায়ীই ফায়সালা করবেন, নিজের ইলম অনুযায়ী নয়, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

سورة العنكبوت: 1 - 3

মানুষ কি ধারণা করেছে যে তারা (শুধু মুখে) বলবে, আমরা ঈমান এনেছি আর (এতেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে)

পরীক্ষা করা হবে না। আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। (সুতরাং তাদেরকেও পরীক্ষা করবো) এবং আল্লাহ জেনে নিবেন কারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী এবং জেনে নিবেন কারা (তাতে) মিথ্যাবাদী। -সূরা আনকাবুত, ১-৩

আসলে এ ঈমানী পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের উপর জিহাদ ফরয করেছেন। তো পৃথিবীতে ঈমানদারদের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো দাজ্জালের ফিতনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ نزل الله نرية آدم، أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. سنن ابن ماجه: (4077) قال الإمام الكشميري في فيض الباري (4) : 406. ط. دار الكتب العلمية 1426 هـ: (وإسناده قوي)

বনু আদমের সৃষ্টির পর দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে ভয়াবহ ও বিপদজনক কোন ফিতনা এ পৃথিবীতে আসবে না। আল্লাহ তায়ালা যত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁরা সকলেই নিজ নিজ উম্মাহকে দাজ্জালের ব্যাপার সতর্ক করেছেন। -সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭, আল্লামা কাশ্মিরী রহ. ফয়জুল বারীতে (৪/৪০৬) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

দাজ্জালের ফিতনা যেহেতু এতটাই ভয়াবহ তাই এ ফিতনা

হতে বাঁচার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন, এমনিতেই তো প্রত্যেক মুসলমানের এ পথ নির্দেশনা জানা থাকা প্রয়োজন, আর বর্তমানে যখন দাজ্জালের আবির্ভাবের সব আলামত একে একে প্রকাশ পেয়ে পাচ্ছে, দাজ্জালের বাহিনীও তাই পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তো এখন যে এ বিষয়গুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা কোন ঈমানদার –যে ঈমানের মূল্য এবং ঈমান হারানোর ভয়াবহ পরিনতি বুঝে– তার কাছে অজানা থাকার কথা নয়। তাছাড়া পরীক্ষা যত কঠিন হবে তাতে উল্লেখ হওয়ার পুরস্কারও ততই বড় হবে। তাই এ পরীক্ষার প্রস্তুতিও তত বেশি হওয়া দরকার। তো চলুন, সংক্ষেপে জেনে নেই, দাজ্জালের ফিতনা হতে মুক্তির হাদিসে বর্ণিত আমলগুলো-

১. নামাযে দোয়ায়ে মাসূরার পরে বা দোয়ায়ে মাসূরার স্থলে এই দোয়া পড়া,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ «فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবদ্দশার

এবং মৃত্যু (ও মৃত্যু পরবর্তী সময়ের) ফিতনা হতে এবং
দাজ্জালের ফিতনা হতে।

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من
عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن
شر فتنة المسيح الدجال صحيح مسلم: (588). وفي رواية له
أخرى: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم
هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا: «اللهم إنا
نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ
بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات
قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاوسا قال لابنه: أدعوت بها
في صلاتك؟ فقال: لا، قال: أعد صلاتك، لأن طاوسا رواه عن
(588): ثلاثة أو أربعة، أو كما قال. صحيح مسلم

قال الحافظ في «فتح الباري» (11 : 176 ط. دار الفكر) :
(قوله: من فتنة المحيا أي زمن الحياة، «الممات» أي من الموت
(من أول النزع، وهلم جرا

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পরে
চারটা বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তোমরা বলবে, হে

আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি,
জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবদ্দশার ও
মৃত্যুর সময়ের ফেতনা হতে এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে। -
সহিহ মুসলিম, ৫৮৮

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এই দোয়াটি (এতটা গুরুত্ব সহকারে)
শিখাতেন যেমনিভাবে তাদেরকে কুরআনের সূরা শিখাতেন।
ইমাম মুসলিম বলেন, (তাবেয়ী) তাউস রহ. তাঁর ছেলেকে
জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযে এই দোয়া পড়েছো, ছেলে
বলল, না। তাউস বললেন, তুমি পুনরায় নামায পড়ো। -
সহিহ মুসলিম, ৫৮৮

উল্লেখ্য, এই দোয়া সুন্নত ও নফল নামাযে তো পড়া যাবেই,
একাকী ফরয নামায পড়লে কিংবা জামাতে পড়ার সময়
সুযোগ পেলেও পড়া যাবে।

২- দাজ্জালের আবির্ভাব হলে পাহাড়, বন ও এধরণের দুর্গম
অঞ্চলে চলে যাওয়া, দাজ্জালের আগমনের সংবাদ শোনা
গেলে তার থেকে দূরে চলে যাওয়া। দাজ্জালকে হত্যার
দায়িত্ব যেহেতু ইসা আলাইহিস সালামের তাই দাজ্জালের

মোকাবেলার চেষ্টা না করে তার থেকে পালিয়ে বাঁচাই
কর্তব্য।

عن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع منكم بخروج الدجال فليأمن به، فإن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات -أو لما يبعث به من الشبهات-» هكذا قال». أخرج أبو داود: (4319) وابن أبي شيبة في المصنف: (38614) والحاكم في المستدرک: (8615) وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود: إسناده صحيح ... وقد جَوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في النهاية 1/163. وقال الشيخ عوامة إسناده المصنف صحيح، (في تعليقه على مصنف ابن أبي شيبة وقد رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم، (وسكت عنه الذهبي

ইমরান বিন হাসীন রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন দাজ্জালের
আবির্ভাবের সংবাদ শুনে সে যেন তার হতে যথাসম্ভব দূরে
সরে যায়, কেননা কেউ কেউ তার নিকট আসবে এবং মনে
করবে আমি তো মুমিন, (কিন্তু) সে দাজ্জালের সৃষ্ট সংশয়ে
পড়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে। -সুনানে আবু দাউদ, ৪৩১৯
মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩৮-৬১৪ মুস্তাদরাকে হাকেম,
৮৬১৫। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, ইমাম ইবনে কাসীর, শায়েখ

আওয়ামা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত সবাই হাদিসটিকে
সহিহ বলেছেন।

৩- দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য সূরা কাহাফের
বিশেষ ফযিলত রয়েছে, দাজ্জালের ফিতনার মোকাবেলার
জন্য সূরা কাহাফের বিভিন্ন আমল রয়েছে, যথা:
ক. সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করা।
খ. দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে গেলে সূরা কাহাফের
প্রথমদিকের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা।
গ. জুমার দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা

عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حفظ
عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال». صحيح
(809): مسلم

আবুদ দারদা রাযি হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ
আয়াত মুখস্ত করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি
পাবে। -সহিহ মুসলিম, ৮০৯

عن النواس بن سمعان الكلابي في حديث طويل عن الدجال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أدركه منكم، فليقرأ عليه
(2937): فواتح سورة الكهف. صحيح مسلم

নাওয়াস বিন সামআন রাযিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত এক
দীর্ঘ হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
তোমাদের কেউ দাজ্জালের সম্মুখীন হলে সে যেন সূরা
কাহফের প্রথমদিকের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে। -সহিহ
মুসলিম, ২৯৩৭

عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ
سورة الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل
فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. الأحاديث المختارة: (430)
وقد اشترط في هذا الكتاب أن يخرخ الأحاديث الجياد المختارة
مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، وقد شهد له العلماء بوفاء
هذا الشرط، فالحديث صحيح على شرطه، راجع المدخل إلى
علوم الحديث للشيخ عبد المالك حفظه الله ص: 102 والرسالة
المستطرفة للكتاني: ص: 24 ط. دار البشائر الإسلامية
(1421:هـ)

আলি রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ
তেলাওয়াত করবে সে আটদিন পর্যন্ত সবধরণের ফেতনা
হতে নিরাপদ থাকবে, যদি এ সময়ের মাঝে দাজ্জালের

আবির্ভাবে ঘটে তাহলে সে দাজ্জালের ফেতনা হতেও মুক্তি পাবে। - আলআহাদিসুল মুখতারাহ, ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদিসী, হাদিস নং৪৩০ তিনি এই কিতাবে শুধু সহিহ হাদিস আনার শর্ত করেছেন এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তার এই শর্ত পূরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে হিসেবে হাদিসটি (কমপক্ষে তার নিকটে) সহিহ। দেখুন, আলমাদখাল, মাওলানা আব্দুল মালেক, পৃ: ১০২ আল রিসালাতুল মুসতাতরফাহ, শায়েখ জাফর আলকাত্তানী, পৃ: ২৪

৪ - দাজ্জালের আলামত ও দাজ্জালের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদী সম্পর্কে নিজে জানা, অন্যকে জানানো, এসব বিষয় নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা, মূলত দাজ্জাল সম্পর্কে পূর্ব অবগতি না থাকা দাজ্জালের ফিতনার শিকার হওয়ার একটা বড় কারণ হবে, এজন্যই হাদিসে এসেছে, দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে মহিলারা। কেননা পুরুষদের তুলনায় তাদের ইলম-আকল ও জ্ঞান-বুদ্ধি কম। তাই বিশেষ করে ঘরের মা-বোনদের এসব বিষয়ে জানানো দরকার।

عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج الدجال في خفة من الدين، وإدبار من العلم، أخرجه أحمد : (14954) والحاكم : (8613) وقال الحاكم: «هذا حديث وقال الذهبي في التلخيص: على .» صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

شرط مسلم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رقم: 12525) :
رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জাল বের হবে যখন মানুষের মাঝে
দ্বীনদারী কমে যাবে, শরয়ী ইলম-জ্ঞান চর্চা কমে যাবে। -
মুসনাদে আহমদ, ১৪৯৫৪ মুস্তাদরাকে হাকেম, ৮৬১৩
মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১২৫২৫। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ,
হাফেয যাহাবী ও হইছামী রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

حذيفة بن أسيد قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته
الصبيان بالخذف، ولكنه يخرج في نقص من الناس، وخفة من
الدين، وسوء ذات بين ... رواه معمر بن راشد في جامعه:
(20827) وعبد الله بن أحمد في السنة (995) والحاكم في
المستدرك (8612)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد،
ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري
ومسلم.

হুযাইফা বিন আসিদ রাযি. বলেন, দাজ্জাল যদি এ যমানায়
বের হতো তাহলে বাচ্চারাও তাকে দেখে টিল ছুড়তো, কিন্তু
সে তখন বের হবে যখন মানুষের দ্বীনদারী কমে যাবে ... ।
জামে' মা'মার বিন রাশেদ, ২০৮২৭ আসসুন্নাহ, ইমাম
আব্দুল্লাহ বিন আহমদ, ৯৯৫ মুস্তাদরাকে হাকেম, ৮৬১২।

হাকেম আবু আব্দুল্লাহ ও হাফেয যাহাবী রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

অর্থাৎ দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় মানুষ ইলম ও আমল থেকে দূরে সরে যাবে, তাদের মাঝে দাজ্জালের ফিতনা মোকাবেলার জন্য যে পরিমান ঈমানী শক্তি থাকা প্রয়োজন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে যতটুকু জানাশোনা থাকা দরকার তার কিছুই থাকবে না, তাই তারা ব্যাপকভাবে দাজ্জালের ফিতনার শিকার হবে। পক্ষান্তরে খাইরুল কুরুন-ইসলামের স্বর্ণযুগের বাচ্চারাও দাজ্জাল সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল, তাদের ঈমানী অবস্থাও ছিল আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের, তাই তারা দাজ্জালকে খোদা বলে মানা তো দূরের কথা, দাজ্জালের খোদা হওয়ার দাবী শুনলে তারা তাকে উপহাস করে ঢিল ছুড়তো এবং বলতো, তুই যদি খোদা হয়ে থাকিস তাহলে নিজের চোখদুটি আগে ঠিক কর, যে নিজের শারীরিক ক্রটিই দূর করতে পারে না সে আবার খোদা হয় কি করে?

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة، بمر قنائة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه، وإلى أمه، وابنته، وأخته، وعمته، فيوثقها رباطا، مخافة أن تخرج إليه . مسند أحمد: (5353) وقال الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على مسند

أحمد: إسناده صحيح ... والحديث في مجمع الزوائد، وذكر أن بعضه في الصحيح، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن إسحق، وهو مدلس.

ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জাল মদিনার নিকটবর্তী এই উষর ভূমিতে অবতরণ করবে, (ফেরেশতাদের প্রহরার কারণে সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না) তখন তার কাছে যারা গমন করবে তাদের অধিকাংশই হবে নারী, এমনকি পুরুষরা তাদের মা-বোন, কন্যা-স্ত্রী এদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে, যেন তারা দাজ্জালের কাছে যেতে না পারে। -মুসনাদে আহমাদ, ৫৩৫৩। শায়েখ আহমদ শাকের হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।